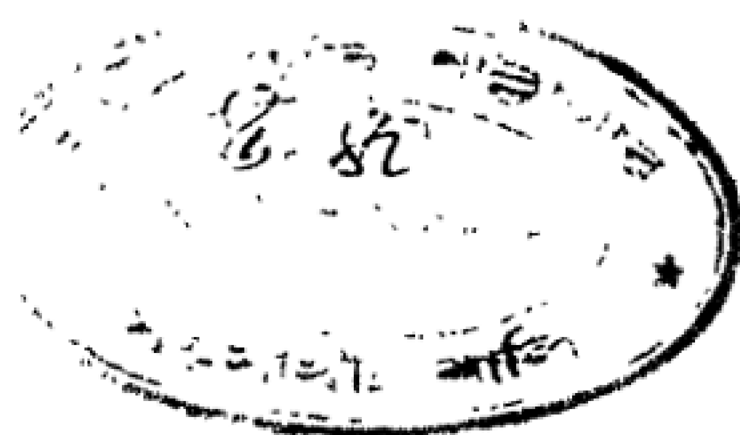
হে মোর দুর্ভাগা দেশ

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব্ব



JP

জ্যোতি প্রকাশালয়
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শেফালিকা ঘোষ
ভারত বুক এজেন্সি
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫২
দ্বিতীয় সংস্করণ—দোল পূর্ণিমা—১৩৫৩

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৮২সি, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভারতের জীবন-রুদ্রের জাগ্রত চরণমূলে

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্য ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্যতম। বর্ত্তমান বাংলার যে-কয়জন সাহিত্যরথী ভাষালক্ষ্মীকে অলঙ্কৃত করিতেছেন—শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার লেখনী শুধু স্বচ্ছন্দ নয়, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাহা অন্তনিরক্ষেপ। এই কারণেই অতি অল্প কাল মধ্যে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

বাংলায় প্রেমঘন যে রসসাহিত্য এতকাল বাঙালী পাঠকের রসপিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছে আজ তাহার সহিত অধিকতর উচ্চ কিছুর আকাঙ্খা জাগিয়াছে পাঠকের অন্তরে। তাহা কি,—সেকথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু পাঠকের সেই ক্ষুধা মিটাইবার উপায় এবং উপাদান প্রচুর বিদ্যমান থাকিলেও বাঙালী সাহিত্যিক নানাকারণে নিরুপায় হইয়া পড়েন।

বর্ত্তমান উপন্যাস "হে মোর দুর্ভাগা দেশ—" বাংলার এবং ভারতের সুবিশাল পটভূমিকে আশ্রয় করিয়া খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইবে;—শক্তিশালী লেখকের সুদৃঢ় লেখনীতে সমৃদ্ধ এই উপন্যাসটিতে আছে বর্ত্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক ধ্বংসের ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ ভারতের জাগ্রত জীবনের ইঙ্গিত।

জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত এই শ্রেণী-সাহিত্যখানির অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠকের মনশ্চেতনায় ইহা নবীন আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হইবে। ইতি।

বিনীতা—

প্রকাশিকা

গরীয়সী মৃত্যু-মাতাকে নমস্কার !

মৃত্যু-মাতা প্রসব করবেন জীবনের অগ্নিকণা—তারই আয়োজন চলেছে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ; গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য্যে—অন্ধকারের আ-দিগন্ত প্রসারিত গর্ভগৃহে। আসবে জীবনের দীপ, আলোকের পুত্র। তারই অভ্যর্থনার জন্য মানব-জগতের এই মরণোল্লাস ! এই জীবন যজ্ঞ !

শ্যামলা ধরিত্রীর সুশ্যামল ভারতের নগণ্য একটি প্রদেশে সেদিন মরণের উল্লাস ধ্বনিত হোল শঙ্খরবে, যেন ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য বাজলো ! বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হোল, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"—এই মৃত্যু-উৎসব সানন্দে সম্পাদন কর, নইলে জীবনের অগ্নিকণাকে জ্বালিয়ে রাখতে পারবে না। সাগ্নিক হতে পারবে না। অশ্রু সলিলে এ অগ্নি নিবানো চলবে না। মৃত্যুযোনির দ্বারপথে এই জীবনাগ্নির শুভ আবির্ভাব হচ্ছে—তাই আর্য্যঋষি বলে গেছেন—"মৃত্যু মাতা।" মৃত্যুই স্রষ্টিকর্ত্রী, মৃত্যুই অ-মৃত-জীবনের উৎসভূমি, মৃত্যুই জননী। পরমদেবী মৃত্যুকে বারম্বার নমস্কার।

অন্ধকারের অচলায়তন থেকে মা কেঁদে উঠলেন—"ম্যায় ভূখা হুঁ"—খেতে দে !" লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি সন্তান নিঃশব্দে দেখলো, নির্ব্বাকে মৃত্যু বরণ করে নিল। মা প্রসব করবেন জীবনের অগ্নি, তাই মৃত্যুপথে তারা আলোকরথে চড়ে অমরলোকে যেতে চাইল না—স্বর্গকে তারা তুচ্ছ করলো—তারা রয়ে গেল মৃণ্ময়ী ধরিত্রীর ধূলিকণায়, ওষধি বনস্পতির অঙ্গে, অদগ্ধ জীবপঙ্ক হয়ে। আহিতাগ্নি নাই, তাই তারা দগ্ধ হোল না—জঠরাগ্নি তাদের ধীরে ধীরে ধূলায় মিশিয়ে রেখে দিল অনাগত যুগের পুত্রের জন্য, যে পুত্র

আহিতাগ্নিতে তাদের মুখাগ্নি করবে—বজ্রাগ্নিতে তাদের পিণ্ড দেবে—রুদ্রাগ্নিতে করবে তাদের ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য।

মা'র মানস-পুত্র মৃত্যুর মধ্যে আবির্ভূত হলেন, কোথায়, কেউ জানলো না। মা চুপে চুপে কয়েকটি প্রিয়পুত্রকে জানালেন,—সে জন্মেছে, তার নাম গণাধীশ। সে অমৃতের পুত্র, মরবে না। যদি কখনো মৃতকল্প হয়—তোরা তার কাণে জন-গণ-মন-মন্ত্র জপ করিস: সে আবার বেঁচে উঠবে। সহস্র অত্যাচার, লক্ষ নির্য্যাতন অবাধে সে সয়ে যাবে; সে আমার দীর্ঘদিনের সাধনার ধন—বহুবার সে এসেছে আমার কোলে—তোরা তাকে চিনিস। সত্যযুগে সে সর্ব্বত্র অবাধে বিচরণ করতো--তাই সে-যুগে সে ছিল তোদের সবার মধ্যে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার রুদ্র কুঠার পরশুরামের হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠতো! ত্রেতায় তাকে রাজশক্তি সামান্ত খর্ব্ব করতে চেয়েছিল, তাই সে পাঠিয়েছিল সম্রাজ্ঞী সীতাকে নির্ব্বাসনে। দ্বাপরের দ্বন্দ্ব-পাপকে সে নিঃশেষে নিঃক্ষত্রিয় করেছিল শ্রীকৃষ্ণের নিষ্করুণ ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তনে আর কলিতেও সে এসেছে, এসেছে তোদের মধ্যেই। তোরা তাকে সযত্নে লালন কর, সস্নেহে পালন কর—যেমন করে শিশু কৃষ্ণকে কংশের অত্যাচার এড়িয়ে পালন করেছিলেন মহারাজ নন্দ। কত কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে রেখেছিলেন পবিত্র হোমাগ্নিকণাটিকে—তেমনি করে রক্ষা কর!

ঊর্দ্ধ আকাশের নিঃসীম অন্ধকার বিদীর্ণ করে ফুটে উঠলো এক অদৃশ্য জ্যোতিলেখা—সে জ্যোতি সৌরব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্তের ধ্রুবজ্যোতি। মা'র নির্দ্দেশ অনুযায়ী চল্লিশকোটি মানবসন্তান সেই জ্যোতির উদ্দেশ্যে নতি জানালো। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র, দিকে দিকে অসংখ্য দেবগণ, আর ধরণীতে চিরপূজ্যা মাতৃগণ আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলেন:—

জয় হোক—ওরে আপরাজেয়---তোদের জয় হোক!

অমরপুর গ্রামের একটি ভদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়ীর আঙ্গিনায় সেদিন উৎসব জাগলো প্রত্যূষের পাখীর কাকলির সঙ্গে—অথচ উৎসবের বিশেষ কোনো কারণ আছে বলে কারো জানা নেই। বরং নিরুৎসাহেরই হেতু আছে, কারণ ভদ্র এবং মধ্যবিত্ত এই পরিবারটি কিছুদিন যাবৎ অনশন আর অর্দ্ধাশনে বেঁচে রয়েছে। তবু উৎসব জাগলো—শঙ্খরবে ঘোষিত হোল সেই বার্ত্তা—প্রতিবেশিরা এসে দেখলো—হ্যাঁ উৎসবের কারণ আছে বটে।

কারণটা অন্য কিছু নয়—জন্মেছে একটা ছেলে। গত রাত্রের ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে ওর মা'র প্রসববেদনার চীৎকার বাইরের কেউ প্রায় শুনতেই পায় নি—আজ কিন্তু ভোর থেকেই সোনালি সূর্য্যালোক দেখা দিয়েছে—গাছে পাতায় লেগেছে—লেগেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের শীষে ঠিক মুক্তামালার মত। আর সেই আলোকের আনন্দের সঙ্গে এবাড়ীতে এসেছে ঐ শিশুটি! কিন্তু নিরন্ন ভদ্র গৃহস্থ—চা'ল নেই, ডাল নেই—খাদ্যবস্তু প্রায় কিছুই নেই—তাছাড়া বাড়ীতে নেই ঐ শিশুটির বাবা। গত আগষ্ট আন্দোলনের সময় তাঁর উপর রাজরোষ পড়েছে, তাই তিনি কারাগারে। এত দুঃখদৈন্যের মধ্যেও ঐ শিশুটি এল—বেশ সবল সুস্থ হয়েই মাটি-মার কোলে নামলো—তারপরই চীৎকার করে উঠলো—ওঁয়া—ওঁয়া…।

ওর মা বোধ হয় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল—রাত্রিশেষের নিবিড় অন্ধকার তখন উদয়-সূর্য্যের আলোকে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—ধাত্রীমা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বললো—ভোরের আলোর মতন খোকা হয়েছে। মূর্চ্ছা ভেঙে জননী দেখলো তার ক্রোড়-দুলালকে। বড় দুঃখের ধন। কারাবাসী পিতার আত্মজ অগ্নিকণা—দুঃখবেদন-বরণকারী মাতৃমন্ত্র-উপাসক শহীদের জীবনাঙ্কুর! —শ্রান্ত জননী শান্তিতে চোখ বুজলো আবার—মুখের হাসিতে দিনের আলোর মত জ্যোতি—অন্তরে অসহনীয় আনন্দের মূর্চ্ছনা!

ঐ শিশুটির ঠাকুরদার নাম রুদ্রাধীশ—কিন্তু তিনি এখানে থাকেন না, কোথায় থাকেন, কেউ বলতে পারে না—আছেন কি নাই, সে-বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে লোকের। বাবা রণাধীশ জেলে; বাড়ীতে আছে ঐ শিশুর মা, ঠাকুরমা, আর কাকা,—বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, অবিবাহিত। অন্নবস্ত্রের অপরিমেয় অনটন এখনো তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে নি—অনশনকে বরণ করে সে এখনো কার্পাসগাছের তলার মাটি খুঁড়ে ভালো তুলো ফলাবার চেষ্টা করে আর নিয়মিত একটি প্রহরকাল সুতো কাটে চরকায়। কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত লোকাধীশ কায়েন মনসাবাচা অহিংস—তার দাদা রণাধীশের আদর্শে অনুপ্রাণিত কিন্তু এইখানেই ঘটলো বিরোধের সূত্রপাত পিতা আর পুত্রের মধ্যে। রুদ্রাধীশ অগ্নিমন্ত্রের উপা৴ক—বিপ্লবী। দীর্ঘদিন পূর্ব্বে তাঁর গুরুদণ্ড—কারাবাস, নির্যাতন, নির্ব্বাসন সবই হয়ে গেছে—এখন তিনি হয়তো ঈশ্বরাধনায় নিজকে উৎসর্গ করেছেন কিম্বা কোনো গভীর জীবনের অভ্যন্তরে ভারতের মুক্তিসাধনার উপায় চিন্তা করছেন, কেউ জানে না। পুত্রদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল দ্বীপান্তর থেকে ফেরার পরই; তারপর তিনি এক রাত্রিশেষে উধাও হয়ে যান। সে আজ নয় বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু এখনো তিনি বেঁচে আছেন, ভেবে, তাঁর সহধর্ম্মিণী সধবার আচরণ পালন করেন।

শিশুটির মা যখন বৌ হয়ে এবাড়ীতে আসে তখন তার বয়স ছিল মাত্র চোদ্দ। শ্বশুরকে সে তিনটি দিনের জন্য দেখেছিল মাত্র—সেই বিয়ের সময়! তারপর শ্বশুর চলে গেছেন—তাঁর স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে গেছে এদের সকলের মনে—শুধু শাশুড়ী তাঁকে ভোলেন নি। দুই ছেলে আর এক মেয়ে তাঁর—মেয়ে থাকে শ্বশুর বাড়ীতে। বড়লোক জামাই—ক্বচিৎ কখনো পাঠায় তাকে এখানে। আজ প্রায় পাঁচ ছয় বছর সে আসেনি। জামাই শুধু বড়লোক নয়—সরকারের বড় কর্ম্মচারী, আরো বড় হবার আশা রাখে; ভারতের মুক্তির-সাধক এই পরিবারে সে যখন বিয়ে করেছিল, তখন সে ছিল মেয়ের বাবা রুদ্রাধীশের

অন হাত—কিন্তু এখন সে এবাড়ীতে আসতে ভয় করে—মত আর পথের এতখানি পরিবর্ত্তন তার হয়েছে !

দরিদ্রের সংসার হলেও নবজাত শিশু আর নবীনা প্রসূতির কয়েকটা দিন পাড়াপড়শীরা চালিয়ে দিল। কেউ দিল গাইয়ের একটু দুধ, কেউবা দিল একথালা মুড়ি-মুড়কী, কেউবা একমুঠো ভাত। শাশুড়ী আর দেবর প্রায় অর্দ্ধাশনে কিম্বা অনশনেই কাটাচ্ছে কিছুদিন যাবৎ। কিন্তু পরের দান এমন করে গ্রহণ করতে লোকাধীশের বুকে ব্যথা বাজে। আদরের ভাইপো তার আজ সাত দিনের—ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে ! দুধ একটু ওকে খাওয়ানো দরকার—কিন্তু পাড়ায় কেউ এখনো দুধ দিয়ে যায়নি। ওর মা'র বুকের দুধ প্রায় শুকিয়ে গেছে—সবল সুস্থ ছেলের পেট তাতে ভরে না ! লোকাধীশ উঠানে বসে কয়েকটা গাঁদাগাছের ডালে কলম বাঁধছিল—বড় বড় ফুল হবে। কিন্তু ছেলেটার কান্না আর সহ্য করতে না পেরে উঠে এসে দাঁড়ালো আঁতুড় ঘরের সামনে।

—যুদ্ধের বাজারে চাকরী আজকাল খুবই সস্তা বৌদি—বড় বড় কোম্পানীতে বিস্তর লোক নিচ্ছে—আমিও ঢুকে পড়ি একটাতে—কি আর করবো !

বৌটির নাম স্বাহা। কচি ছেলেটাকে বুকের মধ্যে ধরে চুপ করাবার চেষ্টা করছিল সে। দেবরের কথা শুনে একবার জানালাপানে তাকালো—দৃপ্ত সূর্য্যের আলো-ঝলমল আকাশ—মাটির বুকে, শ্যামল দূর্ব্বাদল, রৌদ্রোজ্জ্বল শিশিরবিন্দু—আর নাতিদূরস্থ ময়ূরাক্ষির কলকল্লোল। মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর স্বাহা দেবরের পানে চাইলো, হেসে বললো—এত সহজে আত্মসমর্পণ করবে ঠাকুরপো। ক্রীতদাস হয়ে যাবে এত অনায়াসে !

—উপায় কৈ বৌদি ! ঐ আগুনের কণাটিকে তো জ্বালিয়ে রাখতে হবে !

—হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্য সমীধ আহরণ করবে ঠাকুরপো। হোমাগ্নি জ্বালতে হবির দরকার—কেরোসিন তেল কেন আনতে যাবে ?

লোকাধীশ চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড। স্বাহা তার শুকনো মাইটা ছেলের মুখে গুঁজে দিয়েছে—ছেলেটা তাই টানছে—স্বাহাও নিংড়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।

—আপাততঃ কিছুদিন কেরোসীন দিয়েই ওকে জ্বালিয়ে রাখি বৌদি!

—না—স্বাহার কণ্ঠস্বর সুতীব্র ভর্ৎসনায় সুদৃঢ়—না ঠাকুরপো! সে অশুচি অগ্নিতে হোম হবে না—তার থেকে এই অগ্নিকণা নিবে যাক, কিছু ক্ষতি হবেনা।

—অগ্নি অপবিত্র হয়না বৌদি।

—হয়। যে হোতা, সে-ই অপবিত্র হবে। হোম জ্বালার শক্তি তার আর থাকবে না;—বলে স্বাহা মিনিট দুই ছেলের মাথায় হাত বুলালো, তারপর বললো—দেখছো ঠাকুরপো—দেশের যুব-শক্তিটা কিভাবে ক্রীতদাসের শৃঙ্খল গলায় পরলো! আগষ্ট-আন্দোলনের সময় নেতাদের কারাবরণ—তার সঙ্গে কয়েকজন উশৃঙ্খল যুবকের নেত্রীমতবিরুদ্ধ কয়েকটা ছেলেমানুষী—তার পরই দেখছো—দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা দিয়েছে—আর ভাল মাইনেতে ভাল চাকরীর বাজারও খোলা হয়ে গেছে! যুবকশক্তি সানন্দে ঐ চাকুরীর ফাঁস গলায় পরছে—রেশনের চাল আর কণ্ট্রোলের কাপড় পরে পরমানন্দে তারা কেরোসীন তেলে জ্বালিয়ে রাখলো তাদের জীবনের আগুন! সে অগ্নি শুধু অবিশুদ্ধ নয়—সে অগ্নি পতিত, সে অগ্নি অস্পৃশ্য—কারণ সে অগ্নির ইন্ধন দাসত্বে অর্জিত।

—বেঁচে থাকবার আর যে কোনো উপায় নেই বৌদি।

—নাই—উপায় না থাকার মত সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। এই যে করাল ভিক্ষাহীনতা,—মৃত্যুর তাণ্ডব—জীবনের শুদ্ধ অগ্নিকে অস্পৃশ্য করবারই এই আয়োজন। নইলে ঠাকুরপো, ট্রেণ, ষ্টিমার, প্লেনের এই অতিমানবীয় যুগে হাজার হাজার মণ খাদ্য গুদামজাত থাকতেও হো'ল দুর্ভিক্ষ! কেন হোল? না হলে দেশের যৌবন শৃঙ্খলিত হবে না—দেশের সতীত্ব কলুষিত হবে না—সতী মাতার সন্তান মাতৃগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে না—দেশের সংস্কার-

সংস্কৃতি, যুগ-যুগান্তের অর্জিত ঐতিহ্য সমূলে ধ্বংস হবে না—তাই হোল এই দুর্ভিক্ষ।

—তোমার কথা ঠিক বৌদি—কিন্তু একা আমি কি করতে পারি?

—একাই তুমি হোতা হয়ে বেঁচে থাকো—অগ্নি অনির্ব্বাণ—সে বাঁচবেই—এখানে না বাঁচে, শত সহস্র সতীমাতার কোলে সে বেঁচে থাকবে—না ঠাকুরপো ঐ রকম লোভনীয় চাকুরীতে ঢুকে তোমায় ক্রীতদাস হতে দেবনা আমি।

—এই তোমায় শেষ কথা বৌদি?

—হ্যাঁ, আমার সুচিন্তিত অভিমত। 'জীবনকে রক্ষা করবার জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাকে বিক্রী করা আত্মহত্যার থেকে বেশী পাপ।' সে জীবন রক্ষায় কোনো লাভ হবে না। তোমার দাদা কতদিনের জন্য কারা বরণ করিলেন জানি না, ভাগ্যগুণে তুমি যখন এখনো বাইরে আছ, তখন চেষ্টা কর শুদ্ধ সমিধ-আহরণ করতে, না পার, তিনি ফেরার পূর্ব্বেই আমাদের মৃত্যুপথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু মরবার সময় আমাদের সান্ত্বনা থাক্‌বে—আমাদের অন্তরাগ্নি শুচি রেখেছি আমরা—তাহলে দেখবে, এই ছাইয়ের গাদাতেই আবার জ্বলবে আগুন—এই অঙ্গারেই বাতাস লেগে জ্বলবে দাবানল—এই মৃৎকুণ্ডের হোমশিখাই আকাশকে আলোময় করে দেবে।

লোকাধীশ বাইরে চলে এলো, আসবার সময় শুধু বলে এল—তাই হবে বৌদি।

কিন্তু সাতদিনের শিশুর করুণ আর্ত্তনাদ ওর কাণে গলিত সীসকের মত আগুন ঢেলে দিচ্ছে। এমন করে না খেয়ে ও বাঁচবে কতক্ষণ? কিন্তু লোকাধীশ নিরুপায়। পল্লী পথে পথে সে চলতে লাগলো। সর্ব্বত্রই করুণতম দৃশ্য। অন্ন নাই—ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চলছে। শুধু জীবনের মৃত্যু নয়—যুগার্জ্জিত সাধনার মৃত্যু—অতি যত্নে লালিত আত্মার মৃত্যু। যে- আত্মা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ থেকে যাত্রা করে কৃষ্ণার্জ্জুনের গীতার বাণীতে "ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থকে" পরিক্রম করে পুরু-পৃথ্বিরাজের ইতিহাস-

গাথায় উজ্জ্বল হয়ে সহস্র শহীদের বন্দেমাতরম্ গানে উল্লসিত হচ্ছিল—সেই আত্মার অপমৃত্যু। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ জাতিভেদ সৃষ্ট ভারতের সুদৃঢ় ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতার ঘুণকীট আর ভেদনীতির বজ্রকীট প্রবেশ করে ঘটাচ্ছে এই মৃত্যু। এ মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা শুধু আতঙ্কের বিষয় নয়—শুধু ইতিহাসের অনুলেখ নয়—এ মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা অনাদিকালের মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক অধঃপতন—মানুষ আর পশুর ব্যবধানরেখার নির্লোপ—দয়া-মায়া-সত্যধর্ম্মাশ্রয়ী মানবজীবনের অবলুপ্তি।

লোকাধীশ ধীরে ধীরে পথ চলছে আর ভাবছে। বোসপাড়ায় এসে গেল। বোসেদের অবস্থা ভাল—জমিদার। এবাড়ীর বড় ছেলে সুবোধ লোকাধীশের সহপাঠী।

মৃত্যুমাতার কোলে গিয়ে যারা জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করলো—এই জমিদারপুত্র সুবোধ তাদের মরতে সাহায্য করেছে—প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। সে গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আর এখনকার হাটবাজার দেখবার কর্ত্তা। গ্রামের বহু যুবককে এবং কয়েকটি মেয়েকেও সে ইতিমধ্যে চাকরী যোগাড় করে দিয়েছে এবং আরো অনেককে চাকরী দেবে বলেছে। নিদারুণ অন্নাভাব থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা সেই করে দিচ্ছে—সে এখন বহু ব্যক্তির ধন্তবাদার্হ—কিন্তু সেই প্রত্যক্ষের অন্তরে অপ্রত্যক্ষ বিষয়টা হচ্ছে—সেই এখানে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছে। যার যা যৎসামন্ত চাল ধান ছিল, সেটুকু অধিক মূল্যে পূর্ব্বেই কিনে চালান করে দিয়েছে এবং যারা এখানে ব্যবসাদার ছিল, তাদের সঙ্গে যোট করে কালোবাজারের হদিসটাও শিখিয়ে দিয়েছে—আরো অনেক কিছু করেছে, যাতে এ তল্লাটের দশবিশখানা গাঁয়ে খাদ্য নাই—আছে শুধু সুবোধের ঘরে এবং তার নির্ব্বাচিত আরো দু'একজনের ঘরে। কিন্তু আছে অত্যন্ত গোপনে।

লোকাধীশকে সে একটা ভাল চাকরী ঠিক করে দেবে বলেছিল—আর কিছু চালও দিতে চেয়েছিল, যাতে চাকরীর প্রথম মাসের মাইনে পাওয়া

পর্য্যন্ত লোকাধীশের মা আর বৌদি বেঁচে থাকতে পারে। নির্ব্বুদ্ধিতা লোকাধীশের আর তার বৌদি স্বাহার! লোকাধীশ চাকরীটা গ্রহণ করতে পারবে না—তাই জানাতে এল।

প্রকাণ্ড বাড়ী সুবোধের—আসনকুশনে সাজানো—তার উপর জমিদারী চালের গদি তাকিয়াও আছে আর আছে কয়েকটা ভোজপুরী দারবান আর দুটো গুর্খা.শরীর রক্ষী! শরীররক্ষী দুটি হালে বহাল হয়েছে। লোকাধীশের হাসি পেলো ওদের দেখে—চামড়ার খাপে ভরা কুকি কোমরে গুঁজে ওরা দুজন সুবোধকে পাহারা দিচ্ছে। নিজের বাড়ীতে নিজের দেশের ভাইবোনদের ভয়ে যাকে গুর্খা শরীররক্ষী রাখতে হয়, সে কেমনধারা দেশহিতৈষী, বুঝতে দেরী হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে সুবোধ খানিকটা নাম কিনেছে। এইতো চার-পাঁচ দিন আগে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এসে ওকে কয়েকটা বিশেষ কাজের ভার দিলেন—চাল বিলির ব্যবস্থা ওরই হাতে, তাছাড়া ওই এখন এখানকার ধনী দরিদ্র সকলকার মাতব্বর। বয়সে ছেলেমানুষ হলে কি হবে, সুবোধ অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। ওর বাবা এত অল্প বয়সেই ওর হাতে বিষয়-সম্পত্তি দেখবার ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে হরি নাম চর্চ্চা নিয়ে থাকেন। সুবোধ এখন তাঁর যোগ্য পুত্র!

লোকাধীশকে দেখে সুবোধ উল্লাসিত কণ্ঠেই বলল—এসো হে! তোমার কথাই ভাবছিলাম সকাল থেকে। কাল একবার সদরে যেতে হবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। তোমার দরখাস্তটাও আমি নিয়ে যাব, কৈ—লিখে এনেছ? সুরুতে শ'দেড়েক মাইনে তারপর অবশ্য চার পাঁচশ' পর্য্যন্ত···

—চাকরী নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সুবোধ···বলে লোকাধীশ বসলো একটা চেয়ারে।—ভেবে দেখলাম,—দেশের সমস্ত যুবশক্তি এইভাবে শৃঙ্খলিত হলে দেশের জন্য চিন্তা করবার কেউ থাকবে না। এই দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাব তারই জন্য সৃষ্টি হয়েছে, এর পরে হয়তো আরো ভীষণ অভাব সৃষ্টি হবে, যাতে বাঙলার কেউ আর স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে না পারে।

সুবোধ নিঃশব্দে গম্ভীর হয়ে খানিক বসে রইল। তারপর বললে,—ঘর-সংসার চালাবে কি করে? খাওয়াবে কি মা-বৌদি-ভাইপোকে?

—জানি না, তবে আত্মবিক্রয় দ্বারা অর্জিত অর্থে জীবন রক্ষা করার চাইতে মৃত্যু শ্রেয় বলে মনে করি।

সুবোধ আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলো—গোয়ার্ত্তুমি করো না লোকাধীশ। গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সুবিধা দিচ্ছেন এখন—খেয়ে পরে বেঁচে থাক—এই সঙ্কটকাল কেটে যাক—তারপর···

—ওসব তোমাদের মত সুবিধাবাদীর কথা সুবোধ,—আমি জানি, যে মুহূর্ত্তে দাসত্বের একটি চালের দানা আমার মুখে উঠবে সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমি ভারতের মুক্তিসাধনার সমিধ নই। বিষ্ঠালিপ্ত কাঠে হোম হয় না। কিন্তু এসব কথা এখানে বলে কোনো লাভ নেই।—তোমার চাকরী দেওয়া দয়াটা আমি নিতে না পারায় দুঃখিত। কিছু মনে করো না ভাই···।

লোকাধীশ উঠলো, কিন্তু সুবোধ ব্যঙ্গ করে বললো—চোখের উপর মা-বৌদির অনশনে মৃত্যুটা দেখা যে কি বীরত্ব, বুঝলাম না।

—বুঝবে না—হেসেই জবাব দিলে লোকাধীশ—কারণ রক্তে ঘুণ ধরে গেছে তোমাদের; বুঝতে, যদি অনুভব করতে কি বীরত্বের নেশায় প্রতাপ সিংহ আজীবন তৃণশয্যায় শয়ন করেছিলেন, কি শক্তিবলে রাজপুতেরা যবনের হাতথেকে সম্মান বাঁচাবার জন্য নিজের মেয়েকে দুখণ্ড করে দিত, কি ধন রক্ষা করবার জন্য সতী পদ্মিনী জহরব্রত করেছিলেন। বুঝতে যদি ভারতের সেই গৌরবের একবিন্দুও তোমার শিরায় সঞ্চিত থাকতো।

—আমার নেই, তোমার শিরায় আছে বুঝি?—বিদ্রূপই করলো সুবোধ আবার।

—আছে—শান্ত কণ্ঠে বললো লোকাধীশ—আছে—আমার রক্তের মধ্যে অন্ধ আবেগে ঘুরে মরছে সেই গৌরবের ইতিহাস। পাঠ্য ইতিহাসের পাতা তোমাদের চক্রে যে-ভাবেই লিখিত হোক আমার রক্তধারার সে ইতিহাস

অভ্রান্ত সত্য—সে রক্ত আমার পিতৃপুরুষের রক্ত, আমার পিতার রক্ত, আমার সতীমাতার রক্ত—যে-মা এই বছর পঞ্চাশ আগেও জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে জগতে সতীত্বের অমোঘ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

—ওঃ, তাই নাকি ? কিন্তু শুনেছি, গলায় বাঁশ লাগিয়ে সেই তোমার সতী মাতাদের চিতায় তোলা হোত—চীৎকার বন্ধ করবার জন্যে ঢাকঢোল বাজানো হোত—জবরদস্তি করে হত্যা করা হোত।

—সে ইতিহাস তোমাদের কুচক্রে পিষ্ঠ কেরাণী তৈরীর স্কুলপাঠ্য ইতিহাস। সত্য ইতিহাস হচ্ছে, শতকরা নব্বইজন সতীমাতা স্বেচ্ছায় দিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন। সেই বীর-মাতার বীর্য্যবান সন্তানগণ একদিন জগৎ জয় করতে পারবে, এটা বুঝতে পৃথিবীর লোকের দেরী হয়নি—তাই ঐ ইতিহাস।

—কিন্তু রাজা রামমোহন... ।

—থামো সুবোধ! রাজা রামমোহন সমাজ সংস্কারের জন্য এ কাজ করেছিলেন কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী কুফল আজ আমরা ভোগ করছি—মাতৃশক্তি আমাদের অন্তরে আর বীরত্বের মহিমা, সতীত্বের গরীমা জাগাতে পারে না তেমন করে। তাঁর মত আরো অনেক ছিলেন সেদিন, এখনো রয়েছেন তাঁদেরই প্রতিনিধিরা—কিন্তু তাঁদেরকে অতিক্রম করেও দেশ আছে, কাল আছে, আছে সত্য ইতিহাস আর মনে সত্যানুভূতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিঃক্ষত্রিয় দেশ নির্বীর্য্য হয়েও পুরু—পৃথ্বিরাজকে প্রসব করেছিল—কিন্তু জয়চন্দ্রও ছিল—আবার শিবাজী, প্রতাপ; রণজিত এসেছে—তার সঙ্গে মানসিংহও—তেমনি বর্ত্তমানে সুভাষ-গান্ধী-আজাদ জহরলাল ইত্যাদির সঙ্গে তোমরাও এসেছ—এ'তো প্রাকৃতিক নিয়ম।

লোকাধীশ উঠলো কিন্তু "তোমরা এসেছ" কথাটার মধ্যে বিদ্যুতের বজ্র লুকোনো রয়েছে। সুবোধের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য কালো হয়ে গেল—তৎক্ষণাৎ নিজকে সামলে বললো—আমরা এসেছি! তাহলে আমরাই দেশের নিকৃষ্ট জীব—কি বলো ?

—তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমি আসিনি সুবোধ! নিকৃষ্টতা আর উৎকৃষ্টতার তফাত্ তুমি যে না জানো তা নয়—তুমি জানো, তুমি কেমন লোক ; আচ্ছা, আসি।

লোকাধীশ বেরিয়ে পড়লো—কিন্তু বাড়ী ফিরলে চলে না। মা প্রায় চার-পাঁচ দিন অর্দ্ধাশনে। বৌদিরও পুরোপেট খাওয়া হয়নি—আর নিজে সে তো প্রায় অনশনেই আছে। কিছু খাদ্যের যোগাড় তার করা দরকার। কিন্তু কোথায় পাবে খাদ্য? যেখানে পাবার নিশ্চিত সুযোগ ছিল সেখান থেকে তো এইমাত্র চলে এল লোকাধীশ—এবার যাবে কোথায়?

নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই গ্রামের পথ বেয়ে সে হাঁটছিল—খানিকটা এসে ডাক শুনলো—লকুদা! ও লকুদা!

তাকিয়ে লোকাধীশ দেখলো—সেঁজুতি ডাকছে। সেঁজুতি এই গ্রামেরই মেয়ে—বয়স প্রায় আঠারো, এখনো বিয়ে হয়নি, কারণ ওর বাবা গরীব। কিন্তু মেয়েটা ভাল লেখাপড়া শিখেছে—ভাল মানে বি, এ, এম, এ, নয়, গ্রামে থেকে ইংরাজি বাংলা আর কিছু সংস্কৃত শিখেছে ; তা ছাড়া ভাল গান গাইতে পারে—বন্দেমাতরম্ গানটার নতুন সুর দিয়েছে ও। লকু ওর দিকে চাইলো—বাড়ীর উঠোন থেকেই ডাকছিল সেঁজুতি একটা ভাঙা পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে। লকু তাকাতেই বললো—বাবা ডাকছেন।

আস্তে উঠে এল লোকাধীশ ওদের উঠোনে। সেঁজুতির বাবা একটা ধানীলঙ্কার গাছের কাছে বসে বসে মাটি খুঁড়ছিল ; শীর্ণ চেহারা—যেন কয়েকদিনই পেটভরে খায়নি। লকুকে দেখে বললো,—বসো লকু ; দিন তো আর চলে না—কি উপায় করা যায় বলতে পারো?

উপায় কিছু দেখতে না পেয়ে লোকাধীশই তো এতক্ষণ পথে পথে ঘুরছিল—সে আর উপায় বলবে কি, কিন্তু সেঁজুতির বাবাই আবার বলল,—সুবোধ একটা চাকরী দিতে চায় সেঁজুতিকে—মাইনে শ'খানেকের বেশি, করবে?

—কিসের চাকরী? কোথায় চাকরী?—লকু কথঞ্চিবিস্ময়ে শুধুলো।

—কোথায় কে জানে, তবে সুবোধ বলছে যে অনেক ভদ্র ঘরের মেয়ে করছে সে চাকরী।

—ওঃ!—লকু নিঃশব্দে বসে রইল অনেকক্ষণ। কোনো উত্তরই দিচ্ছে না। সেঁজুতি বলল—চাকরিটা আমি নিচ্ছি লকুদা, নাহলে মা-বাবা ভাইবোনদের বাঁচান যাবে না।

—চাকরী নিয়েও তাদের বাঁচাতে পারবে না, আর তুমিও বেঁচে থাকবে না।

—কেন? আমরা তো যুদ্ধে যাচ্ছি না লকুদা, বাঁচবো না কেন?

—যুদ্ধে গেলে বাঁচতে পারতে—তোমার আত্মা অনবনত থাক্‌তো। তুমি যেতে চাইছ ক্রীতদাসী হতে; তোমার আত্মার সেখানে মৃত্যু ঘটবে আর এঁদের ঘটবে অপমৃত্যু। বেঁচে হয়তো থাকবে তোমরা, কিন্তু সে জীবন মৃতের প্রেতাত্মা।

—কিন্তু আর তো কোনো উপায় নাই লকু!—সেঁজুতির বাবা বললো—এতগুলো লোকের জীবন অনাহারে শুকিয়ে যেতে বসেছে—কি আর করবো?

—করবার কি আছে, বলতে পারি না—লোকাধীশ উত্তর দিল ধীরে ধীরে, উপায় আর কিছু না রাখবার সবরকম ব্যবস্থাই পাকা হ'য়ে গেছে। প্রেত হয়ে বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায় রাখা হয়েছে চাকরী নেওয়া—কিন্তু...

—বলো লোকাধীশ।

—আমি ওরকম ভাবে বাঁচতে চাই না এবং কাউকে বাঁচাতে চাই না! তার থেকে আমার শুদ্ধ অনমিত আত্মা দেহবিচ্ছিন্ন হোক—এই আমার মত। তাই আমাকে এ বিষয়ে কিছু শুধুবেন না—আমি উঠলাম!

লকু চলে যাচ্ছে কিন্তু সেঁজুতি ব্যাকুল হয়ে বললো—তাহলে চাকরীটা নেব না লকুদা! অন্য কোনো উপায় যদি থাকে···

—নিরুপায়ের উপায় যিনি তিনিই ব্যবস্থা করে দিতে পারেন—তবে তাঁর উপর বিশ্বাস আমাদের এত কমে গেছে সেঁজুতি, যে সেই সর্ব্বশক্তিমানকে

আমরা প্রায় নাস্তি করে দিয়েছি। কিন্তু তাঁর উপর নির্ভর করে মনের অজেয় শক্তিকে যদি জাগিয়ে রাখ, তাহলে উপায় একটা হবেই!

—আমি চাকরী নেব না লকুদা—আমার শুদ্ধ আত্মা অনবনত থাকে।

—ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন—বলে চলে গেল লোকাধীশ। কিন্তু রাস্তায় নেমেই ভাবলো, গ্রামকে গ্রাম, সারা দেশটাই এই খাদ্যাভাবের জালে আটকা পড়েছে! কটাইবা এমন করে জাল ছিঁড়ে বেরুতে পারবে! দেশের যৌবন বন্দী হয়ে গেল। মুক্তিপ্রয়াসিনী মাতার চোখের জলে ধরিত্রী পঙ্কিল হয়ে উঠবে; মৃত সন্তানদের কোলে নিয়ে মা কাঁদবেন আর বলবেন,—অক্ষম দুর্ব্বল সন্তানগণ, তোদের জীবনের কোনো মূল্য নাই—যা, মরে যা! যদি কোনোদিন শক্তিমান সন্তান কেউ আসে তো তাকেই লালন করবো।

—একটুকু ফ্যান দাও গো—মরে গেলাম—ও বাবা, ওমা লক্ষ্মী—দাও মা!

অভিশপ্ত সন্তানের আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে! এই প্রেত-জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ওরা ফ্যান খোঁজে—ওরা জানে না, ওরা অনেক আগেই মরে গেছে—ওদের ধর্ম্ম মরেছে, আচার-বিচার মরেছে—সমাজ-সংসার-সতীত্ব সব মরে গেছে—ওদের যুগার্জিত জীবনের ইতিহাস ধ্বংস হয়ে গেল, তবু—ঐ প্রেতরা বাঁচতে চায়! নাঃ, ওদের বেঁচে কাজ নেই। ওরা মরুক, নইলে ঐ দূষিত ক্ষত-দেহজাত সন্তানরা কৃমীর মত কদর্য্য হবে—সারা দেশের মানুষরাই ভিখারী-জাত হয়ে উঠবে আর নয় ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যাবে। তার থেকে দেশটা শ্মশান হয়ে যাক! শূন্য হয়ে যাক!

উঠোনে একটা চ্যাটাই পেতে কচি ছেলেটাকে রোদে শুকুতে দিয়েছে স্বাহা। ওকে মাখাবার জন্য কয়েক ফোঁটা সরষের তেল দিয়ে গেছে পাশের বাড়ীর জ্যেঠাইমা। সরষের তেল না ছাই—কি একটা বিশ্রী গন্ধের তেল, বাজারে ভাল তেল পাওয়া যায় না। জ্যেঠাইমার বড় ছেলে চাকরী করে রেলে,

তাই রেশন থেকে তেল পায়—না হোলে স্বাহার খোকাকে এমনিই শুকুতে হোত!

আজ ক'বছরের হোল গো?—প্রশ্নটা করলো সেঁজুতি। কচি ছেলের বয়স জিজ্ঞাসা করতে হলে "বছর" কথা দিনের বদলে বলতে হয়—ছেলের পরমায়ু বাড়ে এতে—এই বিশ্বাস। স্বাহা কিছু বলবার পূর্ব্বেই শাশুড়ী বললো—সাত বছরে পড়লো মা—আয়!—সেঁজুতিকে ডাকলো শাশুড়ী। কিন্তু স্বাহার হাসি পাচ্ছে; মৃত্যু যে জাতির শিয়রে করাল দংষ্ট্রা বিস্তার করে বসে রয়েছে, সেই জাতির বংশধরের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য কতরকম ব্যবস্থা! দিনকে বছর বলা হয়—আঁতুড় ঘরে কত তুকতাক করা হয়—ছয় দিন না সাত দিনের দিন বিধাতা পুরুষ এসে নাকি তার কপালে ললাটলিপি লিখে দিয়ে যান—আজই না সেই দিন? হ্যাঁ, আজই বিধাতাপুরুষ এসে খোকার কপালে তারা সারা জীবনের ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যাবেন। কি লিখবেন? খোকার ভাগ্যলিপিটা কিরকম হবে? কি আর হবে? পরাধীন দাস জাতির সন্তানের ভাগ্যে যা হয়—না খেয়ে মরে যাবে, কিংবা আধমরা হয়ে বেঁচে থেকে কোম্পানীর কেরানি হবে—বড় জোর বড় কেরানি হয়ে ঘুষ খাবে, আর কালোবাজারের কসরৎ দেখিয়ে দেশের লোককে জাহান্নমে পাঠাবে!

কিন্তু না—এরকম কেন হবে খোকা! এমন অন্যায় চিন্তা কেন আসছে ওর মা'র মনে? স্বাহা নিজকে তিরস্কার করলো। মনে মনে বললো, খোকা অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে। দেশমাতৃকার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে সে সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করেও বেঁচে থাকবে তার কোটি কোটি দেশভ্রাতার অন্তরে। মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতত্ব লাভ করেও বেঁচে থাকবে খোকা তার। বিধাতাপুরুষ এই কথাই লিখবেন—লিখতে বাধ্য হবেন তিনি। কারণ এই খোকার পিতামহ, মাতামহ, পিতা, পিতৃব্য, সকলের সাধনার বলে এর আবির্ভাব। অত সাধনা কি ব্যর্থ হতে পারে? ঐ ঘুমন্ত জ্বলন্ত জাগ্রত রক্তস্রোত কি সাধারণ জলস্রোতে পরিণত হতে পারে? না—কখনো না। তিন পুরুষের সুবিপুল সাধনার লব্ধ

এই জলন্ত অগ্নিকণাকে কোনো বিধাতাই বঞ্চিত করতে পারে না তার নায্য অধিকার থেকে। খোকার কপালে বিধাতা লিখতে বাধ্য হবে—"স্বাধীন ভারতের হে স্বাধীন মানবক—তোমার আবির্ভাব মাতা ভারতের স্নেহচুম্বনে ধন্য হোক—"

—অমন চুপটি করে বসে যে বৌদি?—সেঁজুতি বললো স্বাহাকে।

—কি আর করবো—বলে স্বাহা করুণ মৃদু হাসলো, তারপর বললো হেসেই, ভাবছিলাম, বিধাতাপুরুষ খোকার কপালে কি আজ লিখবেন?

—লিখবেন যে, ভারতের স্বাধীন আকাশ থেকে যেন খোকা নিশ্বাস নিতে পারে।

—অন্ততঃ লিখুন যেন খোকা ভারতের স্বাধীন মৃত্তিকায় চিতাশয্যা লাভ করে।

—দেশ অনেকদূর এগিয়েছে বৌদি, স্বাধীনতা আর কেউ ঠেকাতে পারে না!

—কিছুই এগোয় নি সেঁজুতি—এগোবার পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। কোথায় এগুবে—কারা এগুবে? যারা এগুবে, তারা কারাগারে—যারা বাইরে তাদের মধ্যে ভেদবিভেদ এমন মায়ার বন্ধন স্বষ্টি করেছে যে স্বয়ং মহামায়ারও সাধ্য নাই, সে জাল ছিঁড়তে পারে...।

—তুমি বড্ড নিরাশাবাদী হয়ে পড়লে বৌদি।

—না সেঁজুতি—আশাবাদী বলেই এখনও এই এককোঁটা আগুনকে বুকে করে আগলে রেখেছি। কিন্তু অন্ধকার এত বেশী—এত ভয়ানক যে এই ক্ষীণ প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতেও ভয় করে—মনে হয়, তেলের অভাবে এই প্রদীপের বুক জ্বলে উঠবে—অকল্যাণের বজ্রপাতে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে—অমঙ্গলে ছেয়ে যাবে সারা ভারত।

—যাক্—তবু দীপ আমরা জ্বালাবই। তেলের অভাব আছে বৌদি, কিন্তু প্রদীপের বুক আমরা জ্বলতে দেব না—সলতেই জ্বলবে। ঘী যদি নাই থাকে, আমাদের বুকের চর্বি আছে—রক্ত আছে, মজ্জা আছে।

—নাই আর; প্রায় সবই ফুরিয়ে এসেছে। এই যে নির্লজ্জ অন্নাভাব, এর পেছনের নগ্ন সত্যটার দিকে চেয়ে দেখ সেঁজুতি—রস-রক্ত-চর্ব্বি কিছু নেই—আছে শুধু অস্থি, শুধু কঙ্কাল, যার প্রেতায়িত বীভৎসতা সব সময় শীর্ণ আঙুল বাড়িয়ে তোর প্রদীপটি নিবিয়ে দিতে চায়, সে প্রেত এই দেশেরই মানুষের মৃত আত্মা থেকে উদ্ভূত। জয়চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আজকার বহু বহু স্বনামখ্যাত ব্যক্তির প্রেত্ এরা—জাগ্রত জনমনের প্রাণপণে জ্বালিয়ে রাখা মশালটি এরা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে চাইছিল পারে নি, তাই এবার ফায়ারব্রিগেড ডেকেছে, এই দুর্ভিক্ষ!

—তবুও পারবে না নেবাতে—সেঁজুতি সুদৃঢ় কণ্ঠে বললো—এ আগুন নিববে না বৌদি—এ তো কাঠ-কয়লার আগুন নয়—এ আগুন স্বাধীনতার মন্ত্রপূত আহিতাগ্নি—এ আগুন সূর্য্যের রশ্মি, জল ঢেলে একে নেবানো যায় না।

—মেঘের আড়াল বড্ড ঘন হয়ে উঠলো সেঁজুতি—সূর্য্যালোক আসতে পারছে না।

—সাময়িক—সূর্য্যালোক ঠিক আছে। আর আছে তার পেছনে স্বয়ং সূর্য্য!

একটি মুটের মাথায় সের দশেক চাল, সের দুই ডাল, আটা, তেল, ঘি আর কয়েকটা আনাজ নিয়ে উঠানে এসে দাঁড়ালো সুবোধ। বলল,

—শুনলাম, খোকা হয়েছে—আজ ক'দিন হোল বৌদি? দেখি কেমন ছেলে হয়েছে? বাঃ বাঃ চমৎকার চেহারা হয়েছে তো! উঃ কী ফর্সা, যেন সাহেবের বাচ্চা!

মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে স্বাহা মৃদু দৃঢ় কণ্ঠে বললো,

—আর্য্যবংশীয়েরা তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ছিলেন ঠাকুর পো—সাহেবদের থেকে সুন্দর ছিলেন।

সুবোধ নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে লজ্জিত হবার ভাণ করলো। এ বাড়ীতে সাহেব-প্রীতি কোনো দিন নাই, তিন পুরুষ ধরে এরা স্বাধীন ভারতের

স্বপ্ন দেখছে! এখানে খোকাকে সাহেববাচ্চা বললে এরা খুসীর বদলে বিরক্তই হবে—বললে,

—হ্যাঁ বৌদি—সত্যি। নিজের বাড়ীর ছেলেকে সাহেব বলে নিজেরই বংশের অমর্য্যাদা করছিলাম আমি। চমৎকার চেহারা হয়েছে খোকার! কি নাম রাখছো?

—গণাধীশ—ওর কাকা রেখেছে; কিন্তু এই মহামন্বন্তর কাটিয়ে ও যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমি নাম রাখবো যমাধীশ—বলে হাসলো স্বাহা—কিন্তু বাঁচবার আশা খুবই কম।

—ছিঃ বৌদি! ওসব কথা কি বলে। না বাঁচবার কি হয়েছে? লকুকে বললাম, একটা ভাল চাকরী আছে, নাও, তা আজ জবাব দিয়ে এল, নেবে না। তুমি বলো ওকে নিতে চাকরিটা।

—না—চাকরী নিতে আমিই বারণ করেছি।

—তুমি? কেন?

—কেন! তা ঠাকুরপোই তোমায় বলেছে আশা করি! না বলে থাকে তো শোনো, বহির্জগতের সবকিছুই আমাদের বন্দী হয়ে আছে, মুক্ত আছে আত্মাটি, তাকে আর বন্দী করতে চাই না।

সুবোধ চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বেশ চিন্তিত স্বরে বললো,

—কিন্তু এই কচি ছেলে, এত বড় সংসার আর এই মন্বন্তর—তোমরা বাঁচবে কি খেয়ে বৌদি? জেল থেকে দাদা একদিন নিশ্চয় ফিরে আসবেন, সেদিন তিনি বলবেন কি আমাদের?

—কিছুই বলবেন না। তিনি জানেন, এই মন্বন্তরের জল ঢেলে সমস্ত আগুন নেবানো হচ্ছে। ঘরের চাল যাদের খড়ের তারা আগুন নেবাতে চাইবেই।

সুবোধের সঙ্গের লোকটা চাল ডাল আটার ঝুড়িটা বারান্দায় নামিয়েছে। সুবোধ আস্তে আস্তে বললো—এ বিষয়ে তুমি আরো কিছু ভেবে দেখো

বৌদি। মানুষ বেঁচে থাকলে আবার আগুন জ্বালাতে পারে—বেঁচে থাকাই দরকার।

—না, যে-জীবন দাসত্বে পঙ্কিল আর দীনতায় ভিক্ষুক, সে-জীবন মৃত্যুর মধ্যে নব যৌবন লাভ করুক—জীর্ণ অথর্ব হয়ে তার বাঁচায় কোনো লাভ নেই। সে জীবন ভোগ তো করতে পারেই না, ত্যাগ করতেও তার ভীরুতা জাগে।

—তোমাকে বোঝাবার মতন বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নাই বৌদি—এই চালক'টা এনেছিলাম, আজ খোকার ষষ্ঠিপূজো, আমার আশীর্ব্বাদ মনে করে গ্রহণ কর।

স্বাহা বড় বিপন্ন বোধ করলো। খোকাকে আশীর্ব্বাদ করছে, বলে যদি কেউ কিছু দেয় তো সেটা প্রত্যাখ্যান করা বড়ই মুস্কিলের কথা, কিন্তু এই দানের পেছনে সুবোধের উদ্দেশ্য কি আছে, তাও জানে স্বাহা। সে উদ্দেশ্য, এই পরিবারটিকে যে-কোনো রকমে বশীভূত রাখা! কারণ যে-কোনো মুহূর্ত্তে এইখান থেকে আগুন জ্বলে সারা গ্রাম, সারা জেলা, এমন কি সারা দেশ জ্বালিয়ে দিতে পারে! স্বাহা ভেবে বললো,

—তুমি ওকে পায়ের ধুলো দিয়ে যাও ঠাকুর পো—চাল-ডাল খাবার মত তো ও এখনো বড় হয় নি—ওসব নিয়ে যাও।

—বৌদি—আমি বড় দুঃখ পাবো।

—কিন্তু উপায় কি ভাই! তোমার এই দান গ্রহণ করে আমি আমার পূজাপাদ শ্বশুরবংশকে ভিখারীর পর্যায়ে নামাতে পারবো না। তোমার এ দান, ভিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এই দানের উপাদান এসেছে হাজার জীবনকে বলি দিয়ে—এ কথা আমি ভাল জানি!

—আমার স্নেহভালবাসাকে তুমি এমন করে অস্বীকার করছো বৌদি?

—না! আমি জানি, তুমি আমাদের আত্মীয়—তোমাকে আমি স্নেহই করি ঠাকুর পো, কিন্তু তুমি পথভ্রান্ত—ভুল তোমার এখন ভাঙবেও না—তাই আমার দেশের মানুষ তুমি, আমার ছোট ভাইএর মত তুমি—কর্ত্তব্যের জন্যে

তোমাকে কিছুকাল ত্যাগ করছি। তুমি শুদ্ধ হও, বুদ্ধ হও, আত্মচেতনায় জাগ্রত হও—তখন তোমার দেওয়া ঐ প্রত্যেকটি চালের কণাকে আমি দেবতার আশীর্ব্বাদ মনে করবো।

সুবোধ উঠোনের একধারে রক্তকরবী গাছটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো, তারপর সেঁজুতিকে উদ্দেশ করে বললো,

—তুই কি করবি রে সেঁজুতি—চাকরিটা নিবি তো?

—না সুবোধ দা—চাকরীটা আমি নিতে পারবোনা—বললো সেঁজুতি।

—ও—আচ্ছা—বলে সুবোধ বেরিয়ে যাবার পথ ধরলো,—কিন্তু আর একবার স্বাহার উদ্দেশে বলে গেল—চালক'টা নিলে বড় সুখী হতাম বৌদি!

স্বাহা কেনো জবাব দিল না। ওর শাশুড়ী এ পর্য্যন্ত বৌমার আর সুবোধের কথা শুনছিল কয়েকটা গোবরের নাড়ু পাকাতে পাকাতে—এতক্ষণে মুটেটাকে বললো—যা বাছা, ওগুলো নিয়ে যা। মুটেটা গাঁয়ের লবন বাগ্দী—সে বললো,—লাও কেনে ঠাকরাণ! ই'বাজারে চাল কুথাও কিনতে মিলিবেক নাই—বাঁচবে কি খেয়ে! লাও!

স্বাহা বিরক্ত হয়ে বললো—তোমার অত কথায় দরকার নাই বাছা, যাও—ফিরে নিয়ে যাও ওগুলো—।

লবন আর কোনো কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু চালের ঝুড়িটাও তুলছে না—স্বাহা অবাক হয়ে বললো—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

—হুঁ—যাই। বলছিলাম কি ঠাকরাণ,—আজকের মতন চাট্টি চাল দি' কেনে······

—ওঃ করুণার অবতার একেবারে! অসহ্য বিরক্তিতে স্বাহা উঠে দাঁড়িয়ে বলল···—তোমার বাবু এই কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি? যাও—উঠোও ঝুড়ি!

লবন নির্ব্বাক—কিন্তু ও আর দেরী না করে ঝুড়িটা নিয়ে বেরুচ্ছে, লোকাধীশ ঘরে ঢুকলো। কোঁচার খুঁটে সেরখানেকতু চাল আর হাতে একমুটি

বৌ'টোকারী শাক। একচোখ দেখেই অবস্থাটা বুঝতে পারলো সে। বলল, —সুবোধ ভিক্ষা দিতে এসেছিল বুঝি?—হুঁ—দাতার সংখ্যাও খুব বাড়ছে বৌদি!

—বাড়বেই তো ভাই—নইলে লঙ্গরখানা খুলে দেশটাকে ভিখিরী করবে কারা? জীবনের মূল্য যাচাই হবে লঙ্গরখানায়—সারা পৃথিবী জানবে—ভারত ভিক্ষুকের দেশ। এতকাল মিস মেয়ো ইত্যাদির দল প্রচার করেছে ভারত অসভ্য দেশ—ভারত স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য দেশ, এবার ওরা বলবে— "ভারত ভিখারীর দেশ—আমরা ছিলাম, তাই লঙ্গরখানা খুলে ওদের জীবন রক্ষা করেছি!" তুমিও ভিক্ষা করে আনলে নাকি ঠাকুরপো?

—না বৌদি—অতটা এখনো উঠতে পারিনি—উঠবার আগেই যেন তোমাদের মরণটা দেখে যেতে পারি। এই চাল কটি পেলাম এক অদ্ভুত উপায়ে—

—কি উপায়ে?—বৌদির প্রশ্নে আগ্রহের রহস্য, তার সঙ্গে বিদ্রূপও মেশানো।

—তুমি ভেবো না বৌদি—চুরি ডাকাতি কিছু করিনি।

—করতে পারলে খুসী হতাম। চুরি ডাকাতির মধ্যে বীরত্বের মহিমা রয়েছে। দেশ জয় করে যে রাজা, সেও কম ডাকাত নয়—বীর ডাকাত। আমি ভয় করি ভিক্ষা করাকে—করুণ কাকুতিভরা গলায় চাকরী প্রার্থনা করাকেও।

—ভিক্ষা বা চাকরী কোনোটাই করিনি। রোজগার করেছি এই চালগুলো।

—রোজগার! এই বাজারে রোজগার কি করে করলে?—

—শেয়াল তাড়িয়ে!—বলে হাসলো লোকাধীশ। হাসিটা কান্নার থেকেও করুণ বোধ হচ্ছে। জানো বৌদি—সেই যে কবিয়াল জীবন ওস্তাদ—ওরই বাড়ীর পাশ দিয়ে আসছি—দেখলাম, ভাঙা আগুড়ের ফাঁকে একটা শেয়াল

ঢুকছে। দিনের বেলা গাঁয়ের ভেতর শেয়াল কেন, ভেবে দেখতে গেলাম ভেতরে ; দেখলাম, জীবনের বৌ আর বাচ্চা মেয়েটা মরে পড়ে রয়েছে ঘরে—কিন্তু বৌটার পেটের উপর একটা পুঁটুলি—খিদের জ্বালায় হয়তো পুঁটুলিটাই পেটে চেপে ধরেছিল—চাল কটা সেদ্ধ করে মুখ দিয়ে খাবার আর সময় হয়নি !

—শেয়ালে খাচ্ছিল ওদের ? স্বাহার কণ্ঠ বেদনাতুর।

—খাচ্ছে হয়তো এখনো। পুঁটুলিটা টেনে দেখলাম, এই কটি চাল ! ওরই বাড়ীর উঠোনে এই বৌটুকারী শাকও গজিয়েছিল—তুলে নিয়ে এলাম। এ চাল খেয়ে জীবন বাঁচানো কি ভালো হবে বৌদি ?

—হ্যাঁ—মরণের দ্বারপথে ওরা জীবনের অমৃত দান করে গেছে। ও চাল না খেলে ওই মেয়েটির আত্মার গতি হবে না ঠাকুরপো, মা'কে দাও—রান্না করুন।

—কিন্তু ঐ অমৃত একটা দিন মাত্র আমাদের বাঁচাতে পারবে বৌদি।

ঐ অমৃততে আমরা অমর হ'য়ে যেতেও পারি ঠাকুরপো—আমাদের মৃত আত্মীয়ের ঐ দান অগ্রাহ্য করো না। ওর কিছু অংশ সেঁজুতিকে দাও—নে সেঁজুতি।

সেঁজুতি আঁচলের খুঁট পাতলো। লোকাধীশ হাসছে। অর্দ্ধেক চাল সেঁজুতির আঁচলে ঢেলে দিতে বলল—বেঁচে থাক—এমনি করে তোরা পবিত্র হয়ে বেঁচে থাক। আর যে মরে মরুক—তোরা মায়ের জাত, তোরা খাঁটি হয়ে বেঁচে থাকিস্।

নদীটা বাঁক ফিরেছে উত্তর-পশ্চিম কোণার দিকে। এইখানে যে ত্রিভুজাকার মৃৎকোণটি গড়ে উঠেছে, তাতে অনতি উচ্চ পাহাড়, শাল-পিয়াল মহুয়ার প্রাচীন জঙ্গল—সানুদেশে কয়েক ঘর সাঁওতালের বসতি। পাহাড়টির নাম বিহারীনাথ—ওর উচ্চতম একটা শৃঙ্গে প্রাচীন একটা মন্দির আছে—নাম বিহারীনাথ—তাই পাহারের নামও বিহারীনাথ। পশ্চিম বঙ্গের শেষ প্রান্তে এই পাহাড় বাংলা আর বিহারের সীমা নির্দ্দেশ করে—যদিও বর্ত্তমানে পাহাড়টি বিহার প্রদেশের অন্তর্গত।

দীর্ঘ দিনের মন্দির—সংস্কার অভাবে জীর্ণ হয়ে গেছে। দুর্গম রাস্তা; ঘন বন আর হিংস্র জন্তুর ভয় আছে বলে সাধারণত কেউ যায় না সেখানে—কিন্তু কেউ যদি যায় তো প্রকৃতির সুমহান গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যাবে—আর একটা অপূর্ব্ব ভাব সে অন্তরে উপলব্ধি করবে—স্বাধীনতার সীমাহীন প্রসন্নতা। জায়গাটার উপর যেন কত দীর্ঘকাল মানুষের লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে নি—সরকারের শাসন ভ্রূকুটি করেনি। সবটাই যেন সেই আদিম দিনের স্বাধীন অরণ্য আর জীবনও তেমনি আরণ্যক। মুক্ত আকাশ আর উন্মুক্ত অরণ্য বাধাবন্ধহীন হয়ে ঘুমুচ্ছে, জাগছে, খেলা করছে আপনার মনে। গিরি নদীটি তাঁর সহচরী আর বন্য জন্তুগুলি যেন তার পুত্র-কন্যা। আপনার মনে সংসার পেতে পাহাড় বিহারীনাথ যেন বহুকাল থেকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বসবাস করছে।

মাঝে মাঝে দু'একজন দুঃসাহসী ভ্রমণকারী মন্দিরটি দেখতে যায়—শিল্পের সূক্ষ্মতায় মুগ্ধ হয়ে দু'একখানা ফটো তুলে এনে মাসিক সাপ্তাহিকে ছাপায়—দু'পয়সা রোজগার করে হয়তো, কিন্তু বিহারীনাথের ওসব গ্রাহ্যের মধ্যে আসবার কথা নয়; তিনি আপনার আনন্দে আপনি সম্পূর্ণ।

শুক্ল পক্ষের রাত্রি সেদিন। চাঁদের আলোকে বনভূমি হাসছিল, আর বনের দুলালরা খেলা করছিল ঝোপের আড়ালে, নদী সৈকতে, পাহাড়ের

চূড়ায়। সন্তানের সঙ্গে প্রকৃতিমাতার এমন নিশ্চিন্ত ক্রীড়াবিলাস সভ্য জগতের এত কাছে বড় একটা দেখা যায় না—এখানে তিনি সেই আদিম দিনের মা—হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে তাঁর সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র মানুষ যখন তার সভ্যতার কুঠার হাতে নিয়ে নগর বসাতে আরম্ভ করে নি—ভ্রাতৃবিরোধ মা'র অঙ্গচ্ছেদ ঘটায় নি—বড় আর ছোটর বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেরাও বিড়ম্বিত হয় নি। মা তখন ছিলেন পূর্ণ স্বাধীন আর মানুষ ছিল তার সর্ব্বকনিষ্ঠ আনন্দ দুলাল। সেদিনের কথা মানুষের আজ মনে নাই; সে বড় হয়েছে—তাই ভুলে গেছে, কিন্তু মা ভোলেন নি—তাই পৃথিবীর বহুস্থানেই তিনি এখনো সেদিনের সেই স্নেহ-শ্যামল অঞ্চল বিছিয়ে গোপনে বসে থাকেন—ছেলেদের ডাকেন, বলেন, —ওরে ফিরে আয়—ফিরে আয় তোর সেই যাযাবর বাল্যজীবনে, স্বাধীন আরণ্যক জীবনে—স্বয়ং চালিত স্বরাজ-জীবনে ফিরে আয়!

কিন্তু কেউ ফেরে না। সবাই ভুলে গেছে সে-কথা, যেদিন এই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ সামান্য গুটিকয়েক পাথরের অস্ত্র আর ডজন কয়েক শব্দের অভিধান নিয়ে সভ্যতার সৃষ্টি করতে নগরের পত্তন করেছিল—বীর আর বুদ্ধিমানকে বড় বলে স্বীকার করতে গোষ্ঠির সৃষ্টি করেছিল—আবার বড় গোষ্ঠির সঙ্গে ছোট গোষ্ঠির বিরোধ সৃষ্টি করে উৎসন্ন যাবার পথ প্রশস্ত করেছিল—হিংসা, দ্বেষ আর পরধনলোলুপতার প্রবৃত্তিকে বারম্বার উত্তেজিত করে নিজেদের সাম্যজীবনের শান্ত ধারাকে উৎখাত করে তুলেছিল—প্রবল প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার নেশায় মত্ত হয়ে বিরাট বিপুল বিশ্বগ্রাসী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। হ্যাঁ, ঐ ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতাই তাদের সভ্যতা সৃষ্টির মূল উপাদান—যে সভ্যতা আজ মানুষকে মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে প্রলোভিত করে—মানুষকে ইতর-জীবনের মত বন্দী করে, ক্রীত-দাস করে রাখতে প্রেরণা যোগায়—মানুষের শান্ত বাসভূমিকে অনল বর্ষণে উৎসন্ন করে দেয়—জীবনকে শৃঙ্খলিত করে। সভ্যতার এই পূর্ণ পরিণাম!

কিন্তু মানুষের রক্তে আজো রয়েছে সেই যাযাবর আরণ্যক জীবনের সাম্যবাদ—সেই শান্ত-সমাহিত জীবনের মধুর আস্বাদ—সেই স্বরাজ্য-সাধনার সুমহান গৌরব—তাই মানুষ মাঝে মাঝে বড় বড় বুলি ঝাড়ে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই লেখে—থিয়োরী খাড়া করে সাম্যবাদের—কিন্তু হায়রে মানুষ! সে পথে ফিরে যাবার পথ যে রুদ্ধ করেছে সে নিজেই। তার অন্তরের অন্তহীন লোলুপতা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে—বধির করে দিয়েছে, বিকৃত করে তুলেছে। তবু মানুষ থিয়োরী খাড়া করছে—বলে, পৃথিবীতে আবার সাম্যবাদকে সে প্রতিষ্ঠিত করবে—সে আরও অধিক সভ্য হবে—আরো বড় মানুষ হবে। থিয়োরীটাকে ভাঙছে, গড়ছে, আবার ভাঙছে—কিন্তু যে শান্ত সুবিমল জীবন সে ছেড়ে এসেছে—সেখানে তার আর ফেরা হবে না—সে তাও জানে।

জানে!—সাম্যবাদ নিতান্তই কাল্পনিক মনোবিলাস—কিন্তু স্বাধীনতা মনোবিলাস নয়—তার প্রয়োজন ঠিক অন্নপানীয়ের মতই। জীবনের রক্ষার্থে স্বাধীনতা অপরিহার্য—ব্যষ্টি স্বাধীনতা এবং সমষ্টি স্বাধীনতা—তাই ঋষি বলেছেন—"স্বাধীনতায় সবের জন্মগত অধিকার"—সে অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু বঞ্চিত করছে। সবল মানুষ দুর্ব্বল মানুষকে নির্ম্মমভাবে বন্দী করেছে—পরাধীন করে রাখছে—পদলেহন করাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর মানব সমাজের উত্থান-পতনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—দুর্ব্বল চিরকালই দুর্ব্বল ছিল না—দুর্ব্বল থাকবে না। অনন্ত দুঃখবেদনার মধ্যেও যে জীবন পরাধীনতার গ্লানি সয়েও বেঁচে আছে, সে জীবন দুর্ব্বল নয়—সে জীবন সহস্রাব্দি সঞ্চিত পিতৃপুরুষের পুণ্যে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত নিষ্ক্রীয়—কিন্তু তার ক্রীয়াশীলতা যেকোনো মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারে—কিন্তু কবে সে করবে আত্মপ্রকাশ! কবে—কবে?

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটা বনভূমির বাতাসে নীলিন হয়ে গেল সন্ন্যাসীর! দীর্ঘ জটাজাল আন্দোলিত করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—তারপর ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন নীচের নদীর পানে—অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—বন্দে মাতরম্।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবানন্দ নন উনি, জীবানন্দের সন্তান একজন। ধারণাতীত অত্যাচার উৎপীড়নে-ওঁর দেহ জীর্ণ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা হয়নি। স্বাস্থ্য-সুন্দর সুদীর্ঘ দেহ—উজ্জ্বল পীতাভ বর্ণ, আয়ত চক্ষু দুটীতে অসীম ভবিষ্যতের আশা স্বপ্ন—বার্দ্ধক্যের চিহ্ন মাত্র ললাটের কয়েকটি বলিরেখা। ঐ প্রত্যেকটি রেখায় লেখা আছে স্বাধীনতাকামী ভারত-সৈনিকের অগ্রগমন-ইতিহাস, সে ইতিহাস জাতির ব্যথা-বেদনায় রক্তসিক্ত কিন্তু আশা-আশঙ্কায় অমলিন। সে ইতিহাস বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক অধ্যায়ের এক বিরাট গৌরবস্তম্ভ কিন্তু মৃত্তিকায় প্রোথিত। স্বাধীন ভারতের আগামীদিনের প্রত্নতাত্ত্বিক ভিন্ন সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হবার আশা নাই—তবু উনি আশায় অপেক্ষা করছেন। সেদিন অনতিবিলম্বে আসবে—এবং উনি ততদিন বেঁচে থাকবেন—ওঁর হাতের বিজয়পতাকা সেই অনাগত জীবনাগ্নিকণাকে দিয়ে যাবেন।

দু'পাশের বিশাল বনস্পতি—কত শত বর্ষ ধরে এরা দেখছে ভারতের উত্থান-পতন। তার থেকেও প্রাচীন এই বিহারীনাথ পাহাড়—আর ঐ গিরিনদী ওদের প্রতি অঙ্গে ক্ষোদিত হয়ে আছে সেই ইতিহাস আর অশ্রুজল। সাধু অন্তরের আবেগ সম্বৃত করে অতীতের চিন্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ত্তমানের নগ্ন সত্যের ভূমিতে নেমে এলেন—নদীকূলে স্তব্ধ কয়েকটি মনুষ্য মূর্ত্তির পরিবেশে।

বন্দে মাতরম্!—আর একবার উচ্চারিত হল, সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষীণ মনুষ্যকণ্ঠ অরণ্যানী গ্রহণ করে বললো, বন্দে মাতরম্—তারপর স্বয়ং বিহারীনাথ সেই পবিত্র ধ্বনিটুকু আপনার সহস্র শৃঙ্গে সহস্রবার প্রতিধ্বনিত করে শুনিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী বললেন—আজ আমাদের কৃষ্ণলালের মৃত্যু-তারিখ—তোমরা হয়ত জানো না—হয়তো ভুলে গেছ বন্ধুগণ—কিন্তু মনে রেখো, জাতির বেদনার ইতিহাসে কৃষ্ণলাল অবিস্মরণীয়; স্বাধীনতার মুক্তি-মঞ্চের সেই শ্রেষ্ঠ শহীদকে স্মরণ কর।

সকলেই একসঙ্গে বললো—ভাই কৃষ্ণলালের আত্মার অগ্নিতে আমাদের অন্তর প্রজ্জ্বলিত হোক—আমরা তাঁর স্মৃতিতে সাগ্নিক থাকবো। সন্ন্যাসী নীরবে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। একজন প্রশ্ন করলো,—

—গুরুদেব! ভারতের সেই বিপ্লব-আন্দোলন ব্যর্থ হবার মূল কারণ কি?

—কারণ আমরা—তোমরা; ভারতের সেই চির পুরাতন জয়চন্দ্র, উমীচাঁদ, মিরজাফরের দল—কিন্তু সে আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি বৎস! সে আন্দোলন যতটুকু যা করবার তা ঠিকই করেছে। ব্যর্থ সে হয় নি—হতে পারে না।

—কিন্তু গুরুদেব—কে একজন কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। সন্ন্যাসী বললেন,—

—বুঝেছি! তোমার প্রশ্ন, সে আন্দোলন যখন ইংরাজ-রাজের বেয়নেট বন্দুকের তলায় উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—সার্থক হোল কেমন করে? হ্যাঁ,—ভেবে দেখ—সেই আন্দোলনই জাতীয় জীবনের মর্ম্মমূলে স্বাধীনতার স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে—সেই আন্দোলনই জাতিকে জাগিয়ে—দিয়েছে—জানিয়ে দিয়েছে—স্বাধীনতায় তার জন্মগত অধিকার—নইলে আজকার এই কংগ্রেসের 'কুইট্ ইণ্ডিয়া আন্দোলন' জন্মাতো না।—অসহযোগের কথা উঠতো না। অহিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভের আধ্যাত্মিক পথ আবিষ্কৃত হোত না।

—কিন্তু অহিংসায় কি স্বাধীনতা লাভ সম্ভব? এই তো নেতারা জেলে গেলেন?

—আমি মনে করি না যে অহিংসাদ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যাবে—কিন্তু হিংসাকেও আমি সমর্থন করি না—কারণ, হিংসাত্মক কার্য্যের মুলে জাতীয় সমর্থন আমরা পাই নি—সাস্ত্রাসবাদ আন্দোলনের অকালমৃত্যু তার প্রমাণ।

—তবু তো আপনি এখনো সন্ত্রাসবাদী প্রভু!—কে যেন কথার বিদ্রূপ ছুঁড়ছে।

—না—সন্ন্যাসী ধীর শান্ত স্বরে বললেন—না, আমি আর সন্ত্রাসবাদী নই। সাম্যবাদীও নই—অহিংস কি না তোমরা বিচার কর। আমার মত আমি

তোমাদের কাছে আজ বলবো—তাই তোমাদের আজ ডেকেছি—আমি ধর্ম্মবাদী। যে ধর্ম্ম মন্দিরের পুতুল পূজার ক্লীবত্বে পর্য্যবসিত হয় না—যে ধর্ম্ম অর্জ্জুনের অখণ্ড প্রতাপে কুরুক্ষেত্র বিজয়ে সমর্থ, যে ধর্ম্ম শুধু ধর্ম্মকে রক্ষার জন্যই সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে গিয়েও স্বপ্রতিষ্ঠ থাকে—শ্রেয় লাভের জন্য বহু বিঘ্ন বরণ করে। কিন্তু সঙ্গে থাকে তার সারথী, গীতা-উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ।

সন্ন্যাসী একটুক্ষণ থামলেন—তারপর আবার আরম্ভ করলেন—বৎসগণ, দীর্ঘ নয় বৎসর পরে আজ আবার তোমাদের ডেকেছি আমি—কেন ডেকেছি, সেই কথাই বলবো। সে গভীর কথা শুনবার জন্য তোমরা আশা করি প্রস্তুত হয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ প্রভু!—সকলেই সমস্বরে উত্তর দিল—সাড়া দিল না শুধু একজন। সে নির্ব্বাক। সন্ন্যাসী বলতে আরম্ভ করলেন—আমার প্রাক্তন বন্ধুগণ অনেকেই এখন ভারতে। কেউ গিরিগুহা আশ্রয় করেছেন, কেউ আধ্যাত্মিক চেতনা-লাভের জন্য আশ্রমবাসী, কেউ বা জাতীয় ধর্ম্মকে এবং জীবনকে ঐক্যবদ্ধ করতে নিয়োজিত। কিন্তু যে শক্তিমন্ত্র, যে অগ্নিকণা, যে জীবনবেদ আমরা জাগ্রত করেছিলাম, তা পরবর্ত্তীদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে, অবমানিত হচ্ছে, অনাদৃত হচ্ছে। আমাদের পথ বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক—এবং আজও সেই একই লক্ষ্য—স্বাধীনতা।—হিংসাবাদের অভিমন্যুর অপমৃত্যু হয়েছে কিন্তু অহিংসার আশ্রয়ে এসে কংগ্রেস দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ শুদ্ধজীবন যাপন করলো—আর এই কংগ্রেসই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত। জাতির জীবন-মূলে স্বাধীনতার রস-প্রেরণা জুগিয়েছে এই কংগ্রেস—কিন্তু দুর্ভাগা এই জাতি সুদীর্ঘ ষাট্ বছরেও দলাদলি হিংসা-দ্বেষ ভুলে একত্র হতে পারলো না, এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিতে পরিণত হতে পারলো না…এর মূল কারণ…

—ধর্ম্মের অভাব…কে যেন কঠোর বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলে উঠলো পেছন থেকে!

—হ্যাঁ, ধর্ম্মেরই অভাব—মানব ধর্ম্মের, বীর ধর্ম্মের—নিষ্ঠা ধর্ম্মের অভাব।

একবার ভারতের অদ্বিতীয় নিষ্ঠাবান নেতা দেশবন্ধু বলেছিলেন—"তিনি উকিল হয়ে অনেক চোর-জোচ্চর দেখেছেন, কিন্তু কংগ্রেসে যত বেশী দেখেছেন, এমন আর কোথাও না— *

—কিন্তু গান্ধী মহারাজ স্বয়ং মূর্ত্তিমান ধর্ম্মরাজ— তাঁর উপাসনা, উপবাস, মৌনব্রত—তাঁর পাওয়া আদেশ প্রত্যাদেশ সবই ধর্ম্মের উপর ভিত্তি

--হ'তে পারে—কিন্তু কোনো অলৌকিক আদেশ প্রত্যাদেশ লাভকে স্বরাজ লাভের যোগ্য ধর্ম্ম বলে আমি মনে করি না—সে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জীবনে বড় ধর্ম্ম হতে পারে ; জাতীয় জীবনে তার মূল্য নগণ্য।

—ব্যক্তিই সমষ্টিগত হইলে জাতি হয়—পশ্চাতের সেই লোকটি আবার বিদ্রূপ করল।

—না, ব্যক্তি চিরকালই ব্যষ্টিগত ; আপনার স্বার্থ-দ্বেষ-হিংসা, লাভ অলাভই ব্যক্তির কাছে চিরদিন বড় হয়ে দেখা দেয় কিন্তু সেই মিলিত ব্যক্তিদের নিয়ে যখন জাতি গঠিত হয়, তখন সে ব্যক্তি থাকে না— সে হয় তখন স্বদেশের একমাত্র বংশধর—তার ধর্ম্ম তখন হওয়া উচিৎ স্বদেশের কল্যাণ কামনা, তার কর্ম্ম তখন হওয়া উচিৎ স্বদেশের মঙ্গল সাধন, সে হয় তখন একটি আদর্শ। যেমন—কোনো ব্যক্তি তার সব সম্পত্তি বেশ্যাবাড়ীতে গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে গেল—কর্ম্মের ফল তার ব্যক্তিগত জীবনেই ফলবে, কিন্তু কোনো জাতি তার স্বদেশকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দিতে পারে না— সেখানে ব্যক্তি সমষ্টিগত। ব্যক্তি যা করে সেটা তার নিজ দায়িত্বে কিন্তু সমষ্টির দায়িত্ব উচ্চতর, ব্যক্তি আর জাতি এক নয়, এবং ব্যক্তিদ্বারা জাতি সৃষ্ট হলেও দুধ থেকে ঘী হওয়ার মতন জাতি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। ব্যক্তি মরবে, কিন্তু জাতিকে অমর হয়ে থাকতে হবে তার আদর্শের মধ্যে। ব্যক্তি দাস হতে পারে কিন্তু জাতি নিশ্চয় স্বাধীন হবে—ব্যক্তি ধার্ম্মিক, বীর বা অধার্ম্মিক, কাপুরুষ হতে

* নির্ব্বাসিতের আত্মকথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

পারে কিন্তু জাতিকে নিশ্চয়ই ধাৰ্ম্মিক এবং বীর হতে হবে—অবশ্য ব্যক্তির মানসিক পুষ্টিতেই জাতির মর্ম্ম পুষ্ট হয়—ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে জাতি সৃষ্ট হয় না—তবুও ব্যক্তি আর জাতি এক নয়—কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় আলাদা —শোন সব !

—আজ্ঞা করুন প্রভু !

সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা বললেন।

* * * *

গুরুদেবকে প্রণাম করে সতের জন সেবক বেরিয়ে গেল—রইল একজন। সুন্দরকান্তি যুবক সে—বয়স আন্দাজ পঁচিশ। স্থান নির্জ্জন হ'লে সে বললো—আপনার ধর্ম্মবাদ এবং পূর্ব্বের সেই সন্ত্রাসবাদের তফাৎটা কি প্রভু ?

—তফাৎ অনেক। সন্ত্রাসবাদের পশ্চাতে ছিল রাজশক্তির প্রবলতম বাধা, আর আমার পরিকল্পিত এই ধর্ম্মবাদের পিছনে থাকবে রাজশক্তির সমর্থন। সন্ত্রাসবাদের মধ্যে ছিল বিশ্বাসঘাতকের নির্লজ্জ নীচতা, এর পিছনে থাকবে প্রত্যেক সৈনিকের সুদৃঢ় নিষ্ঠাভক্তি—সন্ত্রাসবাদ জাতীয় চেতনায় ভীতির সৃষ্টি করেছিল—এই ধর্ম্মবাদ জাগাবে অভয়মন্ত্র জাতীয় চেতনায়—আছাড়া সন্ত্রাসবাদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে পট্‌কাবাজির ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছিল—এটা হবে বীরের সুনিশ্চিত পরিকল্পনার যুদ্ধব্যূহ—তফাৎ অনেক—কিন্তু তুমি বুঝতে চাইছ না কেন ?

—কারণ, সন্ত্রাসবাদ অচল—তাই আমি গান্ধীজির অহিংসাবাদকে সমর্থন করি ; এর থেকে ভালো উপায় আমাদের আর নেই।

—সন্ত্রাসবাদ চলবে না। জনকয়েক যুবকের কয়েকটা হাতবোমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটীশ সাম্রাজ্যের একটা চুলও খসে না—অনর্থক দেশের কতকগুলি নিষ্ঠাবান, প্রতিভাবান সন্তানের অপমৃত্যু ঘটলো। কংগ্রেস স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রণী কিন্তু বৃটিশরাজ সারাভারত জুড়ে ভেদনীতির চক্র চালিয়ে রেখেছেন—

এবং কংগ্রেসেও ভেদনীতি অপরোক্ষভাবে ঢুকে গেছে—কংগ্রেসেও যে বড় রকম প্রাদেশিকতা রয়েছে, দিনকয়েক তার কার্য্যাবলী পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়। তাছাড়া হিন্দু মহাসভা, সিডিউল কাষ্ট, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদি হাজার বিড়ম্বনা। এর উপর হিন্দু মুসলমান সমস্যা তো আছেই—কাজেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে একতাবদ্ধ হ'তে বলেই দায়মুক্ত হবেন—যেমন এই ক্রীপ্‌স প্রস্তাবটায় হলেন। এমন প্রস্তাব কতবার এল—কোনো ফলই হোল না, কোনোদিনই কোনো ফল হবে না।

—তবু প্রস্তাব আসছে কেন ?

—বিশ্বের দরবারে জাতি বিশেষের মহত্ত্ব আর উদারতার অভিনয় ও গুলি! ও গুলি দেখিয়ে প্রমাণ করা হচ্ছে যে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে ওঁরা সব সময়েই রাজি, কিন্তু ভারত প্রস্তুত নয়—এবং প্রস্তুত হতে পারছে না।

—আপনার পরিকল্পনাকে তাঁরা কিভাবে গ্রহণ করবেন—বুঝতে পারছি না।

—পরিকল্পনাটা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহলে গ্রহণ তাঁদের করতেই হবে কিন্তু কার্য্যে পরিণত করার পূর্ব্বেইতো ঘটছে মতদ্বৈধ। এইটাই ঘটে থাকে দুর্ভাগা ভারতে—চিরদিন এইটাই ঘটেছে—সন্ন্যাসী সখেদে বললেন শেষের কথাটি।

যুবক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—আমি ভাল করে বুঝে নিতে চাই ব্যাপারটা। ভেবে দেখুন—ক্রীপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হোল—কংগ্রেস গ্রহণ করলো না সে প্রস্তাব—গান্ধীজি বললেন—"ও প্রস্তাব তামাদি হয়ে যাওয়া চেক একখান" কিন্তু আপনি বলছেন—আমরা যদি ধর্ম্মতঃ নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার পরিকল্পনামত কাজ করি—তাহলে সরকার তুষ্ট হয়ে আমাদের স্বরাজ দেবেন······

—সরকারের তুষ্টির কথা বলছিনা আমি···আমি জানি, সরকার কোনো দিনই স্বরাজ দিতে ইচ্ছা করেন না—আমি বলছি, আমাদের শক্তি বৃদ্ধির

কথা। আমরা এই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান, সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় একত্র হয়ে যেতে পারবো—একযোগে দাবী জানাবো—সরকারের ভেদনীতিকে ব্যর্থ করে দেব।

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে এ উপায়ে কিছু হতে পারে—কারণ ভেদনীতি বৃটিশ শাসনের মূলনীতি। ঐ নীতিতেই বৃটিশ জয় করেছে ভারত, এবং ঐ একই নীতিতে শাসন করছে ভারত।

সন্ন্যাসী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার একটা নিশ্বাস ফেললেন —আমার নেতৃত্বে যদি তোমার বিশ্বাস অটুট না থাকে, তবে তুমি অন্য পথ গ্রহণ কর ইন্দ্রজিৎ—আমার পরিকল্পনা সুচিন্তিত। এর এক চুলও আমি বদলাব না—আমাকে যারা নেতা বলে স্বীকার করবে, তারা হবে সৈনিক, তারা শুধু আদেশ পালন করবে—কোনো প্রশ্ন করবার অধিকার তাদের নাই।

—কিন্তু গুরুদেব, কৃপা করে ভেবে দেখুন, ইংরাজের সাহায্য করে বর্ত্তমান যুদ্ধে তাদের জয়লাভ করিয়ে দিয়ে আমরা কোনো কিছুই লাভ করবো না।

—জয়লাভ ইংরাজ করবেই। যে-জাতি ঐক্যবদ্ধতায় এবং একনিষ্ঠতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি—ডিসিপ্লিন যাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত—নেতার আদেশই যাদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ বলে সম্মানিত, সেজাতি জয়লাভই করে।

আমাদেরও সেগুণ আছে প্রভু! আপনার মুখেই শুনেছি, প্রথম সন্ত্রাসবাদীদের যখন আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ব্যারীসাহেব নাকি তাঁদের বলেছিলেন "you see that block younder it is there that we tame lions" * আমরা যে সিংহ একথাটা ব্যারী সাহেবের অবচেতন মনে

---

* নির্ব্বাসিতের আত্মকথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

স্বীকৃত ছিল—কিন্তু তারা সিংহকে পোষে বলে ভুল করেছে—সিংহকে পিঞ্জরে বন্ধ করেছে!

—হ'তে পারে তোমরা সিংহ এবং পিঞ্জরাবদ্ধ—পোষ মাননি—কিন্তু আমিই বলেছি, ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ পর্য্যন্ত যে সন্ত্রাসবাদ ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে গুপ্তচক্রান্ত দ্বারা ভারত স্বাধীন করতে চেয়েছিল, তাদের সব ছিল, দেহে অমিত শক্তি, মনে অনমিত তেজ—'জীবন মৃত্যু তাদের পায়ের ভৃত্য' ছিল কিন্তু ছিল না নেতাকে মানবার মত মন। অতি বুদ্ধিমান এই নির্ব্বোধ ভারতবাসী মনে করে—তারা প্রত্যেকেই নেতা হবার যোগ্য হয়ে জন্মেছে! অনিরুদ্ধের মত নেতা, যার মাথার জন্য সেদিন হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, সেই অজেয় নেতার নেতৃত্ব উপেক্ষিত হয়েছে—রস্তুসিংএর মত বীর যুবকের সম্মান করেনি তারা। এদেশে বিশ্বাসঘাতক চিরদিনই আছে—! কিন্তু নেতার সুশৃঙ্খল পরিচালনায় হয়তো সে বিশ্বাসঘাতকতাকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারতো।

—আপনার নেতৃত্বে আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই প্রভু—বিশ্বাস করুন, আমি তবু আপনার পরিকল্পনার সাফল্যের কথাটা নিয়ে···

—ইন্দ্রজিৎ!—সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—আমি জানি, এই হতভাগ্য দেশের কোনো আশা নাই, তাই তোমাদের মত কুলাঙ্গার জন্মায়। নেতার পরিকল্পনার সমালোচনা সৈনিকের করবার কথা নয়—কিন্তু আমি শুনেছি—তুমি আবার সন্ত্রাসবাদের পাগলামী আরম্ভ করেছো। অনর্থক কতকগুলো দেশপ্রাণ যুবকের জীবন নিয়ে তুমি হোলি খেলা করছো—তুমি নিজেই নেতা হয়ে উঠেছো। তোমার উপর অনেক আস্থা ছিল আমার, কিন্তু বুঝলাম—তোমার মতি এখনো বালকোচিত চপল! যাও, তোমার মত এবং পথ বেছে নাও গিয়ে—আমার কর্ম্মচক্র থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিলাম।

—গুরুদেব!

—না—কোনো কথা নয়—সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের সময় তোমার মত

তার্কিত এবং উচ্ছ্বাসপরায়ণ যুবক দলে নিয়ে আমরা ঠকেছি—এবার সাবধান হতে হবে !

সন্ন্যাসী ধীরপদে উপরে উঠতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ আবার বলল—আমায় ভাবতে সময় দিন গুরুদেব !

—ভাববার শক্তি তোমার নাই—তুমি অগ্নিতে ঝম্পদানোদ্যত পতঙ্গমাত্র।

সন্ন্যাসী পাহাড়ের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ আরো মিনিটকয়েক দাঁড়িয়ে থেকে নীচের উপত্যকার পথ ধরে নামতে লাগলো। মনে তার গভীর চিন্তা, নিবিড় উৎকণ্ঠা। কিন্তু হৃদয়খানা যেন বেদনার ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। দীর্ঘ নয় বৎসর সে অপেক্ষা করেছে—শিক্ষা লাভ করেছে এই গুরুর কাছে, আজ তাঁর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেল !

কিন্তু গুরুদেব ভুল করছেন। ধর্ম্মবাদ প্রচার করে, মৈত্রী এবং প্রীতি-ধর্ম্মের বন্ধনে জাতিকে একত্র করে সাম্য এবং স্বাধীনতার প্রচেষ্টা—সে কি সম্ভব ? ইংরাজ অত সহজে স্বরাজ দেবে না ভারতকে। ইন্দ্রজিৎ সুদৃঢ় কণ্ঠে বললো—না—ও পথ, পথ নয়।

কিন্তু পথ কি ? পথ কোথায় ? এ পর্য্যন্ত যে-কটি পথ আবিষ্কৃত হয়েছে, সবইতো বাতিল হয়ে গেল—কোনটাই কাজে এল না—তাহলে উপায় কি ভারতের ! ইন্দ্রজিৎ ভাবতে ভাবতে নদী পার হয়ে এপারে এল। বন এদিকে খুবই বিরল হয়ে এসেছে—দূরে দূরে দু'একটি সাঁওতাল-পল্লী—আরো মাইলখানেক এসে রেল লাইন। ঐ নদীটার উপরই একটা ব্রিজ—তার উপর রেল লাইন গেছে। আপ-ডাউন লাইন—উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইন্দ্রজিৎ এসে দাঁড়ালো সেই ব্রিজটার কাছে। চারজন যুবক ওখানে উপস্থিত ছিল একজন বলল,

—কলকাতার অবস্থা খুবই সাংঘাতিক, আজ বিকালে গুলি চলেছে—জনকয়েক মরেছে—কয়েকটা ছেলেকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ !

—ক্ষতি কতখানা তারা করতে পেরেছে—সেই কথাটাই আগে শুনতে চাই!

—দু'খানা ট্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে—টেলিফোন লাইন আর ট্রামের তার বহু যায়গায় কেটে দিয়েছে—কয়েকটা পুলিশের লোককে জখম করেছে...

—আসল জায়গায়—গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে ?

—না—কারণ পাঠান সোলজার আর মেসিনগান বার করেছে ওরা !

—ও ! আচ্ছা, এই ব্রিজটা ধ্বসিয়ে দেবার সব ঠিক হয়েছে ?

—হ্যাঁ—ডাউন পাঞ্জাব্ মেল আর আপ্ দিল্লী এক্সপ্রেস প্রায় এক সময়েই পাস করবে এর উপর—তখুনি ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে ব্রিজ। সব ঠিক করা রয়েছে—আর টেলিগ্রাফের তারও কেটে দেওয়া দবে—ঐ দেখুন।

ইন্দ্রজিৎ দেখলো,—টেলিগ্রাফের তার-বোঝাই খুঁটোতে দুটি যুবক চড়ে বসে রয়েছে—অদেশ পাবামাত্র তারা তার কেটে দিতে পারবে।

প্রসন্ন হয়ে উঠলো ইন্দ্রজিতের অন্তর—১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়েছিল, তারপর ১৯১৬ থেকে ১৯৪১ পর্য্যন্ত বোমা আন্দোলন আর এই ১৯৪২ সালে হচ্ছে আগষ্ট আন্দোলন—এবার ইংরাজকে বেশ কায়দায় ফেলা যাবে। অহিংবাদ ! ছোঃ ! ওতে কখনো স্বরাজ লাভ হয় ?

—আমাদের আন্দোলন সারা ভারতেই আরম্ভ হয়ে গেছে—মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, সর্ব্বত্র—সেই যুবকটি বললে।

—হ্যাঁ—কিন্তু মণিলাল, খুব সাবধানে এবার অগ্রসর হতে হবে—কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে—পূর্ব্বে দু'দুবার আমরা অকৃতকার্য্য হয়েছি। এবার যেন আর অসাফল্যের বেদনায় দেশমাতৃকাকে চোখের জল ফেলতে না হয়।

—চেষ্টার আমরা ত্রুটি করছি না—ইন্দ্রজিতদা—কিন্তু একটা জায়গায় শুধু খটকা লাগে—এই রকম গুণ্ডামী করে সিভিল গভর্ণমেণ্টের যৎকিঞ্চিত ক্ষতি হয়তো আ... করতে পারি—কিন্তু এতে ইংরাজরাজের কতটুকু বা লোকসান ! বেশী লোকসান তো আমাদেরই ! আমাদেরই দেশের লোক মরছে—আমাদের ঘাড়ে ট্যাক্স বসিয়ে না হয় রেলভাড়া বাড়িয়ে আর্থিক ক্ষতিপুরণ করে নেবে। গভর্ণমেণ্ট আমাদেরকেই জেলে ভরে...

—থাম মণিলাল। নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে না পার, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে দাও —কিম্বা নয়, আদেশ পালন কর।

মণিলাল স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে স্রোতোচ্ছল নদীটার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল—যে কথাগ সে মাণিলালকে বললো, সে কথা এইমাত্র গুরুদেবের কাছ থেকেই শুনে এসেছে। গুরুদেবের পথটাকে ইন্দ্রজিৎ ভুল পথ মনে করে, কিন্তু তার পথটাও তো ভুল পথ হতে পারে? ইন্দ্রজিৎ জানে—এই বিপ্লবাত্মক কার্য্যে কংগ্রেসের সমর্থন নাই। দেশবাসীরও সমর্থন নাই। বৌদ্ধযুগ থেকে ভারত অহিংসায় দীক্ষা নিয়েছে—হয়তো তার পূর্ব্ব থেকেই ভারত মৈত্রী এবং প্রীতির উপাসক। হিংসাকে ভারত শুধু অসমর্থন করে নয়, ঘৃণা করে। ভারতের বীরধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম গোপনতার আশ্রয়ে লালিত হয় না—গুপ্তভাবে কাউকে আঘাত করে না—সে ধর্ম্ম সম্মুখ যুদ্ধে চিরদিন মৃত্যু বরণ করতেই শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষার সংস্কার আবশ্যক—ইন্দ্রজিৎ ভাবতে লাগলো—সেই বীরধর্ম্মের দিন এখন আর নাই। এখন ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিপাতই রণনীতি, ভারতবাসীকেও সেই নীতিতে দীক্ষা নিতে হবে—নইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভবের অধিক। কিন্তু স্বাধীনতা কি আসবে ভারতের? বিশেষতঃ এই সামান্য কয়েকটা যুবকের ক্ষীণ প্রচেষ্টা, রেল-লাইন উৎখাৎ; ট্রাম জ্বালানো আর তার কেটে দেওয়া তো স্রেফ্ গুণ্ডামী ছাড়া কিছু নয়। দুর্দ্দান্ত অজেয় ব্রিটিশসিংহের একটা কেশরও ছিঁড়বে না এতে। অনর্থক কতকগুলি দেশপ্রাণ অপোগণ্ড বালকের অপমৃত্যু ঘটবে—গুরুদেব ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ স্বাধীন নয়—তার উপরিতম নেতার আদেশ—তাকে নির্ব্বাক থেকে পালন করতে হবে—ফলাফলের চিন্তার তার অধিকার নাই। ইন্দ্রজিৎ এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তার প্রাচীন বিচক্ষণ পূর্ব্বগুরুর নেতৃত্ব ত্যাগ করে এসেছে—কারণ তাঁর মতে এবং পথে ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস করে না। কিন্তু যার মতে এবং পথে বিশ্বাস করতে চাইছে ইন্দ্রজিৎ, তাঁরই মত কি ঠিক মত! কে

জানে? ইন্দ্রজিৎ ভাবছিল—আকস্মাৎ ট্রেণের শব্দ—বিকট আওয়াজ করে পাঞ্জাব মেল আসছে। মণিলাল হুইসিল বাজালো—সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফের তারগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়লো মাটিতে—তারপরেই ব্রিজের নীচে রাখা বোমার লম্বা ফিউজে লাগানো হোল আগুন। মণি ছুটে গিয়ে ইন্দ্রজিতের হাত ধরে বললো,

—চলো—পালাও ইন্দ্রজিতদা…চলো—এসো!

—যাও, তোমরা আগে চলে যাও—আমি দেখতে চাই দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা।

—সেকি ইন্দ্রদা! এইখানে এতো কাছে দাঁড়ালে তোমার গায়ে স্প্লিণ্টার লাগতে পারে ..তাছাড়া ধরাও পড়তে পারো।

—সে আমি বুঝবো—যাও তোমরা—ইন্দ্রজিৎ নদীগর্ভে নেমে গেল বালিতে!

ছেলেগুলি আর কিছু বলবার সাহস না পেয়ে গভীর বনের মধ্যে ঢুকলো গিয়ে—কিন্তু ইন্দ্রজিৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নদীর বালিতে! বিদ্যুতের মতো একটা আলো—সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—ব্রিজটার প্রায় অর্দ্ধেকখানা উড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীবাহী বিরাটকায় ট্রেনখানাও এসে পড়লো সেখানে—এঞ্জিন এবং সামনের কয়েকটা বগি নদীগর্ভে হুমড়ি খেয়ে পড়লো এসে। আর্ত্তনাদ—মর্ম্মান্তিক মরণের আর্ত্তনাদ! উঃ! আকাশকেও বুঝিবা বধির হয়ে যেতে হচ্ছে এই আর্ত্তকণ্ঠ শুনবার ভয়ে। স্তব্ধ অরণ্যানী বুকে নিয়ে সুপ্ত বিহারীনাথ পাহাড় যেন মানুষের এই নিষ্ঠুরতায় শিউরে উঠলো। ওঃ! কি করুণ কান্না! কিন্তু সমবেত এই কণ্ঠধ্বনির ভাষা ভারতীয়! ভারতেরই নিরীহ, নির্ব্বোধ, নিঃসহায় কয়েকশত লোক মৃত্যুপথ যাত্রী—আর সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীই!—একে নির্দয় গুণ্ডামী! ধীর মস্তিষ্কে ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে—বিপ্লববাদের এই ক্ষীণ প্রচেষ্টার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর নাই।

গুরুদেবের ধর্ম্মবাদ এবং সম্প্রীতিবাদের পথ ভুল পথ হতে পারে—কংগ্রেসের অসহযোগও ভুল পথ হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু এই বিপ্লবের পথ

নিশ্চয়ই ভুল! অন্য দেশের ইতিহাসে এমন গুপ্ত ষড়যন্ত্র বা এনার্কিজিম্ সার্থক হলেও হতে পারে, ভারতে নয়—ভারতমাতা এই গুপ্ত ছুরিকাকে ঘৃণা করেন।

কিন্তু এবার পালাতে হবে—ইন্দ্রজিৎ নদীর কিনারা ধরে দ্রুত হঁাটতে লাগলো—কোথায় যাবে জানা নাই—রাত প্রায় দুটো—ইন্দ্রজিৎ হেঁটে চলেছে!

ভোরের আকাশ তখনো প্রভাতের বন্দনায় মুখর হয় নি—ঘরের বাইরে রোয়াকে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে—অষ্টাদশী বালিকা,—সেঁজুতি। ওদের ঘর থেকে দূরের সড়ক রাস্তাটা দেখা যায়—আধো-অন্ধকারে আবছা হয়ে সর্পিল পথটা পড়ে রয়েছে—সেঁজুতি সেই দিক পানে তাকালো। উত্তর-পুর্ব্ব দিকে রাস্তাটা চলে গেছে নদী পার হয়ে ওপারের কোন্ না-জানা পথে। কয়েকটা টর্চ্চ বার বার জ্বলে নিবিয়ে যাচ্ছে ঐ নদী ধারে! ব্যাপার কি—সেঁজুতি বুঝিতে পারছিল না—এমন সময় অতগুলো টর্চ্চ জেলে ওখানে কারা? প্রথমটায় সে ডাকাত মনে করেছিল—পরে তার ভুল ভাঙলো, ডাকাত হলে গ্রামে আসতো—নদী ধারে কি কর'বে? তাহলে কে ওরা?

কিন্তু সেঁজুতিকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না—ঐ নদীধারেই একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ—তার তলায় চণ্ডী ঠাকুরের বেদী বাঁধান। সেঁজুতি দেখতে পেল, একটা কি যেন জানোয়ার হামাগুড়ি দিয়ে এসে ঐ বেদীর আড়ালে লকুলো। নদীধার থেকে টর্চ্চের তীব্র আলো রাত্রি-শেষের আঁধারকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে—কিন্তু জন্তুটাকে ওরা দেখতে পেল না। কি জন্তু ওটা?—বাঘ টাঘ নয়তো! না!—বাঘ এখানে কোথায় আসবে! কিন্তু ওরা বোধ হয় শিকারী —আর ঐ জন্তুটা শিকার। খুব সম্ভব বন-শুয়োর।

টর্চ্চ হাতে লোকগুলো এই দিকেই আসছে—ওদেরই হাতের আলোতে সেঁজুতি দেখতে পেল, বেদীর আড়ালের জন্তটা হাঁটু গেড়ে বসে ওদের দেখছে—ওম্মা, জন্ত তো নয়! এযে মানুষ! সেঁজুতি অবাক হবার সময় পেল না। লোকটা অশ্বত্থগাছের আঁধারের আড়ালে তীরবেগে ছুটে একেবারে সেঁজুতির সামনে এসে পড়লো—চোখদুটো সত্যি তার জানোয়ারের মত জ্বলছে! সেঁজুতিকে সামনে দেখে বলল—একটু আশ্রয়—একটু লুকোবার ঠাঁই!

সেঁজুতির মাথার মধ্যে মূহূর্ত্তে চিন্তার বিদ্যুৎ খেলে গেল। গত রাত্রের সেই প্রচণ্ড শব্দটার নায়ক তাহলে এই ইনিই' খবরের কাগজে ক'দিন থেকেই এঁদের কীর্তিকাহিনী পড়ছিল সেঁজুতি—কিন্তু ভাববার সময় নাই। টর্চ্চ হাতে ওরাও ছুটে আসছে। সেঁজুতি লোকটার হাত ধরে টেনে এনে তাদের গোয়াল ঘরে ঢুকিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিল।

ভোর হয়ে আসছে—এখন সেঁজুতি উঠে বাহিরে আসতে পারে, কিন্তু টর্চ্চ হাতে লোকগুলো এখনো গ্রামের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাঙা একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে দেখছিল সেঁজুতি। ওরা হয়তো আর একটু পরে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের ঘর তল্লাসী করবে। সেঁজুতির বাড়ীও বাদ যাবে না। তখন ঐ লোকটাকে কি করে বাঁচাবে সেঁজুতি! ওর মা-বাবা, ছোট ভাইরা এখনো ঘুমুচ্ছে। গোয়ালঘরে একটা মাত্র গরু—তার জন্ত রাখাল রাখবার দরকার হয় না—আর গরুটাকেও হয়তো আর রাখা যাবে না—পেটের দায়ে বেচে ফেলতে হবে—এ সময় সেঁজুতি এমন একটা কাণ্ড করে বসলো! এক কাপ চা করে যে লোকটাকে খাওয়াবে, তারও সম্বল নেই। সেঁজুতি আস্তে এসে গোয়ালঘরের আগুড়টা ঠেলে বললো—

—কৈ—কোন্‌দিকে রয়েছেন?

—এই যে! ওরা চলে গেছে?

—ওরা কি অপনাকে না নিয়ে যাবে ভেবেছেন! ভোর তো হ'য়ে এল—

এবার কোন্‌দিকে পালাবেন, পালান ! এ বাড়ীতে নিশ্চয় থানাতল্লাসী হবে, কারণ আমার বাবা আর আমি দাগী কংগ্রেসী···

—পালাতে আর পারবো না—জানেন, রাত্রে কত মাইল রাস্তা নদীর কিনারা ধরে কাঁটা ঝোঁপে আর কাদায় ছুটে এসেছি—মানুষ তো !

—ভারি উপ্‌কার করেছেন দেখ্‌ছি—আহা ! ব্রিজটা ভেঙে ক'শ' লোককে খুন করলেন ?

অ্যাঁ !···লোকটার পিঠে যেন কে চাবুক মারলো ! প্রায় আধ মিনিট সে চেয়েই রইল সেঁজুতির মুখের পানে। সেঁজুতিই বললো—বুঝেছি ! আপনারা তো দেশ-সেবক নন—খুনী আসামী। কিন্তু কি করবো, আমাদেরই দেশ-ভাই লজ্জার কথা—আসুন। হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে এল সেঁজুতি রান্নাঘরে। বললো,—চিনি নেই, গরম জল আর চা দিয়ে, একটু খাওয়াবো ?

—দিন ! বলে লোকটা বসে পড়লো ঐখানেই। সেঁজুতি একবার তাকিয়ে বলল—

—মায়ের বাছা ! এসব কাজ কি আপনাদের ধাতে পোষায় ?—যা নধর চেহারাখানি—বড়লোক নিশ্চয় ?

—না !

হ্যাঁ—বলে সেঁজুতি কয়েকটা কাট কুটো জেলে জল চড়িয়ে দিল। তারপর ওঘরে গিয়ে চা নিয়ে এল—ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গেছে, আর সদর দরজায় কে ডাকছে।

—গিরিন বাবু—ও গিরিন বাবু ! দরজাটা খুলুন !

সেঁজুতিই সাড়া দিল—যাচ্ছি—কিন্তু গরম জলে চা ছেড়ে দিয়ে ছেঁকে একটা বাটিতে ঢেলে দিল লোকটাকে—একডেলা ভেলিগুড়ও দিল তাতে—বলল,

—খান—আমি দেখছি ওদের—বলে বাইরের দরজায় এসে ভেতর থেকেই বলল—কে ? কি চান ?

—এই বাড়ীতে একটা গুণ্ডা-বদমাস ঢুকেছে মনে হয়—দেখতে চাই।

. —আশ্চর্য্য ! সকালে এখানো দরজা খুলি নি, আর কি সব যা-তা বলছেন আপনারা ?

—বলছি যে এই বাড়ীতে সে লুকিয়ে আছে—খুলুন !—কথায় ওদের ধমকের সুর !

যদি না থাকে !—পাল্টা ধমক দিল সেঁজুতি—এই বুদ্ধি নিয়ে পুলিশে চাকরী করেন ! যদি বা সে কারো বাড়ী ঢোকে তো ঢুকবে, কি আমাদের মতন কংগ্রেসওয়ালাদের বাড়ী ?—যাতে আপনারা এসে গ্যাক করে ঘাড়টি ধরতে পারেন !

—কিন্তু এই দিকে কি যেন একটা ছুটতে দেখছি আমরা।

—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ ! কী ছুটতে দেখছেন তাও জানেন না ! আমাদের চোরা গাই গরুটাকে ছুটতে দেখেছেন। খড় জাব জোটে না বলে রোজ রাত্রে ওকে নদীধারের ক্ষেতে ফসল খেতে ছেড়ে দিই, ভোরে ফিরে আসে। আসুন ! সেঁজুতি দরজাটা খুলে আবার বললো—এই যে গরুটা···আমিই বাঁধি কি না—তাই এত ভোরে উঠতে হয় আমায়—সেঁজুতি আগে এসে গোয়ালঘরটার দরজায় দাঁড়ালো। আগুড়টা আগে থেকেই খোলা ছিল। আর বাইরে থেকেই দেখতে পওয়া যাচ্ছিল ছোট্ট একটা গরু। পুলিশের লোক তিনটে বোকার মত একবার সেঁজুতির দিকে চেয়ে বাড়ীর উঠোনটাও চেয়ে দেখলো। সেঁজুতি বললো—আর কি দেখবেন—ভাতের হাঁড়ি ? হিঃ হিঃ হিঃ !—

তরুণ-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। পুলিশের লোক তিনজন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে—বলল,—

—কিছু মনে করবেন না—আপনার গরু আমাদের বেশ নাকাল করেছে !

—সত্যি আমার দুঃখু হচ্ছে, দারোগাবাবু ! আপনাদের কৃপায় চিনি তো পাওয়া যায় না, গুড় দিয়ে খাবেন একটু চা ? আমার আগুন তৈরী আছে, দেরী হবে না।

তিনজনেই ওরা ক্লান্তি বোধ করছে খুব—আর এ বাড়ী ওদের বিশেষ

পরিচিত, তাই বললো—দিন তাই। হারামজাদাদের পিছনে ছুটে হায়রান হয়ে পড়েছি!

—বসুন বৈঠকখানায়—সেঁজুতি এসে শেকল খুলে দিল একটা ঘরের। বললো,—বাবাকে ডেকে দিচ্ছি, দাদা তো অপনাদের বাড়ীতে অতিথি—জানেন নিশ্চয়ই!

—হ্যাঁ—বলে ওরা তিনজনেই বসল একটা চৌকীতে। সেঁজুতি যাবার সময় বলে গেল,

—পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি দেরী হবে না—বসুন!—চলে গেল সেঁজুতি!

দারোগা বললো—এরা ভালো—এই কংগ্রেসীরা। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসে দাঁড়াও, সঙ্গে সঙ্গে ওরা বলবে—চলুন দারোগাবাবু! আর ঐ যে শালার বিপ্লবী জুটেছে—ওঃ, কী দুর্ভোগটাই গেল সারা রাত!

—কিন্তু একজনকেও ধরা গেল না—কৈফিয়ৎ কি দেবেন স্যার!

—আরে রাখো। ধরা অমনি মুখের কথা কিনা! এই বন জঙ্গল পাহাড়—রাত্রিকাল--কে কোথায় সিঁধুলো, কার বাবার সাধ্যি ধরে—থানায় ফিরে গিয়ে ঠেসে একটা রিপোর্ট লিখে দেওয়া যাবে।

—একটাকেও যদি অন্ততঃ ধরতে পারতাম…।

—তোমার পদোন্নতি হোত। কিন্তু ভেবে দেখ আকবর খাঁ—যারা এই সব কাজ করছে, তারা আমাদেরই দেশের ছেলে। ধরতে পারলে হয়তো তাদের ফাঁসী হয়ে যাবে।

—হওয়াই তো উচিত…উত্তরে বললো আকবর খাঁ।

—উচিৎ নিশ্চয়ই! যখন চাকরী করি তখন ঔচিত্য বোধটাকেও চাকরী করাতে হয়।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না, কি আপনি বলতে চান?

—বলছি, সোনার ভারতের সোনার ছেলেগুলোর হাতে লোহার বালা না পরাতে পারলে চাকুরীজীবীর আত্মা অভিশপ্ত হবে—কিন্তু থাক

সে কথা—চা খেয়ে সটান থানায় যাবে, নাকি নদীধারটা আর একবার ঘুরবে ?

—আপনি যেমন ইচ্ছা করেন।

—তাহলে চলো, থানাতেই ফেরা যাক্। আমরা খবরটা লেটে পেয়েছি, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল—আমাদের কর্ত্তব্য ঠিকই করেছি আমরা।

খাঁ সাহেব চুপ করে রইল। দারোগা বুঝলো, খাঁ সাহেব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ইতিমধ্যে সেঁজুতির বাবা গিরীন বাবু এসে নমস্কার জানালেন, হেসে বললেন,—ছেলেটা তো গেছে, আমাকেও নিয়ে যাবেন নাকি ?

—না—না, গিরীনবাবু, বসুন ! সুপ্রভাত ! আপনার গরুটির জন্যই এতটা নাকাল হতে হয়েছে।

—ওটাকে বেচে ফেলতে চাই—প্রথমটা ও চোরা-গাই, দ্বিতীয় টাকার দরকার। নইলে আর খাওয়া চলে না।

—কত টাকা দাম হতে পারে ? দারোগা শুধুলো সাগ্রহে !

—দুধ তো সেরখানেক দেয়, কাজেই যুদ্ধের বাজারে টাকা পঞ্চাশ দাম হবে।

—বড্ড বেশি বলছেন ! সত্যি যদি বেচেন তো আমাকেই দেবেন, কিন্তু টাকা ত্রিশ······

—বড্ড কম বলছেন, আচ্ছা, মাঝামাঝি রফা হোক—চল্লিশ।

সেঁজুতি চা নিয়ে এল তিনটে বাটিতে। দারোগা একটা নিয়ে বলল,

—চিনি কিছু আমি পাঠিয়ে দেব চৌকীদারটার হাতে।

—থাক, ধন্যবাদ—সেঁজুতি বললো—যে চিনি বাংলার সাতকোটি লোকের মুখে উঠতে পায় না—সে চিনি আমাদের মুখেও রুচবে না দারোগাবাবু !

যেন চাবুক মারলো দারোগার পিঠে, কিন্তু সামলে দারোগা বললো,

—আমাদের সরকার থেকে রেশন দেওয়া হয়।

—জানি। সরকারের আপনাদের পরমাত্মীয়। কিন্তু স্বাধীন দেশ হলে

এই অগণ্য প্রজাই সরকারের পরমাত্মীয় হোতো, আপনারা রেশন পেতেন প্রজাদের ভাগ আগে দিয়ে তারপর—কিন্তু এদেশের প্রজা তো মানুষ-প্রজা নয়, মালিকের আয় বাড়াবার মুরগী—আপনারা পালক।

—সকলের জন্তই রেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে—কাগজে পড়েন নি?

—পড়েছি—আজ মাস দু'তিন থেকে পড়ে আসছি—সরকারের এই প্রচার বিভাগটির কাজ খুবই নিখুঁৎ। এঁদের মাইনে বাড়ানো উচিৎ।

আবার বিদ্রূপ। মেয়েটা বিদ্রূপ করতে নিদারুণ ওস্তাদ। কিন্তু এ বেশ বলে কথাগুলো। বেশ তীক্ষ্ণ আর জ্বালাময়। দারোগা সেঁজুতির মুখের পানে চেয়ে বলল—আমরা চাকর মিস্ ..

হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। আমি বলছিনা যে আপনারা মালিক—কিন্তু আপনারা ভুলে যান যে আপনারা শুধু সরকারের চাকর নন, দেশেরও চাকর! আহা, কিছু মনে করবেন না, আই মিন, দেশেরও সেবক। কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় জানেন?—এই যেমন আপনাদের রাত্রের গরু ধরা—ধরতে চান একটা গুণ্ডাকে, ধরতে ছুটলেন গরু—তেমনি, করতে চান চাকরী, করেন মনিবানি।

হাসছে সেঁজুতি, হাসিটা ব্যঙ্গের, কিন্তু ভারী মিষ্টি। ওর ধারালো দাঁতের মতই ধারালো হাসি। দারোগাবাবু একঢোক চা গিলে বলল—পেটের দায়ে আমাদের এই অকর্ত্তব্য করতে হয়...

আকবর খাঁ বললো—না, ঠিক তা নয়—আমরা যে দেশের কোনো কাজে লাগি না, একথা সত্যি নয়।

—খুব লাগেন—হিঃ হিঃ হিঃ—দেশের কাজে লাগেন, দেশের ছেলেমেয়ের পিছনে লাগেন, দেশের অর্থের অপব্যয়ের পথে লাগেন...হিহিহি...হিহিহি...!

হাসি যেন একটা ব্যারাম মেয়েটার, কিন্তু পুলিশের লোক এতখানি চাপল্য সইতে পারে না। দারোগাবাবু চায়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে বলল,—গরুটা তাহলে...

—হ্যাঁ, কারো হাত দিয়ে টাকাটা দেবেন পাঠিয়ে,—গরুটা নিয়ে যাবে—বললেন সেঁজুতির বাবা।

—চল্লিশ টাকা ?

—গোটাদশেক টাকা থাকে তো দিয়ে যান না এখন—বাকি ত্রিশ টাকা পরে পাঠাবেন···সেঁজুতি হাত পাতলো। সেই সোনার মত হাত দারোগা প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। নিজের কাছে পাঁচটা মাত্র টাকা ছিল আর পাঁচ টাকা খাঁ সাহেবের কাছে ধার নিয়ে সেঁজুতির হাতে দিতে দিতে বললো,

—আপনার তেজস্বিতা সত্যি আমার ভালো লাগলো। আপনি বীর নারী।

—ধন্যবাদ! কিন্তু বীর নারী থাকলে বীর সন্তানও জন্মাবে, তখন আপনাদের অসুবিধা হবে।

—তা হোক্, সে আমাদের গৌরব—ভুলে যাবেন না, আমিও এই দেশে জন্মেছি।

—আপনার পদোন্নতির সম্ভাবনা নেই দেখছি···হিঃ হিঃ হিঃ!

দারোগা এবং অন্য সকলেই বাইরে এল। খাঁ সাহেবের ইচ্ছে ছিল বাড়ীখানা একটু তদারক করে। কিন্তু দারোগাবাবু বড্ড যেন ভিজে গেছেন এই মেয়েটার কথায়। তা'ছাড়া চা খাওয়ার পর আর খানাতল্লাসী করা ভালো দেখায় না। তিনজনে নমস্কার আদান প্রদান করে বেরিয়ে গেল!

সেঁজুতির বাবা ইসারায় শুধুলো—সে কোথায় ?

—ঐ গাছতলায় দারোগাদের ঘোড়া ছিল, তারই একটায় চড়ে দৌড়েছে! হি হি হি!

—সে কিরে ? ধরা পড়ে যাবে যে!

—না,—বললো, হেঁটে সে এক পাও যেতে পারবে না। আর ধরা পড়লেই বা কি করা যাবে বাবা? আমি ওকে জানিয়ে দিলাম যে, ওসব ছেলেমানুষী আর গুণ্ডামীতে আমাদের বিশ্বাস নেই! ও দেশের ছেলে, তাই কোনোরকমে বাঁচিয়ে দিলাম আজ।

—ঈশ্বর ওকে নিরাপদে যেন পৌঁছে দেন। কি নাম বললো?

—জানি না, জিজ্ঞেস করিনি তো!—সেঁজুতি চলে যাচ্ছে, বাবা আবার শুধুলেন—যাবে কোথায়, কলকাতা, না অন্য কোনো জায়গা?

—কি জানি, তাও জিজ্ঞেস করিনি!—সেঁজুতি রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে।

ওর বাবা উঠোনে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আপনার মনেই বললেন,

—সোনার দেশ, সোনার সব ছেলেমেয়ে—কিন্তু কার অভিশাপে এদের এত দুর্দ্দশা মা ভারত-জননি!



কাজে যোগ দেয় নি মজুররা। আজ সোমবার—একটা মজুরও কারখানায় এল না। প্রকাণ্ড কারখানাটা খাঁ-খাঁ করছে—যেন পুরোনো কেল্লা। গেটে গুর্খা দারোয়ান ছুঁচোলো গোঁফ পাকিয়ে গাদা বন্দুক নিয়ে বসে আছে। ম্যানেজার আর মালিক মোটরে চড়ে এসে পৌছালেন। শূন্য—সব শূন্য, ফাঁকা একেবারে যেন প্রকাণ্ড একটা মৃতদেহ—ওর প্রাণশক্তি মজুররা! যন্ত্রদানব যতই বিরাটকায় আর শক্তিশালী হোক—এখনো ওর ধমনিকে ধুকধুক করাবার জন্য মানুষের প্রয়োজন হয়—মানুষের প্রাণ নইলে ও বাঁচতে পারে না।

ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে মালিক মোহিত বাবু বললেন—আরও আগে আপনার সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল।

—ঠিক বুঝতে পারি নি স্যার! শনিবারও কোনোকিছু টের পাওয়া যায় নি। কাল সকালে শুনলাম ইন্দ্রজিৎ বাবু···ম্যানেজার থামলো।

—কি করেছে ইন্দ্রজিতবাবু?—মোহিত বাবুর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত শোনাচ্ছে।

—তিনিই এর মূলে স্যার! বাইরের কোনো লোক হলে আমি তাকে সাবাড় করে দিতাম···কিন্তু কি বলবো···

—ইন্দ্রজিৎ বাইরেরই লোক! তাকে ভেতরের লোক ভাব্‌বার কি এমন কারণ ঘটলো জানতে পারি ম্যানেজার বাবু?

—আজ্ঞে স্যার, শুনেছিলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ মালিক কাবেরী দেবীর সঙ্গে ওঁর নাকি বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।

—একেবারে পাকা হয়ে গেছে? কোথায় শুনলেন আপনি এসব কথা? আশ্চর্য্য!

—এখানেই সব লোকরা বলে স্যার!

—না—শুনুন, আমার মেয়ে এত ফ্যালনা নয় যে একটা গুণ্ডার হাতে তাকে বিলিয়ে দেব। আর এই মিল, এই ব্যবসা অনেক রক্তব্যয় করে গড়া আমার। ইন্দ্রজিৎ তাকে লণ্ডভণ্ড করবে—এ আমার সইবে না। শুনুন, যেমন করে হোক মজুরদের ফিরিয়ে আনুন—মজুরী বাড়ান, রেশনের ব্যবস্থা করুন। চাল ডাল, আটা, কাপড়, এমন কি, দরকার হলে…যা কিছু চায় তারা, দেবার প্রতিশ্রুতি দিন।

—প্রতিশ্রুতি?

—হ্যাঁ—প্রতিশ্রুতি। ওর বেশি কিছু তারা কোনো দিন পায় নি—পাবে না! মজুর চিরদিন মজুর থাকবে—আর…

—হুজুর থাকবে চিরদিন হুজুর, কেমন স্যার? —বলে এসে দাঁড়ালো ইন্দ্রজিৎ।

—হ্যাঁ—কিন্তু তোমার আস্পর্দ্ধা তো বড্ড বেড়েছে দেখছি ইন্দ্রজিৎ?

—একা আমারই বাড়ে নি মিঃ চ্যাটার্জী! আমার মতন সব মজুরদেরই বেড়েছে। হুজুরশ্রেণী আর মজুরশ্রেণীর মধ্যেকার বিরাট প্রাচীর তারা ভাঙবে—তাই এই দিকে-দিকে আয়োজন—সব সমভূমি করে দেবে তারা, তাদের ঐ কাস্তে আর হাতুড়ি পিটিয়ে…

—সাট্‌ আপ্‌! তোমায় আমি পুলিশে দিতে পারি…জানো?

—জানি! কিন্তু একজন মজুর জেলে গেলে অখণ্ড মজুর-স্রোতের প্লাবন থামবে না।

মিঃ চ্যাটার্জি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন, কিন্তু আবার বললেন,—উদ্দেশ্য কি তোমাদের ?

—এই সব ভেদ বিভেদ ধ্বংস করে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা—যে পৃথিবীতে হুজুর মজুর এক হয়ে যাবে—কল-মালিক আর কল-চালক এক পর্য্যায়ে নেমে যাবে—উঁহু, উঠে যাবে—পৃথিবীর শ্রম-জীবনের হবে নবতম বিবর্ত্তন !

—তা হয় না ইন্দ্রজিৎ—থিয়োরীতে যা লেখা যায়, প্র্যাকটিসে তা সম্ভব নয়—হুজুর থাকবেই এবং মজুরও থাকবে···ওসব বড় বড় কথা পুঁথিতেই মানায়—যাও, মজুরদের কাজে যোগ দিতে বল।

—আমি তো তাদের 'হুজুর' নই স্যার।

—হ্যাঁ—তুমিই হুজুর! যে ওদের পরিচালনা করে, সেই ওদের হুজুর। ওরা চিরকাল অপরের পরিচালনায় চলে এসেছে। মানুষ যখন গোষ্ঠীগত ভাবে বনে-জঙ্গলে বাস করতো, তখনো তাদের চালাবার জন্যে ছিল নেতা, সর্দ্দার—পৃথিবীর আদিম দিনের এই ইতিহাস এবং আজকার তোমাদের এই সাম্যবাদের যুগেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মস্তিষ্কজীবী চিরকাল স্নায়ুজীবীর উপর প্রভুত্ব করে এসেছে—চিরকালই করবে।

—কিন্তু স্নায়ুজীবী মজুরদেরও জীবন আছে স্যার—তারাও বাঁচতে চায় ?

—বাঁচাবার জন্যেই তো মস্তিষ্ক-জীবীদের এত পরিশ্রম। ওদের দুখানা হাত ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই—তাই বুদ্ধিমানরা ওদের জন্য কাস্তে আর হাতুড়ি তৈরি করে দিয়েছে—নইলে ওরা না খেয়ে মরতো। ভবিষ্যতের বুদ্ধিজীবীরা যদি মজুরকে বাদ দিয়েই কলকারখানা চালাতে পারে তখন ওদের অবস্থা কি হবে, ভেবে দেখ।

—তখন ওরাও কলকারখানার মালিক হতে পারবে।

—পারবে না—পারলেও সে কারখানা চালাবার শক্তি ওদের জন্মাবে না। সকল মানুষ, এমন কি কোনো দুটি মানুষ সমান নয়। সকলের মধ্যে সমান হবার ইচ্ছার চেয়ে সকলের মধ্যে সকলকে ছাড়িয়ে উঠবার ইচ্ছাটাই উৎকট

রকমে জাগ্রত। ঈশ্বর এই জন্যই বুদ্ধিজীবী আর শ্রমজীবী সৃষ্টি করেছেন—এ হচ্ছে বিধাতার ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়া—মানুষের এতে হাত নেই।

—কিন্তু ভবিষ্যতের মজুর শিক্ষায়-দীক্ষা আজকার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সমান হ'য়ে যেতে পারে।

—ভবিষ্যতের বুদ্ধিজীবীরা আরো উন্নত যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারে—যখন মজুরকে আর দরকারই হবে না—ধান কাটবার জন্য কাস্তে লাগবে না, এমন কি ধানেরও প্রয়োজন হবে না—খাদ্য জন্মাবে ল্যাবেরেটরীতে।

—তবে কি বলতে চান, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কয়েকটি বুদ্ধিজীবী মাত্র রাজত্ব করবে—শ্রমজীবী থাকবে না—তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে?

—না—তারা ঐ বুদ্ধিজীবীদের আরামের জন্য শ্রমজীবী হয়েই থাকবে। শোন ইন্দ্রজিৎ—মানুষের জগতে এই শ্রমবিভাগ অনাদি এবং অন্তহীন। কোনো সাম্যবাদ বা কমিউনিজম একে উৎখাত করতে পারে না। কোনো দিনই পারবে না। আজ শ্রমিকদের জন্য যেটুকু সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা, ভালো কোয়ার্টার, ক্লাব, লাইব্রেরী, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, পেন্‌শন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি—সে সব ঐ ধনিকরাই করে দিয়েছে কৃপা করে, ভবিষ্যতে আরো হয়তো ভাল করে দেবে—কিন্তু তাই বলে শ্রমিক কখনো ধনিকের সমান হতে পারবে না। শ্রমিকের এই দাবী নিতান্তই হাস্যকর—আর তোমাদের ঐ কমিউনিজমের থিওরী বাচাল ছেলের কথার ফুলঝুরি—শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু ওতে আগুনের দাহিকাশক্তি তো নাই-ই, উত্তাপও বিশেষ নাই।

—কিন্তু ঐ আন্দোলন জনমতের ঐকান্তিক সমর্থন পাচ্ছে।

—না; "জন" নামে কোনো শব্দের কোনো অর্থ নাই। 'জন' শব্দটাই ধাপ্পাবাজি! ওদের মধ্যে যে ক'জন বুদ্ধিমান আছে, ওটা তাদেরই মনগড়া থা—আর ঐ বুদ্ধিটুকু দিয়ে মত খাড়া করে ওরা নেতা সেজে ওদের হজুর য়েছে—বায়ু চিরদিন মস্তিষ্কের গোলাম—তোমার দেহে, তোমার সমাজ-দেহে,

তোমার রাষ্ট্র-দেহেও। যাও, আর দেরী করো না—আর বিকেলে বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করবে আজ—কথা আছে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি মোটরে উঠে ষ্টার্ট দিলেন। ইন্দ্রজিৎ বললো,

—ওদের দাবী না মেটালে আমার কথা ওরা শুনবে না।

—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ওদের দাবী মেটাবো—কি ওরা চায়, আমাকে আজই জানিও তোমারা—ওদের না বাঁচালে আমাদের চলবে না—কাজেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

—শুধু প্রতিশ্রুতিতে ওরা মানবে না—ওদের জন্য ভাল খাদ্য, ভাল পোষাক, ভাল জীবনযাত্রার উপাদান চাই।

—ও! আচ্ছা। ওরা পাবে—তবে যে বলছিলে, ওরা হুজুর হয়ে উঠতে চায়—কিম্বা হুজুর-মুজুরের মাঝের দেওয়াল ভেঙ্গে সমান করে দিতে চায়? এখন তো শুনছি, ওদের দাবী নিতান্তই সামান্য। হাঃ হাঃ হাঃ!

মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে মিঃ চাটার্জ্জি বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজার বাবু বললো —যান ইন্দ্রজিৎ বাবু, ওদের আসতে বলুন। মিলিটারী সাপ্লাই দিতে হবে, এখন কাজ বন্ধ করলে চলে না।

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল—ও ভাবছে, মিঃ চাটার্জি যে কথাগুলো বলে গেলেন, তার মধ্যে সত্য কতখানি আছে। সত্যি ঠিক হুজুব-মুজুরের উপর প্রভুত্ব কোনোদিন ঘুচবে না। হৃদয়হীন হুজুরশ্রেণী চিরদিন মজুরের ওপর প্রভুত্ব করে চলবে। হ্যাঁ—তাই তো মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো কারখানার কোয়াটার গুলোর দিকে। বিরাটকায় একটা অশথ বৃক্ষের তলায় জন চল্লিশ-পঞ্চাশ লোক বসে রয়েছে। ইন্দ্রজিৎ এসে দাঁড়ালো। মাতব্বর মহাতপ প্রশ্ন করলো প্রথমেই—মালিক বাবু কি বললেন?

"মালিকবাবু!" এই গণচেতনার উদ্বোধন বাণী! মালিকবাবু যে 'মালিক' এই ধারণা এদের জন্মগত। সত্যি এরা স্নায়ু—মস্তিষ্কের চিন্তাতেই এরা কম্পিত

হয়, সাড়া তোলে—নইলে এরা পঙ্গু। ইন্দ্রজিৎ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললো,

—তোমাদের দাবা উনি শুনতে চাইলেন আর যথাসাধ্য সেগুলো মেটাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

—কবে, কখন শুনবেন? আমরা যা চাই সে তো আপনিই জানাতে পারতেন?

—জানিয়েছি—তবু তোমাদের মুখ থেকে উনি শুনতে চান, আর বললেন, কাজে যোগ দাও তোমরা, অনর্থক কুঁড়েমি করে সময় নষ্ট করো না।

—আপনি কি বলেন—কাজে যাবো আমরা?

ইন্দ্রজিৎ একটুক্ষণ চুপ করে রইল; ভাবতে লাগলো: অতি অল্পায়াসে সে এদের নেতা হয়ে বসেছে। এরা এখন তার হুকুমের চাকর—এরা স্নায়ু—ইন্দ্রজিত মস্তিষ্ক; কিন্তু হৃদয়? হৃদয় কোথায়? হৃদয় নাই—যেটুকু আছে; ভবিষ্যৎ পৃথিবিতে তাও থাকবে না। মানুষ যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে।—যন্ত্র চালাতে তেল লাগে, স্টিম-বিদ্যুৎ-পেট্রল লাগে। এদের চালাতেও তেমনি অন্ন-বস্ত্র আর কথা দরকার। প্রচুর কথা, বড় বড় কথা দাও—এরা বেশ থাকবে। হৃদয় বলে কোনো বস্তু পৃথিবীতে থাকবে না। গণতন্ত্র নামে যে অদ্ভুত বস্তুটির পরিকল্পনা চলেছে আজ, তাতে হৃদয়ের স্থান নাই। কারণ হৃদয় বস্তুটি একান্তই ব্যক্তিগত। ব্যক্তির সুখ দুঃখের সঙ্গেই হৃদয়ের যোগ। ব্যক্তি যখন গণতন্ত্রে পরিণত হবে তখন সে হবে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক, আইন আর শৃঙ্খলা দিয়ে গড়া নিখুঁত একটা যন্ত্র—যার ভুল হবে না—ভুল হলে কারো একার দায়িত্বের জন্য কারো হৃদয়ে ক্ষত হবে না—ভুল হলে যন্ত্রের একটা অঙ্গকেই হয়তো বাদ দিয়ে ফেলতে হবে। গণতন্ত্রের মানুষ হবে যান্ত্রিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—সে কি ভয়ঙ্কর দিনই না হবে! তবু মানুষ আজ ঐ গণযুদ্ধেই মেতে উঠেছে। দিকে দিকে কাস্তে আর হলের অভিযান—কিন্তু ওরা বোঝে না—ওদের কাস্তে আর কুড়ুল আদিম দিনের হাতিয়ার—আজকার যুগে ওগুলো বাতিল। মানুষ তার মস্তিষ্ক চালিয়ে চালিয়ে যে উন্নত সভ্যতার যন্ত্রযুগে এসে পড়েছে সেখানে গোষ্ঠি গৃহচ্যুত—ব্যক্তিই

সব। সেই ব্যক্তি দিয়ে আবার গণতন্ত্রের গোষ্টি গড়ে মানুষ কি আবার আদিম দিনের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করতে চায় ?—কিম্বা কি চায় সে ?

—আমরা কি কাজে যাব তা হলে ? মহাতপ আবার প্রশ্ন করলো।

—সে কথা তোমাদের আমি বলবো না—নিজেরা পরামর্শ করে ঠিক কর !

—সে কি ইন্দ্রজিৎ দা'—আপনি না বললে আমরা কার কাছে যাব শুধুতে ? —একজন শুধুলো,

—তোমাদের নিজেদের কাছে।—বলে ইন্দ্রজিৎ অশথ গাছটার একটা পাতা ছিঁড়ল।

—শুধুবার কি আছে ? মালিকরা যখন আমাদের দাবী মেটাতে চাইছে, তখন বসে থেকে লাভ কি—চল সব ওঠা যাক—। মহাতপ বলল,

মিনিট দুইএর মধ্যেই সব চলে গেল কারখানার দিকে। ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে দেখলো—অশথ তলাটা একদম ফাঁকা, শুধু মুঙ্গলী গাইটার গলার দড়ি ধরে মহাতপের মেয়ে মাঠের একধারে পোতা খুঁটোতে বাঁধছে।

গত পরশু রাত্রের গোয়াল ঘর আর গোরুর কথা মনে পড়ে গেল। তারসঙ্গে সেই মেয়েটিকে। কি যেন নাম, সেঁজুতি! বেশ নামটি কিন্তু! জীবনের পথে চলবার সময় ঐ রকম একটা মেয়েকে যদি সঙ্গী পাওয়া যায়! কিন্তু না—তা হবার নয়। ওরা কংগ্রেসী—ওরা ভারতের মুক্তিসাধিকা, ওরা জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেছে, কিন্তু ওদের মতে এবং পথে বিশ্বাস করে না ইন্দ্রজিৎ! দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে এই দুর্ভাগা দেশ ওদের মতে মত মিলিয়ে এল। কি পেয়েছে—কতটুকু পেয়েছে ? ক্রীপস্ প্রস্তাব, রাউণ্ড টেবিল, অতলান্ত সনদ, সব ভুয়ো—গলাবাজি! অহিংস আন্দোলন চালু রাখলে ভারতের জনগণ বেশ শান্তভাবে জেলে যায়—তাই অহিংস আন্দোলন অক্ষুণ্ন রইল। অহিংস ভারত-বাসী দলে দলে জেলে গেল। যাক—হয়তো এখনো দেশের প্রয়োজন আছে এই বিরাট দেশের বিক্ষুব্ধ জনশক্তিকে একজন আধ্যাত্মিকবাদী অতিমানবীয় শক্তির আওতায় রাখবার। তাই মহাত্মা গান্ধি আজো অবিসম্বাদী নেতা

কিন্তু ভেদ-বিভেদ, পাকিস্থান, হিন্দুস্থান, হরিজনস্থান, সংখ্যালঘুস্থান—ওসবও ঠিক আছে ; সারা ভারতের জনসংঘকে 'ভারতীয়' বলে ভাবতে কেউ শেখালো না—ভারত মাতাকে এক স্বরে মা বলে ওরা ডাকতে পারলো না। এই ওদের দেশাত্মবোধ—দেশাত্মবোধ নয়, নিজত্ববোধ। ওদের নিজের পাতে ঝোল টানতেই ওরা ব্যস্ত এবং বিপর্য্যস্ত—কাজেই ওরা আছে, ওরা থাকবে। ওদের মধ্যে যারা মস্তিষ্ক, তারা স্নায়ুদের দিয়ে কাজ করায়—যা খুসী করায়। স্নায়ু মার খায়, জেলে যায়, পঙ্গু হয়—ওদের তাতে কি ? তারপর সাম্যবাদ আর একটা বুজরুকী ! ঐ তো মজুরগুলো হৈ হৈ করে কাজে লাগলো ! সাম্যবাদ—হুঁ ! কী হবে এর জন্য পণ্ডশ্রম করে ? ইন্দ্রজিৎ ধীরে ধীরে হাঁটছে।

দূরে দেখা গেল—ট্রাম লাইনের কাছে জনতা। কি ব্যাপার ? তার কেটে দিয়েছে, পুলিশে বেটন হাতে তাড়া করেছে সবাইকে। ইন্দ্রজিতের মনে হল, আমাদের এসব ছেলেমানুষী, চ্যাঙড়ামো ! গুণ্ডামী।'

মনের আগ্নেয়গিরিটা যেন উদ্গীরণ আরম্ভ করেছে ! উঃ, পরাধীনতার কী তীব্র বেদনা—কী যন্ত্রণার জ্বালা ! লোকাধীশ আপন মনে ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল—ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত লোকাধীশ, কিন্তু এক গণ্ডুষ জলও খাবার ওর ইচ্ছে নেই। নিজের মনে ও অকস্মাৎ বলে উঠলো—"If love of country is a crime I am a criminal." ব'লে যেন মনটা নিদারুণ হাল্কা হয়ে গেল। মানুষ পাপকে ভয় করে, কিন্তু একটা জায়গায় নিজেকে পাপী মনে করে সে গৌরব অনুভব করবে। দেশকে ভালবাসা যদি পাপ হয়, তবে আমি মহাপাপী হতেও একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করবো না—এর জন্য নির্য্যাতন, কারাবরণ, নির্ব্বাসন, এমন কি মৃত্যুকে বরণও মানুষ শ্লাঘনীয় মনে করেছে যুগে যুগে। এই যে বিরাট বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—তার মূলে ঐ একই

প্রেরণা—দেশভক্তি। যিশুর দেশের যে মানুষরা গির্জ্জায় গিয়ে ক্ষমামন্ত্র পাঠ করে, "I say not unto thee, until seven times: but until seventy times seven"—সেই দেশের ক্ষমাশীল পাপভীতু মানুষরা আজ দেশপ্রেমের অগ্নি দিয়ে চূর্ণ করে দিচ্ছে বিশ্বসভ্যতা। 'সভ্যতা যাক—শান্তি নষ্ট হোক—অপরাজেয় থাকুক আমার দেশমাতা—তাহলে আবার আমার সব ফিরে আসবে।' দেশের জন্য এই যে মৃত্যুপণ, এই যে জীবনাহুতি—এ গর্ব্বের, কতখানি গর্ব্বের, তা স্বাধীন দেশমাতার সন্তানরাই মাত্র অনুভব করতে পারে। পরাধান দেশের দেশমাতা সন্তানের কাছে কতটুকুই বা শ্রদ্ধা পান! —কেমন করে পাবেন? অক্ষম অযোগ্য পুত্রদের অধিকাংশই তো বিকলাঙ্গ খঞ্জ, কুব্জ, মেরুদণ্ডহীন। দু' একটা সিংহপ্রতিম শিশু হয়তো তাঁর জন্মায়, কিন্তু সেও কম। আর যারা জন্মায়, তাদের বিকলাঙ্গ বিকৃতবুদ্ধি ভাইদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই সময় চলে যায়—ঘরের মামলা খরচেই সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যায়—দেউলে হয়ে যায়। তখন নিরাশ হয়ে সেই সিংহ শিশু আত্মবিসর্জ্জনের অভিমানে করে প্রায়শ্চিত্ত! এইতো ভারতের ইতিহাস!

মাতার বিকলাঙ্গ বিকৃতবুদ্ধি সন্তানগণ কী ভাবে অর্থার্জ্জন করতে লেগেছে—কালোবাজারের কী ভীষণ ছুরি চালাচ্ছে—কী বীভৎস ভাবেই না সাধারণের শান্ত জীবনকে মরণের মুখে ফেলে দিচ্ছে! দেশ পরাধীন, জাতি পঙ্গু—তাই দেশমাতা অশ্রুসজল চক্ষে দেখেছেন তাঁর অগণ্য সন্তানের অপমৃত্যু।

বন···অরণ্যগহন প্রকৃতি; পৃথিবীমাতার ভগ্নবিপর্য্যস্ত বিগ্রহরূপ! একটা শশক সভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল সেঁয়াকুলের ঝোপ থেকে। শেয়ালটা অনেক দূরে থেকে ফিরে ফিরে চাইছে—আর কোনো বড় জন্তু নাই! অরণ্যই নাই তা আরণ্যক জীব থাকবে কোত্থেকে! সব শেষ করেছে—শেষ করেছে মানুষ—মাতা ধরিত্রীর সর্ব্ব শেষ সন্তান—কনিষ্ঠ পুত্র, কোলের ছেলে! মা তাকে বড় যত্নে মানুষ করেছিলেন, সবার থেকে বেশি স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন—নিভৃত বক্ষের গুহামন্দিরে রেখে তাকে শীতোষ্ণ থেকে

বাঁচিয়েছিলেন—আগুনে পুড়িয়ে তার খাদ্যকে সুপাচ্য করেছিলেন—অন্তরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কঠিন শিলাখণ্ড, কঠিনতর তাম্রপিণ্ড, সুতীক্ষ্ণ লৌহশলাকা তার হাতে দিয়েছিলেন সাদরে—তাতেও দুরন্ত ছেলের আশ মেটেনি। মা তাই আপনার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে তাকে কৃষিকাজের খেলাও খেলতে দিয়েছিলেন, বাণিজ্যের বিড়ম্বনাও ভুগতে দিয়েছিলেন। আর সব ছেলে থেকে আলাদা করে তাকে সভ্যতার বিলাসের পথায়ে নামতে দিয়েছিলেন! সন্তান স্নেহাতুরা মাতার নির্বুদ্ধিতা!

অকৃতজ্ঞ মানুষ তার স্নেহময়ী জননীর আরণ্যক প্রশান্তমূর্ত্তিকে সর্ব্বাগ্রে উচ্ছেদ করলো—নগর সভ্যতার পত্তন করলো তারপর জাতিতে জাতিতে ভেদবিভেদ তুলে, সাদা-কালোর বর্ণবিদ্বেষ জাগিয়ে, সভ্যতা অসভ্যতার হাজার হাজার কৃত্রিম প্রাচীর তুলে দিল। শক্তিতে শক্তিতে চললো শক্তি পরীক্ষা—মাতা ধরিত্রী নিঃশব্দে আজও দেখছেন তাঁর কোলের ছেলের কীর্ত্তি। মা ভুল করেছিলেন তাঁর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রকে এত অধিক স্নেহ দিয়ে—এতো বেশি আদর দিয়ে। আদিম দিনের সেই আরণ্যক পুত্র আজ নাগরিক সভ্যতার নটনাথ। আত্মম্ভরিতার পথে সে আত্মঘাতী হতে চলেছে!

কিন্তু—লোকাধীশ তার চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নিল—মানুষ আজ সর্ব্বশক্তিমান। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সে তার অখণ্ড প্রতাপ বিস্তার করেছে। প্রকৃতির সর্ব্ববিধ শক্তিকে সে আয়ত্তে এনেছে—অদৃশ্য ইথারকণাও বাদ পড়েনি। এই যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সাধনায় গড়ে ওঠা মানবসভ্যতা—মাতা ধরিত্রীর কাছে কি এর কোনো মূল্য নাই? সন্তানগর্ব্বে কি মা'র অন্তর স্ফীত হয় না? গর্ব্বিত হবার কোনো কারণ নাই? মানুষ বড় হয়েছে, বিশাল রাজ্যবিস্তার করেছে—বিশ্ব জয় করেছে—প্রকৃতির প্রাণসত্বাকে জানবার সাধনায় প্রাণপণ করেছে—তবুও মানুষ অন্তরে সেই পশুত্বের উর্দ্ধে কতটুকু উঠেছে? কোথায় তার হৃদয়বৃত্তির, স্নেহ-দয়া প্রীতির প্রকাশ?—কোথায় তার ক্ষমা-শৌচ-অস্তেয়-অক্রোধ? কোথায়

তার অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরের উপর অবিচলিত বিশ্বাস? মানুষ বলে—সে সভ্য হয়েছে—আরণ্যক জীবনের ঊর্দ্ধে সে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছে, সে স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান হয়ে উঠেছে; অনন্ত শক্তিশালী ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার তার কাছে আজ অপ্রয়োজনীয়। বেশ, কিন্তু মানুষ তার নিজের স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যই যা কিছু করেছে—অরণ্যকে নগর করেছে, অসভ্যকে ক্রীতদাস করেছে, অশক্ত-দুর্ব্বলকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে, সবই শুধু নিজের সুবিধার জন্য। আবার নিজের সুবিধার জন্যই এক মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করেছে—সেই বিভেদকে অজেয় করবার জন্য একজাতি অপরজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে—এইতো সভ্যতা!

ছাপ্পান্নতালা বাড়ীর ছাদে বসে ছয় হাজার মাইল দূরের বার্ত্তা বেতারে শুনে মানুষ হয়তো ভাবে, সে সভ্য হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনোজগতের উন্নতি হয়েছে সামান্যই। আজো মানুষ তার একলা-ঘরের অন্ধকার শয্যাতলে তেমনি আরণ্যক—তার অন্তরবৃত্তি আজো হিংস্রতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারে নি—স্বার্থ ত্যাগ করতে শেখেনি, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রশান্ত আকাশে উন্নীত হয়নি! অথচ যুগে যুগে মানুষের মাঝেই এমন মানুষ জন্মেছে যার প্রশান্ত জীবনধারায় স্নান করে সাধারণ মানব-চেতনা অসাধারণ অতিমানবের পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারতো। মানুষ এত করেও ঠিক মানুষ হোল না—মাতা ধরিত্রীরই বুঝি এটা অভিশাপ—অহঙ্কারী পুত্রকে অন্তরে অন্তরে তিনি পশুই রেখে দিলেন…।

বনটা শেষ হয়ে গেল—এবার ছোট প্রান্তর, তার ওপরে নন্দীগ্রাম। শ্রীভরতের নন্দীগ্রাম নয়—বাংলার একটা অখ্যাতনামা পল্লী, রোগে জীর্ণ, মন্বন্তরে মরণোন্মুখ। কিন্তু ঐ গ্রামে একটি পরম সম্পদ আছে—ভারতের মুক্তি সাধনার একটি জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি এখনো জীবিত কিনা, তাই দেখতে যাচ্ছে লোকাধীশ। দূর থেকে গ্রাম-সীমান্তের তালীবনশ্রেণী, আম্রকুঞ্জ, অশ্বত্থ-বটের শ্যামলাভা দেখে মনে হচ্ছে, গ্রামখানি শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। ওর অঙ্গের

অধিবাসীরা আরামেই আছে। তাহলে হয়তো তিনিও ভালই থাকবেন—বেঁচেই থাকবেন। লোকাধীশের মনে একটি স্বচ্ছ প্রসন্নতা জেগে উঠছে, কিন্তু ঠিক প্রত্যুষের কুয়াশার মত—যত রোদ ওঠে ততই ফিকে হয়ে উবে যায়। লোকাধীশ যত এগুচ্ছে ততই কাণে এসে পৌছুচ্ছে কোলাহল, করুণ কণ্ঠ,—বেদনার বাষ্প এসে তার নিশ্বাসকে কষ্টকর করে তুলছে। গতিবেগ দ্রুত করলো লোকাধীশ। গ্রামের অপর প্রান্তে তার আস্তানা- একটা বৈরাগীর আখড়া। একতারা আর খঞ্জনি সম্বল করে দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি ঐখানে অপেক্ষা করছেন অনাগত দিনের প্রত্যাশায়—১৯১৪ সাল থেকে। মাঝখানে একবার বেরিয়েছিলেন কয়েকদিনের জন্য কি একটা স্বরাজ-সাধনার কাজে, তারপর সেই যে এসে ঢুকেছেন আর বেরুন নি। কিন্তু ঐ ব্যাপারেই তাঁকে দেহের দুইটি শ্রেষ্ঠ বস্তু দান করতে হয়েছে—তাঁর পা দুটি।---খঞ্জ হয়ে কিন্তু অপ্রসন্ন হননি তিনি--ভাবতেন, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে তাঁর হাতদুটি তো রেখেছেন।

লোকাধীশ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো উঠোনে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় একখানা দড়ির খাটিয়া, তাহাতে আধশোয়া হয়ে উনি একতারা বাজাচ্ছিলেন, আর গাইছিলেন,

"মৃত্যু দিয়ে গড় মা এবার অমর ছেলের অঙ্গখানি—
মরণে আ: ভয় করি না, পাই যদি তোর অমর বাণী।
জীবনের এই বন্ধ ঘরে, বেঁচেই মোরা রইনু মরে,
মরণ দিয়ে মুক্ত করো পরাধীনতার এই গ্লানি—
সেই শ্মশানে নাচবি শ্যামা আপন শিরে খড়্গ হানি!"

—জ্যেঠামশাই! লোকাধীশ সগৌরবে ডাক দিলে—এখনো উনি বেঁচে আছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষমান ভারতের ঋষি, মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা এখনো জীবিত। লোকাধীশ আস্তে গিয়ে পায়ে হাত দিল। উনি মৃদু হাস্য করে সস্নেহে বললেন,

—আয় লকু! জীবনের বন্ধন আর সইতে পারছি না, তাই মৃত্যুকে ডাকছি। তিনি আসবার আগে তুই এসেছিস—বড় ভাল করেছিস।

ওঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হয়ে গেছে। হয়তো দু' একদিন শুদ্ধু জল কিম্বা নিরম্বু উপবাস চলেছে। লোকাধীশ ভেবে দেখলো, জল দেবার লোকও কেউ নাই। তবে কি নিরম্বুই রয়েছেন! ব্যগ্র কণ্ঠে বললো,- জলটুকুও কি খান নি জ্যেঠামশাই?

—খেয়েছি, আজও সকালে রামী মা আমার ভেলিগুড় আর জল খাইয়ে গেছে! তুই বোস, সে এখুনি আবার আসবে—সময় হয়েছে তার আসবার।

—রামীমা কে জ্যেঠামশাই?

—ওঃ তুই চিনিস না তাকে? সে ঐ মধু রজকের মেয়ে—নাম রামী। আমি বলি রামী-মা! ওর চণ্ডীদাস কেউ জোটেনি কিন্তু ও সত্যি রামী—সেই চণ্ডীদাসের রামী। জানিস্—ও বলে—দ্যাশ দ্যাশ করে পরাণডা দিলে বাবা, দ্যাশের লুক তো কেউ দেখতেও আসে না তুমাকে! এই তো তুমার দ্যাশ! কার লেগে ইসব করলে?

—আপনি কি বলেন জ্যেঠামশাই?

—বলি, দেখতে আসে না আমি তাদের অক্ষম দাদা বলে। আমি তাদের জন্যে কিছুই করতে পারি নি রামীমা—দেশের লোকের দোষ নয়, দোষ আমার। তারা যে আমার ভাই, সেই কথাটাও তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারি নি আমি।

লোকাধীশ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, উনি একতারাটায় টুং টাং করছেন। লকু বলল,—জল আছে ভেতরে? এক গ্লাস খেতাম।

—আমার হাতে খাবে তো তুমি বাবু?—বললো পিছন থেকে রামী—ধোপার মেয়ে কিন্তুক আমি।

—ওঃ, তুমি ধোপার মেয়ে? না—তুমি দেশের মেয়ে বোনটি, দেশমাতার মেয়ে, আমার সহোদরা; দাও, জল দাও তো এক গ্লাস—বলে লোকাধীশ চেয়ে দেখলো ওর পানে। স্বাস্থ্যবতী সবলা তরুণী। বাইশ-তেইশ বছর হবে বয়স।

রং উজ্জল শ্যাম, চোখে মুখে একটি কমনীয় মাধুর্য্য—বাঙলার স্নেহ-দুলালীর মুর্ত্তিমতী প্রকাশ যেন ও! চণ্ডীদাসের রামী যদি এমনি ছিলেন তো খুবই ভাল ছিলেন বলতে হবে।

রাণী জল আর প্যাটালী নিয়ে এল। লকু হেসে শুধুলো,

—এই আকালের বাজারে প্যাটালী পেলে কোথায়?

—সি-সব কথায় কাজ কি দাদাবাবু খাও। বলে রাণী হাসলো। তারপর আবার বলল—তুমরা এসে খেতে চাইলে তো আমাদিকে কিছু দিতেই হয়—তাই যুগাড় রাখতে হয়।

—হাঁ, বোনটি, তোমরা আছ বলেই তো আমরা আজো ঘরে এসে একটু জুড়ুতে পাই! কিন্তু বাংলার শান্ত গৃহজীবন চুর্ণ হয়ে গেল—কি হবে জ্যেঠামশাই?

—কোনো আশাই দেখছি নে লকু। এ মম্বন্তর ঘটবেই। ঘটবে বললে ভুল বলা হবে—এটাকে ঘটানো হবে। সময় থাকতে সাবধান হলে এই মহামারী ঘটতো না, কিন্তু সাবধান যাদের হওয়া দরকার তাঁরা যুদ্ধ সামলাবার অজুহাতে সব সরাচ্ছেন—নৌকা ইত্যাদি যান বাহন নিয়ন্ত্রণ করছেন—সাম্প্রদায়িক হারাহারিতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করবার ফিকির দেখছেন, আর ধনিক সম্প্রদায় বসে বসে মজা দেখছেন।

—বাংলার সমস্ত জনশক্তি পঙ্গু হয়ে যাবে জ্যেঠামশাই।

—না—যারা বাংলায় থেকে বাঙালীকে শুষতে চায়, তারা মরবে কেন? ধনী একজনও মরবে না, সরকারের যাদিকে দরকার তারা কেউ মরবে না—শ্বেতাঙ্গ বা ফিরিঙ্গীরা মরবে না, আর বাঙলার বুকে বসে যারা নবাবী করছে সেই অবাঙালীরাও কেও মরবে না—কারণ কি জানিস? কারণ এদের আত্মা বাঙালীর আত্মা নয়।—বাঙালীর আত্মা মরে যাবে।

—মরে যাবে?

—শোন্—বাঙলার ঐতিহ্য, বাঙ্গলার যুগার্জ্জিত কৃষ্টিধারা, জলন্ত দেশপ্রেমের

ইতিহাস, বাঙ্গালীর মৃত দেহকেও সবল রেখেছে আজও—বাঙ্গালীর আত্মা এখনো বাঙ্গালীকে ভারতের মুক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠতম হোতা করে রেখেছে—সেই বাঙলার আত্মার অপমৃত্যু হচ্ছে—অপমৃত্যু ঘটাবার জন্যই এই সব ব্যবস্থা—যাতে বাঙলা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে!

—তাহলে কি উপায় জ্যাঠামশাই?

—উপায় ঈশ্বর! বাঙালাকে তিনিই চিরদিন রক্ষা করেছেন। বাঙলার এই মন্বন্তর সারা ভারতের খাদ্য দিয়ে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়—এখনো যায়, কিন্তু সে কাজ যখন আরম্ভ হবে তার পূর্ব্বেই বাঙলার চাষী মরে যাবে, বাঙলার শ্রমিক বিদেশী কলে যন্ত্র হয়ে যাবে, বাঙলার সতী নারী অসতীত্বের শেষ ধাপে নেমে যাবে! বাঙলার সতী বেহুলা ক্ষুধিত স্বামীর জীবিত আত্মা নিয়ে এখনো ফিরছে ভিক্ষাপাত্র হাতে, কিন্তু সে আর বেশী দিন নয়।

লোকাধীশ চুপ করে আছে—দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই বৃদ্ধের বাণী ওর মনকে যেন অসাড় করে দিচ্ছে। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বললেন,

—যা হবার হবে লকু—তথাপি ভয় নাই। বাঙলার ঈশ্বরী মাতা শ্মশানকালী! ধ্বংসের মধ্যেই তিনি নবজন্ম দান করেন। যে আত্মার অগ্নিকে আমরা আহিতাগ্নি করে তোদের মধ্যে জ্বালিয়ে রেখে যাচ্ছি তা নিবতে দিস নে। তোরা কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ যদি জ্বলে থাকতে পারিস, তাহলে আবার সেই আগুনে বাড়বানল জ্বলে উঠবে—ভয় নাই—বাঙলার আত্মা অমর—

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে করি ঘর
বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরই মাথায় নাচি—"

বাঙালী মরবে না।

—কে বাঙালীকে বাঁচাবে জ্যাঠামশাই—কে? কার সে শক্তি?

—আছে—আছে সে শক্তিমান বাঙলায়! সে শক্তি বাঙলার সাহিত্য। বাঙলার জনগণমনের জাগ্রত দেবতা বাঙালীর অগ্নিস্রাবী সাহিত্য। রঙ্গলাল

থেকে ঋষি বঙ্কিমের "বন্দেমাতরমে" যে সাহিত্য অগ্নিমন্ত্রে উদ্গীত হয়েছে, যে সাহিত্যের জয়ধ্বজা দেব-মানব রবীন্দ্রের রশ্মিধারায় সারা পৃথিবীর চোখে বিস্ময়ের চমক লাগিয়ে দিয়েছে, বাঙালীর আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখবে সেই সাহিত্য—বাঙালার সেই অমৃতমন্ত্র, অভীঃমন্ত্র—কিন্তু······

বৃদ্ধ থামলেন। লোকাধীশ বললো—বলুন জ্যেঠামশাই, কি যেন বলতে চান্।

—ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের জন্য কিছু উপাদান রেখে যেতে চাই—তোর কাছে যদি গচ্ছিত রাখি—সাবধানে কি রাখতে পারবি লোকাধীশ সেই অমূল্য সম্পদ—? সে সম্পদ বাংলার সেই অগ্নিযুগ থেকে আজকার এই মৃত্যুযুগের পর্য্যন্ত ইতিহাস।

—কিন্তু আমার বাড়ীতে তো যে কোনো দিন যাকিছু হতে পারে?

—হ্যা—কিন্তু ওরই জন্য মরতে পারছি না। কোথায় তবে রাখবো সেই বস্তুটি?

—আমাগে দাও কেনে বাবা! আমার ঘরে দে'লের মাঝে গত্ত করে রেখে দিব—বলে রাণী এগিয়ে এলো।

—কিন্তু তুই ওটাকে যে ব্যবহার করতে পারবি না রাণী-মা।

—তা হোক কেনে! আমি আথুনো অনেক দিন বাঁচবো—যে লুক ঠিক ঠিক তুমাদের মতন হবে, তাকে দিয়ে তবে মরবো আমি।

—বেশ মা, তাই হবে—তুই বাংলা-মা'র প্রতীক হয়ে আমার সেই সম্পদ রক্ষা কর।

—উ'সব কথা কেনে বলছো বাবা? আমি তোমার জিনিষটি ঠিকঠাক রেখে দিব। কিন্তক সি জিনিষ আবার দিব কাকে? সেই হোল আমার ভাবনা।

—সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না—যোগ্য যে সে নিজেই এসে নিয়ে যাবে যথাকালে।

—বেশ, দাও তাহলে। আজকেই দাও। তা-বই একটুন্ আরাম করে ঘুমও দেখি তুমি। বাবারে বাবা—ঐটির লেগে বাবা আজ দু' মাস ঘুমুয় নাই, বুঝলে দাদাবাবু?

—কি এমন সে ইতিহাস জ্যেঠামশাই! চুরি হয়ে যেতে পারে নাকি?

—পারে বইকি লকু! আমি তাতে আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্যকে রূপ দিয়েছি—আমার বিশ্বাস, সন্ত্রাসবাদ এদেশের জন্য নয়। অন্য যে কোনো দেশে নিহিলিষ্ট বা এনার্কিষ্ট বা অন্য যে কোনো রকম সন্ত্রাসবাদ চলতে পারে, এদেশে চলবে না। কারণ, এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে বীরত্বের উপাসনা করে এসেছে চিরদিন। সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যে বীভৎস বর্ব্বরতা আর গোপনতা, ভারতের পবিত্র বীরধর্ম্ম কোনদিন সেটাকে সমর্থন করবে না। ও বস্তু ভারতের প্রাণধর্ম্মের বিরোধী, ভারতের আত্মার অবমাননাকর—তাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

—তা হ'লে তো কংগ্রেস সে পাণ্ডুলিপি না-মঞ্জুর করবেন না। এত গোপনতার আশ্রয় কেন নিচ্ছেন তাহলে জ্যেঠামশাই?

—নিচ্ছি, কারণ, আমাদের সাধনার বহু গুপ্ত কথা ওতে আছে, আর আছে, কেন আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম; তা ছাড়া বৃদ্ধ থামলেন, এদিক ওদিক দেখে বললেন, আমার সারাজীবনের নিষ্ঠায় ভারতের মুক্তি সাধনার যে পথ আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি—আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তাই লিখে রেখেছি। অনাগত যুগের মুক্তিসাধক যেন সেই পথ ধরে অগ্রসর হয়।

—আপনার সে পথ তো সান্ত্রাসবাদ নয়—তবে কেন এত ভাবছেন?

—শাসন যাঁরা করতে চান, শাসিতকে তাঁরা কোনো পথেই যেতে দিতে চান না। তাই সান্ত্রাসবাদীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, অসহযোগীকেও আদর করা হয়নি। যে কোনো পথেই আসছে বাধা, আসবেও, কিন্তু তাই বলে নিশ্চেষ্ট থাকলে তো চলবে না। ভারতের কোটি কোটি জনগণের অন্তরের আগুন

যেন নিবে না যায়—আমার ইতিহাস সে-আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারবে; কিন্তু সে-আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে জনগণের অন্তরে।

—কে সে যজ্ঞের হোতা হো'তে পারবে জ্যেঠামশাই?

—প্রতিভাবান সাহিত্যিক—যার জন্য আমি আমার উপাদান রেখে যাচ্ছি। যে-সাহিত্যিক তার অন্তরের অগ্নিগর্ভ থেকে আহরণ করবে ভাষার স্ফুলিঙ্গ, ভাবের মন্ত্র আর আবেগের মূর্চ্ছনা—আর সেই সাহিত্য থেকে জন্মাবে কর্ম্মী, যার কর্ম্মযজ্ঞে পরাধীন ভারতভূমি আবার স্বাধীন যজ্ঞভূমিতে পরিণত হবে।

—সেদিন কি আর আসবে জ্যেঠামশাই!—লোকাধীশের কণ্ঠে নিরাশার নিবিড় বেদনা।

—আসবে। ভারত আবার সত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হবে। সত্যহীন হয়ে ভারত ধর্ম্মহীন হয়েছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব ধর্ম্মকে পতিত করেছে। তাই "সত্য" আজ পরিত্যাগ করেছে ভারতকে। গুণকর্ম্ম বিভাগের যে ধর্ম্ম ক্ষাত্রশক্তিকে উজ্জীবিত রেখেছিল, বৈশ্যশক্তিকে সবল রেখেছিল, শূদ্রশক্তিকে সক্রিয় রেখেছিল, সেই ধর্ম্ম আজ বিদেশীয়, বিজাতীয় পরীক্ষামূলক আদর্শের ভুল পথে বিড়ম্বিত। গণশক্তির একত্বের ফাঁকা বুলি আউড়ে গণশক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে সেই আদর্শ,—আজকার ভারত সেই মিথ্যা আদর্শকে বরণ করে পতিত হয়েছে—কিন্তু এ দেশ, এই জাতি, এই দেশের ধর্ম্ম সনাতন—তাই শাশ্বত এবং সত্য। পরাধীন জাতিকে শাসকের নির্দ্দিষ্ট আদর্শই বরণ করতে বাধ্য হতে হয় অনেক সময়—তাই অন্তরের সমস্ত ব্যথাকে চেপেও ভারত সেই আদর্শকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে—আজ কিন্তু সেই ব্যথাটা সয়ে গেছে, আর ভারত মনে করছে, এইটাই তার আদর্শ—সারা পৃথিবী এই আদর্শে মুক্তি পাবে। কিন্তু না—সেটা সত্য নয়—কারণ ভারত চিরদিন স্বয়ং আদর্শ সৃষ্টি এবং প্রচার করে এসেছে। ভারতের সত্য ধর্ম্ম এবং সত্য আদর্শ পৃথিবীবাসীই গ্রহণ করবে।

—কিন্তু আজকার ভারত একথা স্বীকার করবে না।

—না—কারণ আজকার ভারত ভুলে গেছে, তার সত্য ধর্ম্ম আর সত্য আদর্শ কি। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা তাকে পরানুকরণস্পৃহার চাকচিক্যে মুগ্ধ করেছে—তাই সে এই তুচ্ছ প্রসাধন-সামগ্রীকেই অঙ্গ-লাবণ্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মনে করে। ভারত ইংরাজ রাজত্বে পরাধীন হয়নি—ভারত পরাধীন হয়েছে তার সত্য সনাতন ধর্ম্মকে ত্যাগ করে—যে ধর্ম্ম ত্যাগে, তপস্যায়, বীর্য্যে, ক্ষমায়, আসক্তিহীন ভোগের আদর্শে এই লোভ-কামাতুর পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করেছিল! কিন্তু সেই আদর্শ আবার জাগ্রত হবে।

—কে জাগ্রত করবে জ্যেঠামশাই? কে সেই অগ্নিহোত্রী?

—সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বাকৃরূপা ব্রহ্মবাদিনী বাণীর উপাসক ঋষি—যার দীক্ষায় ভারত আবার সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হবে। আগে সেই দীক্ষা লাভ হোক, তারপর সাধনা। দীক্ষার পূর্ব্বে সাধনায় সিদ্ধি কদাচিৎ লাভ হয়।

—কিন্তু ততদিনে ভারত শ্মশান হয়ে যাবে।

—না! শ্মশান হতে দেবে না তারা যাদের স্বার্থ এই জাতির জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কারখানা চালাতে হলে শ্রমিক চাই—বিলাসিতার জন্য দাস দাসী চাই—তারা জীবন্মৃত হলেও বেঁচে না থাকলে চালকের চলে না। তাই শ্মশান হবে না, তবে জীবন্মৃত হবে—কারণ এই জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও শেষ হয় নাই। বহু যুগার্জ্জিত এ পাপ—এত সহজে ক্ষালন হওয়া সম্ভব নয়।

—এত সহজে হোল! আরো কী প্রায়শ্চিত্ত করবে এই জাতি?

—অনেক—অনেক বাকি এখনো! এখনো এই জাতির মধ্যে স্বার্থান্ধ বণিক, বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী আর ঘাতক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ বিস্তর জন্মাচ্ছে। এরা নিঃশেষে লুপ্ত হোক—এদের বুদ্ধির আর ধনের অহঙ্কার চূর্ণ হোক—তার পর।

—সে কতদিন পরে ?

—তা জানি না—তবে যথাকালে হবে—আর তখনি এরা সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হবে। হাজার বছরের পরাধীনতা ঘুচবে সেদিন। জাতীয় স্বাধীনতার কথাই আমি বলছি কিন্তু সে স্বাধীনতা হবে মানবাত্মার স্বাধীনতা—মানুষের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি ঝেড়ে দু'পয়সা রোজগারের জন্য তারা মুখে টিনের চোঙ লাগিয়ে রাস্তায় মিছিল করে জনযুদ্ধ করবে না, তারা সত্যিকার গণতান্ত্রিক হ'বে—যে গণমনে সত্যই হবে দেবতা, সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই কর্ম্ম।

বৃদ্ধের মুখখানি উত্তেজনায় জ্বলছিল যেন। লোকাধীশ অন্য কিছু না বলে চুপ করে রহল। রামী বসেছিল তখনো বৃদ্ধের পা'তলে—বললো,

—কৈ বাবা কুথা আছে তুমার সেই দামী মাণিকটি ?

মাথার বালিশটা রাণীর হাতে তুলে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন,

—এর মধ্যে। তাল পাতায় হাতে লেখা একখানি পুঁথি—বুঝলি মা, সে পুঁথি সত্যি মাণিক। তাতে ভারতের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের আগুন আছে—তুই হুঁশিয়ার হয়ে রক্ষে করিস—যা, বাড়ী যা এবার।

রাণী বালিশটা নিয়ে চলে গেল তার বাড়ীর দিকে। বৃদ্ধ বললেন,

—এই মন্বন্তরের ইতিহাসটা তুই লিখে রাখিস লকু—আমার বোধ হয় আর দেরী নাই—দু'চার দিনের মধ্যেই মরতে হবে।

—সে কি জ্যাঠামশাই !

—হ্যাঁ—রামার ঘাড়ে আর কতদিন খাব ! ও-ও আর পারছে না। আচ্ছা, এবার যা তুই—বাড়ী যা।

মোহিত বাবুর মেয়ে কুমারী কাবেরী দেবী—বয়স বিংশতি ; অনবদ্যাঙ্গী, মাথার চুলগুলি একটু খাটো—বেণীটা তাই লম্বা হয়ে পিঠে দোলে না। বাবা

মিলওয়ালা, ব্যাঙ্কার, তার উপর উচ্চশিক্ষিত বিলাত ফেরৎ অভিজাত। কাবেরীর আভিজাত্য তাই আরো কয়েক ডিগ্রী চড়ে গেছে। ওর পাণি-লাভার্থে কয়েকটি যুবক সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করে—কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ, কাবেরীর মা পছন্দ করেছেন ইন্দ্রজিতকে—যাকে কাবেরী এবং তার বাবা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। মা'র পছন্দের মূলে একটু ইতিহাস আছে! বছর পাঁচেক আগে মা'র সঙ্গে কাবেরী একদিন থিয়েটার দেখে ফিরছিল তাদের বাড়ীর মোটরে—রাত প্রায় দুটো, হঠাৎ ড্রাইভারটা মোটরখানা গলির মধ্য দিযে চালাতে আরম্ভ করলো—তারপর একটা অচেনা গলি-রাস্তায় পড়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে আরম্ভ করলো। কাবেরী আর তার মা ভয় পেয়ে চীৎকার করতে যাবে,—মোটরের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা লোক ছোরা দেখিযে বললো—

—খবরদার!

এই রকম যখন অবস্থা, ঠিক সেই সময় ইন্দ্রজিৎ আর তার দলের কয়েকজন আসছিল মিটিং শেষ করে। মোটরের পিছনে ছোরা হাতে লোকটাকে তারা দেখতে পায়। ছোরা লুকিয়ে ফেললেও ইন্দ্রজিতের সন্দেহ হয়—মোটর-খানা তারা আটককরে ফেলে। ড্রাইভার এবং পিছনের লোকটা পুনর্ব্বার ছোরা নিয়ে হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিতদের হাতে ছিল রিভলভার।

সেই রাত্রে ইন্দ্রজিতৎ নিজে গাড়ীখানা চালিয়ে কাবেরীদের বাড়ী পৌছে দিয়ে যায়। কাবেরীর মা পরদিন তাকে বাড়ীতে খেতে নিমন্ত্রণ করেন। সেই থেকে আলপ। পরে, ওদের মিলে ইন্দ্রজিতের চাকরী লাভ! বীরত্বের ভেতর দিয়ে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যে-কোনো মেয়ের তাকে ভালোই লাগা উচিত—এবং ইন্দ্রজিৎ দেখতে মোটেই খারাপ নয়—বরং যথেষ্ট সুন্দর। কিন্তু বড্ড বেশি অনভিজাত। প্রথম দিনই কাবেরী দেখেছিল, ইন্দ্রজিতের সঙ্গীরা সবাই শ্রমিক এবং অশিক্ষিত। তারপর এই পাঁচ বছর ধরে দেখছে, ইন্দ্রজিৎ সেই অসভ্যদের সঙ্গেই মেলামেশা করে সব সময়। কাবেরীর

বাবাও এটা লক্ষ্য করেছেন—তাই স্ত্রীর ইচ্ছাকে আমোলই দেন না। তবুও কাবেরীর মা ইন্দ্রজিতকে পছন্দ করেন এবং মনে করেন, ঐ ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হো'লে মেয়ে তাঁর সুখী হবে। তাঁর সেই গোপন ইচ্ছা আর গোপনে নাই—বাইরে জানাজানি হয়ে গেছে।

বাড়ী ফিরে মোহিতবাবু দেখলেন—মেয়ে শোফায় শুয়ে একখানা অতি আধুনিক নভেল্ পড়ছে—ইংরাজির বাংলা অনুবাদ। মূল ইংরাজিটাই পড়া আছে মোহিতবাবুর, বললেন, ইংরাজিটাই পড়লি না কেন রে?

—ঠিকঠিক বুঝতে পারি না বাবা—মেয়ে হাসলো।

—কেন? বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন—এরকম কথা তোর মুখে মানায় না মা।

—না বাবা, মানায় না সত্যি। বি, এ, পাশ করলাম। কিন্তু বাবা, সত্যি বলছি, তোমাকেই বলছি, ঠিকমত বুঝতে পারি না—আবার হাসলো।

—খানকতক পড়, তাহলেই বুঝতে পারবি—তোর মা কোথায়?

—মা? কি জানি, রান্নাঘরে থাকবে হয়তো। ডাকতে পাঠাব?

—না, থাক। রান্নাঘরকে 'কিচেন' বলতে হয়।

—জানি বাবা—বলিও। কিন্তু মা'র সম্বন্ধে কথা উঠলে তাকে রান্নাঘর বলাই উচিৎ। জান বাবা, আজও মা আদি-গঙ্গায় নেয়ে এল!

—ওকে এবার থেকে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে, দেখছি।

—হিঃ হিঃ হিঃ······মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়লো শোফার উপর, বললো, —মাকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও বাবা, পূজো-আচ্চা করে বেশ থাকবে।

—দেশে! ওরে বাপ! দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, দেখছিস না। খাবে কি সেখানে?

—ও হ্যাঁ! আচ্ছা বাবা, আমাদের এখানেও দুর্ভিক্ষ লাগবে না তো?

—তোর তাতে কি! আমার ব্যাঙ্কে দেড় লক্ষ মন চাল মজুত রেখেছি;

তা'ছাড়া ফাক্টরাতে লাখ খানেক মন আছে, আটা, ডাল, গম, বিস্তর ষ্টক করা হয়েছে। এখন ভাল রকম ভাবে ফেমিনটা হলে দুপয়সা ঘরে আসে।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঐ সব খুব চড়া দামে বুঝি বিক্রী হবে বাবা? তখন কি খাবো?

—বিক্রী কোথায় রে! চাল ডাল যেমন গুদামে আছে, থাকবে, শুধু কাগজ পত্রে বিক্রী। যেমন ধর, তুই কিনলি ন' টাকা মন দরে একলাখ মন, চেকে টাকা দিলি, তারপর তোর বর কিনলো পনর টাকা দরে—দিল টাকা, পরে তোর বরের বন্ধু কিনলো সাড়ে বাইশ টাকায়, চেকেই টাকা দিল—তারপর কোন মাড়য়ারী মহাজন দিল ছত্রিশ টাকা দর···দর বেড়েই যাচ্ছে দিনে দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, কারণ চালের মতন সোনা আর নাই, বুঝলি?

—কিন্তু সেই সোনার চাল গুলো···?

—সে যেমন গুদামে আছে—থাকবে। বেড়ে চলবে দর আর টাকা।

—বাঃ, বেশ মজা তো বাবা! চালগুলো কি কেউ নিয়ে যাবে না?

—যতক্ষণ দর চড়ছে ততক্ষণ তো নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না; তারপর যার কপালে দর নামলো, সেই হতভাগাই ডুববে। তখন আবার দর কম দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকেই সেই চাল কেনা হতে পারে।

—কি মুস্কিল! এযে দেখছি নভেলের চেয়েও রোমাঞ্চকর গল্প বাবা!

—নিশ্চয়ই। ব্যবসার মত রোমাঞ্চকর কিছু নাই, আর, জানিস মা খুকু, কোথায় লাগে তোর সারলক হোমস্‌, দীনেন রায়, রবার্ট ব্লেক। ব্যাঙ্ক আর ব্যবসার রহস্য তোদের যে-কোনো নভেলের থেকে বেশি ইনটারেশটিং, আর আমার মনে হয় কি জানিস?—মোহিতবাবু একটু থামলেন, চুরুট ধরালেন, বললেন,—সাধারণে মনে করে, যারা ভাল নভেল লিখতে পারে, তারাই নাকি প্রতিভা—মিছে কথা, নভেলে থাকে কি? কতকগুলো মনগড়া কথার ফুলঝুরি! —অলিক কল্পনা বিলাস! আমার মতে, যারা ভাল ব্যবসায় গড়ে তুলতে পারে, তারাই সত্যিকারের প্রতিভা! দেশকে, জাতিকে রক্ষা করতে দরকার টাকা,

আর সেই টাকা আন্‌তে হয় ব্যবসার জাল ফেলে।' কাজেই যে যত বড় ব্যবসায়ী, সে তত বড় প্রতিভা।

কাবেরী বুঝলো,—তার বাবা নিজকে খাঁটি একটি প্রতিভা বলে প্রচার করতে চায়—কথাটা সে নিজেও অবিশ্বাস করে না—কিন্তু তর্ক করবার জন্যই বলল,—

—কিন্তু জাতির আত্মাকে ওরা বাঁচিয়ে রাখে বাবা—ঐ সাহিত্যিকরা।

—ফুৎ! দেহ বাঁচলে তবে তো আত্মা বাঁচবে রে খুকু! আগে দেহ তবে আত্মা! আর ওরা আত্মাকে কি দিয়ে বাঁচাচ্ছে? কতকগুলো মেকী বানানো কথায় মানুষ বাঁচে না। কথার জাল বুনে আসর সরগরম করা যায়,—কাস্তে হাতুড়ী মার্কা লাল-ঝাণ্ডা তুলে রাস্তায় মাতামাতি করা যায় কিন্তু পেটের খিদে ওতে মেটে না। আমরা ব্যবসা করি—টাকা দিয়ে তৈরী করি বিরাট বিরাট কর্ম্মশালা, তাই দেশের লোক খেতে পায়—কাজ করে, নইলে ঐ কথার ফুলঝুরি বিনিমূল্যেও বিকোতো না।

—তা ঠিক বাবা, যুদ্ধের বাজারে, বাঙলাদেশে বইএর দাম বেড়ে গেছে কিন্তু খদ্দের বেড়েছে তিনগুণ—টাকা রোজগার হচ্ছে বলেই বিক্রী হচ্ছে বই! টাকা না.হলে সত্যি কিছু চলে না বাবা!

—চলে। টাকা না থাকলেও চলে মানুষের।—বলে এসে উপস্থিত হোল ইন্দ্রজিৎ, বললো—স্বর্ণমান যেদিন ছিল না, সেদিনও মানুষ ছিল, তার পূর্ব্বেও ছিল মানুষ ঠিক মানুষের মতই বেঁচে—মানুষের জন্য টাকা এসেছে, কিন্তু আজ টাকার জন্য মানুষ তৈরী হচ্ছে—তৈরী হচ্ছে কলকারখানায়!

—হচ্ছে, হবে—আরো হবে তৈরী। এই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ আর ইন্‌ফ্লেশন তোমাদের সব চক্রান্ত চুরমার করে কারখানার জন্য মানুষ তৈরী করে দেবে—জানো ইন্দ্রজিৎ! তোমাদের নাটুকেপনার দিন ফুরিয়ে এল!

বেশ বোঝা যায়—পিতাপুত্রী কেউই ইন্দ্রজিতের নাটকীয় উপস্থিতি পছন্দ করে নি। বাবার কথার ধূয়া ধরে শ্রীমতী কাবেরী বললো,

—মানুষ সেই অসভ্য বর্ব্বর যুগ ছাড়িয়ে এসেছে বহুদিন—স্বর্ণমান সৃষ্টি করে মানুষ তার সভ্যতাকে শ্রেণীগত করেছে, বিশেষ শ্রেণীতে উন্নীত করেছে, আজ এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে সেদিনের নজির দেখানো নির্ব্বুদ্ধিতা!

উষ্মা প্রকাশ পাচ্ছে কথায় দুজনারই। ইন্দ্রজিৎ জানে, এরা তাকে পছন্দ করে না, তবুও গিন্নার খাতিরে তাকে কারখানার বড় চাকরী দিয়ে রেখেছে। কিন্তু এদের পছন্দ অপছন্দে তার কিছু যায় আসে না। বললো—মাতালের কাছে মদের থেকে ভালো বস্তু আর নাই, তেমনি ধনীর কাছে টাকাই স্বর্গ—কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, বলে নিই।

—বলো! মিঃ চাটার্জির কণ্ঠে বিরক্তির স্বর এবং আদেশের গাম্ভীর্য্য।

—শ্রমিকরা সকলেই কাজে যোগ দিয়েছে, আমি ছাড়া—আমি আর যোগ দিতে পারলাম না।

—কেন? তুমি নিজকে শ্রমিকের থেকে উন্নত মনে কর নিশ্চয়ই! মোহিতবাবুর কণ্ঠে বিদ্রূপ;

—না—শান্ত স্বরেই বললো ইন্দ্রজিৎ—উন্নত মনে করি না, তাই জবাব দিচ্ছি চাকরীতে। শ্রমিক থেকে উন্নত মনে করতে পারলে তো আপনাদের সমান পদমর্য্যাদা পেতাম।

—তাহলে জবাব দিচ্ছ কেন—বুঝলাম না।

কারণ, আমি অর্থের ক্রীতদাস নই! আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। আর যে উদ্দেশ্যে আমি এই কাজে যোগ দিয়েছিলাম, সেটা সফল হোল না।

—উদ্দেশ্যটা কি. জানতে পারি কি?

—না—আমার উদ্দেশ্য জানবার যোগ্যতা নেই আপনাদের—ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে এবার যেন বিদ্রূপের ঝংকার বাজলো, বললো—টাকায় সে উদ্দেশ্য কেনা যায় না।

—যায়! জগতের যে কোনো জিনিষ টাকায় কেনা যায়। আচ্ছা, যেদিন

এ সত্য বুঝবে, সেদিন আবার এসো। আমার স্ত্রী, কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি—টাকার দরকার হ'লে নিঃসঙ্কোচে চেও আমার কাছে... !

বিদ্রূপটা ঠিকই ফিরিয়ে দিলেন মোহিতবাবু কিন্তু ইন্দ্রজিৎ গ্রাহ্য না করে বললো—টাকায় কিনতে পারেন নি, এমন কোনো বস্তুর যদি অভাব হয় আপনার তাহলে আমায় সেদিন ডাকবেন—দান করে যাব—যেমন একদিন আপনার স্ত্রী-কন্যাকে নিরাপদে পৌছে দিয়েছিলাম—আচ্ছা, নমস্কার—নমস্কার কাবেরী দেবী—ইন্দ্রজিৎ, অপসৃত হোল।

পিতা-পুত্রী উভয়েই নীরব। পিতা ভাবছে—লোকটা অদ্ভুত রকমের নির্ব্বোধ। ওকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দিতে চেয়েছেন, না নেওয়ায় কারখানার সম্মান জনক কাজে নিযুক্ত করেছেন। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ওকে মোটা বেতন দিতে চাইছেন—তবু লোকটা চলে গেল! খেয়ালী যুবক—হতভাগ্য! ওর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কত যে ছিল—সব নষ্ট করলো। কাবেরীকে যে ঐ রকম নির্ব্বোধের হাতে তিনি দান করেন নি—এর জন্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন; তাঁর প্রতিভাই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছে—তাঁর বিষয়ী, ব্যবসায়ী প্রতিভা। কিন্তু কাবেরী আবার ওর জন্য ক্ষুণ্ণ হবে না তো? না—কাবেরী ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না—ভাবলেও কিন্তু তিনি চাইলেন কন্যার পানে।

কাবেরী বইটা খুলে পড়ছে—কিম্বা পড়বার ভান করছে। বললেন,

—আহাম্মক আর কাকে বলে! সুখে খেতে ভূতে কিলোয়!

কাবেরী বই পড়তে লাগলো। মিঃ চাটার্জ্জি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, কন্যা তাঁর ক্ষুণ্ণ হোল নাকি! ঐ বর্ব্বরটাকে সে আবার ভালো বেসে ফেলেনি তো!

—ঐ শয়তান আজ কুলি মজুরগুলোকে নিয়ে ধর্ম্মঘট বাধিয়ে ছিল, জানিস মা কাবেরী?

—কে বাবা! ঐ ইন্দ্রজিৎ বাবু! জেলে দিলে না কেন তুমি ওকে?

—দিলাম না সেই আগের কথাটা মনে করে—কিন্তু দেওয়াই উচিৎ ছিল, কি বলিস?

—ও একটা গুণ্ডা বাবা! প্রথম দিনই আমি চিনেছিলাম। মা যে ওকে কি চোখে দেখেছে, কে জানে? চলে গেল, বাঁচা গেল!

কাবেরী আবার বইএর মধ্যে চোখ দিল। মিঃ চাটার্জি আশ্বস্ত হয়ে উপরে উঠলেন। নাঃ, মেয়ে তাঁর ঐরকম একটা গুণ্ডাকে কখখনো ভালোবাসবে না। তাহলে যে তাঁর রক্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে! তা কি হয়?

বাবা উঠে যাওয়ার পরেই কাবেরী বইখানা শোফায় উবুড় করে রেখে নীরবে কয়েক মিনিট ভাবলো, আপনমনে বললো—হে মুক্তিসাধক! লিভ্ ডেন্‌জারাস্‌লি! মৃত্যু পরাহত হোক! তারপর উঠে গেল সটান রান্নাঘরে। মা কয়েকটা ডিম ভেঙে কি একটা তৈরী করবার ব্যাপার বোঝাচ্ছিলেন ঠাকুরকে। কাবেরী গিয়ে বললো—জানো মা, তোমার সেই ইন্দ্রজিৎ চলে গেল কাজে ইস্তফা দিয়ে।

—ওমা! কেন? কোথায় চলে গেল?—পরে মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, ফাজ্‌লেমি করছিস নাকি? ইন্দ্রজিৎ তো আমার পেটের ছেলে নয়, গেল তো কি বয়ে গেলো? যাক্ গে—শুনছো ঠাকুর, ছ'টা ডিমই ভাঙো আর পেঁয়াজ দু'টো…

—তুমি বিশ্বাস করলে না মা? সত্যি বলছি চলে গেল। বাঁচা গেল—বাব্বা! ঐ গুণ্ডাটাকে কেন যে তুমি অত ভালবাসতে মা! বাবার মুখের উপর কথা কয়—আস্পর্দ্ধা ওর!

মা বুঝলেন, একটা কিছু ঘটেছে। প্রথম অবশ্য তিনি ভেবেছিলেন যে ইন্দ্রজিতকে তিনি একটু স্নেহ করেন বলে মেয়ে তাঁকে ধোকা দিতে এসেছে, কিন্তু এবার বুঝতে পারলেন—ইন্দ্রজিতকে নিয়ে কোনোরকম গোলমাল বেধেছে; হয় তো তাকে অপমান করা হয়েছে, না হয়, সেই করেছে কিছু একটা।

সবিশেষ জানবার আগ্রহ তাঁর খুবই হচ্ছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে বললেন, —আচ্ছা, যা এখন, জ্বালাতন করিস না—শোন ঠাকুর···

—ও চলে গেল মা—তোমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করে গেল না। লোকটা এত অভদ্র! ওকে না তুমি হপ্তায় তিন দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে? আজকার ঐ ডিমের শ্রাদ্ধ কি ওর জন্যেই হচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ, হচ্ছে!—মা রাগের সুরেই বললেন—অভদ্র সে নয়, তুমি। তুমি না হয় তোমার বাবা তাকে অপমান করেছে। মনে পড়ে না সেদিনের কথা? সেই রাত্রিতে যখন ছোরাখানা ঝিক্‌মিক করে উঠেছিল? লজ্জা করে না মেয়ের?

—আমি তোমাকে দিব্যি করে বলতে পারি মা, সেই ছোরাওয়ালা লোকটা আর সেই ড্রাইভারটা ওরই দলের লোক—ও তাদের পুলিশে না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল—মানে, পালাবার সুযোগ দিয়েছিল। লোকটা শুধু ডাকাত নয়, জানো, ফ্যাক্টরীতে ধর্ম্মঘট লাগিয়ে দিয়েছিল আজ; কারখানা বন্ধ করে আমাদের ডিম-মাংস-মাখন-রুটি বন্ধ করে দিয়েছিল আর কি!—ওর মত লোককে আবার বাড়ীতে ডাকে—শয়তান একটি!

—আচ্ছা। তাড়িয়ে তো দিয়েছ! যাও এখন—বলে মা ঠাকুরকে রান্নার উপদেশ দিতে লাগলেন মেয়ে চলে এল উপরে বাবার কাছে। মা কিন্তু ভাবতে লাগলেন—ইন্দ্রজিৎ কি সত্যি চলে গেল! একবার দেখাটা অবধি করে গেল না! আশ্চর্য্য তো! কি এমন ঘটলো যার জন্যে চলে গেল সে? মা ওকে সত্যি ভালবেসেছিলেন! কিন্তু স্বামী বা কন্যাকে বিশদভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করতে তাঁর বাধে। ওরা তাঁকেই বিদ্রূপ করবে। বলবে, 'সামান্য একটা কর্ম্মচারীর উপর মা'র দরদ উথলে উঠেছে। তবু যদি সে গুণ্ডা না হয়ে ভাল লোক হোত!' থাক্—অহেতু কৌতূহল প্রকাশ না করাই ভাল।

মনের ব্যথা এবং কথা দুটোই চেপে রাখা আধুনিক সমাজের রীতি, বিশেষ করে এই সব অভিজাত পারিবারে। এখানে কথা বলতে হলে সম্মান বাঁচিয়ে

বলতে হবে এবং ব্যথা-বোধটাও সম্মানিত ব্যাপার থেকে আসা চাই—নইলে এরা অনভিজাত হয়ে যায়। কিন্তু কাবেরীর এই মা'টি সে রকম নন। বনেদী জমিদার বাড়ীর মেয়ে তিনি, তাঁর বাবার বাড়ীর আমলাদের সম্মান এবং প্রজাদের অধিকার আর আব্দার ছেলেবেলা থেকে দেখেছেন। মাইনে নিলেই তাকে চাকর মনে করতে ওঁর বাধে! তাই এ বাড়ীর চাকর-বাকর ওঁকে মেমসাব্ বলে না, বলে মা।

কিন্তু এইখানেই পিতাপুত্রির আপত্তি—চাকর চাকরই। তার সঙ্গে সম্পর্ক, তার পরিশ্রমটা কিনে নেওয়া হয় দাম দিয়ে। দরদের কোনোই প্রশ্ন আসে না এখানে। হৃদয় বস্তুটা এদের কাছে উদ্ঘাটন করে সুলভ করে তোলা চলে না। হৃদয়গত যে-কোনো রকম উচ্ছ্বাসকে এরা বাদ দিয়েই জীবন-যাপন করতে অভ্যস্থ হচ্ছে। কারণ এসব সমাজের পরিচালক টাকা, এবং টাকাটা হৃদযজাত নয, মস্তিষ্ক জাত। মানুষের বুদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ হয়েছে বোধহয় অর্থনীতিতে। অর্থ-বিজ্ঞানের জটিল রহস্য এদেরকে শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য পাঠ থেকে বেশী আনন্দ দেয়—এত বেশী রোমাঞ্চ এরা আর কোনো কিছুতে অনুভব করে না।

মা একটা নিশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মন দিলেন। ইন্দ্রজিৎ যদি আসে তাহলে তার কাছেই শুনবেন ঘটনাটা।

কাবেরী উপরে বাবার ঘরে এসে দেখলো, তিনি পোষাক খুলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে মোটা একখানা বই পড়ছেন; বইটার নাম দেখতে পেল না কাবেরী কিন্তু দেখলো, চমৎকার বাঁধানো বই, ঝকঝক করছে উপরটা। বাংলা বই এর অভিজাত সংস্করণ! বাংলাদেশে এরকম ছাপা আর বাঁধানো বই কমই বার হয়েছে। একটা নতুন কোম্পানী বাংলা বইয়ে এই আভিজাত্য দান করেছে, নইলে বঙ্গ সরস্বতী বোধ হয় বটতলাতেই থাকতেন। বিশুদ্ধ ভেজালকে ওঁরা অর্থের পুর পরিয়ে অভিজাত করে তুলেছেন—এই কৃতিত্বের মূলে কাবেরীর বাবারও কথঞ্চিত দান আছে। ঐ কোম্পানীতে তাঁর শেয়ার আছে কিছু। কাবেরী শুধুলো,

—নতুন কিছু বই বেরুলো নাকি বাবা ?

—হ্যাঁ! কিন্তু তুই এখন এগুলো পড়িস না।

—কেন বাবা ? ওগুলো কি খারাপ বই ?

—খারাপ হবে কেন রে! এত টাকা খরচ করে ছাপা তোল—খারাপ কেন হবে ? তুই এখন কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ পড়—তারপর এগুলো পড়বি।

—অনেক পড়লাম বাবা রবীন্দ্রনাথ। এখন একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে ক'রছে। দাও বইটা।

—না! বোস ওখানে। তোকে যে কথাটা বোঝাচ্ছিলাম অর্থনীতি, শোন, যে কোনো উপন্যাস থেকে সে বিষয় ইন্‌টারেশটিং ..

কাবেরী বুঝলো, বাবা তাকে বইটা দেবেন না, তাই অন্য কথার অবতারণা করে ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইছেন। হেসে বললো—রবীন্দ্রনাথ কখন পড়বো বাবা তাহলে! অর্থনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একেবারে খাপ খায় না যে!

—মুখ বদলাতে চাইছিলি কি না, তাই অর্থনীতি বোঝাচ্ছি—শোন।

কাবেরী হাঁটুর উপর সুন্দর ভঙ্গীতে হাত রেখে বলল—বলো।

—মন্বন্তর আরম্ভ হয়ে গেছে—মিঃ চ্যাটার্জি বইখানা তাঁর পাশের ড্রয়ারে ভরে তালা দিলেন। কাবেরী বুঝলো, বাবা তাকে ও বইটা পড়তে দেবেন না। হাসলো আবার।

—এই মহামন্বন্তরের মহাসুযোগে কিছু নাম কিনে নিতে হবে—বুঝলি বেটি, তুই একটা রিলিফ-সোসাইটি অর্গানাইজ কর—আর তুই-ই প্রথমেই চাঁদা দে হাজার পাঁচেক টাকা। তারপর টাকা তোলবার জন্যে চ্যারিটি শো কর একটা। ঐ যে মাঠখানা রয়েছে, ওতে আমি একটা লঙ্গরখানা খুলে দিচ্ছি তোদের রিলিফ-ফণ্ডের নামে—খিচুড়ী খাওয়ানো হবে নিরন্নদের।

—নিরন্নদের অন্ন কোত্থেকে আসবে বাবা ?—চাল যে মোটে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তার কারণ, চালগুলো আমরাই সব সরিয়ে ফেলেছি। দ্রব্য মূল্য আর অর্থমান আমরাই বাড়িয়ে দিয়েছি—নইলে দুর্ভিক্ষ হোত না। লঙ্গরখানার জন্য চাল পাওয়া যাবে সস্তাদরে। সে সব ব্যবস্থা আমি করবো।

—কি লাভ হবে বাবা ওতে?

—লাভ! তুই আমার মেয়ে হয়ে এমন কাঁচা কথাটা বললি কাবেরী! ছি! ওতে পরম লাভ হবে। চাল ডাল ষ্টক করে ব্যাঙ্কের টাকা কেমন ফেঁপে উঠবে শুনলি তো? এখন ঐ টাকার শতকরা একভাগ খরচ করে ঐ নিরন্ন গুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। বেঁচে থাকবে শুধু ওদের দেহখানা, রিকেটি দুচারটা ছেলে মেয়ে আর মরে যাবে ওদের বিদ্রোহ করবার মত মনের তেজ। ওরা না খেয়ে ঠিক কলের কাজ করবার যোগ্য হয়ে উঠবে। এদিকে ওদের কিঞ্চিৎ খাদ্য দিয়ে নাম কেনা যাবে, গভর্ণমেন্টের ঘরে খেতাবও মিলতে পারে—আর দেশের কাছে দেবতা বনে যাবারও সম্ভাবনা। তাছাড়া ওদের স্বদেশীয়ানা আর ধর্ম্মঘটের হুমকী একদম সাবাড় হয়ে যাবে।

—কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তো মরে যাবে বাবা—মরে তো যাচ্ছেই।

—যাক্। ভূভার হরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন, এবার এসেছে হিটলার আর বাংলার এই মন্বন্তর। যে কজন বেঁচে থাকবে তাদের দিয়েই যান্ত্রিক মানুষ সৃষ্টি করে নিতে পারবো আমরা।

—সে কথা ঠিক বাবা। সেদিন একটা বইএ পড়ছিলাম, একজন লেখক লিখেছে, "ভারতের এই পরাধীনতার মূলে নাকি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই চক্রান্ত করে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিয়ে ভারতকে নির্বীর্য্য করে দিয়েছেন। ভাইএ ভাইএ সম্প্রীতি ছিল রামরাজত্বে—শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতৃবিরোধ প্রথম লাগিয়ে দিলেন। নিজকে বেশ নির্লিপ্ত রেখেই তিনি যুদ্ধটি চালিয়ে তাঁর দ্বারকার রাজ্যকে নিরাপদ রাখলেন।"

—রাজনীতির মূল কথাই এই মা, বুঝলি? এ যুগেও ঠিক ঐ রকম চলছে। বড় বড় রাজনৈতিকদের নীতিই ঐ; এর সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধিয়ে নিজকে নিরাপদ রাখা। আমাদের দেশনেতাদের রাজনীতিও শ্রীকৃষ্ণের নীতি। কেউবা কোনদলের সর্ব্বেসর্ব্বা...ঠিক শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রে, আবার তিনি হয়ত সে-দলের সাধারণ সভ্যও নন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ কোনো পক্ষের জন্যই যুদ্ধ করেন নি, শুধু উপদেষ্টা ছিলেন অর্জ্জুনের! দরকার মত দু' লাইন গীতা আউড়ে দিলেই কাজ শেষ—হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

- কিন্তু বাবা, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ওঁদের প্রভাব আমোঘ।

— নিশ্চয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবও আমোঘ ছিল। ভক্তিবাদী এই দেশ একবার কারো মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির স্ফুরণ অনুভব করলে কি আর রক্ষা আছে? চির-তরুণ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথায় উঠতো বসতো—তরুণ ভারত এঁদের কথায় ওঠে বসে—তরুণ ভারত এঁদের নামে দিশেহারা।

—কিন্তু এঁরা ভারতের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকারও করেছেন বাবা - দেশকে জাগিয়েছেন।

—হাঁ রে মা,চরকা চালিয়ে যে ওঁরা চক্রধারী হয়েছেন! চরকাতেই নাকি স্বরাজ এসে যাবে...হাঃ হাঃ হঃ! শোন মা, ওঁদের প্রভাবের প্রয়োজন আছে রাষ্ট্রের শান্তি রক্ষার জন্য তাই রাষ্ট্রশক্তি ওঁদের রক্ষা করছেন সযত্নে -- যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের প্রয়োজন ছিল বলেই তাঁকে শ্রীভগবান বলে রক্ষা করেছিলেন বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে। কিন্তু থাক সে কথা—অর্থনীতির গোড়ার কথাটা বলি—শোন।

কাবেরী বলল—হ্যাঁ বাবা, বলো।

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে হাঁটছিল আর ভাবছিল, তার পথটা ভুল হয়েছে। বিপ্লববাদ ভারতের ধর্ম্ম নয়। ভারত চিরদিনই অধ্যাত্মবাদী। গুরুদেবের কথাই ঠিক। নিজের ভুল স্বীকার করে ইন্দ্রজিৎ তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে গিয়ে! গান্ধিজীর অসহযোগ-আন্দোলন অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আত্মার শক্তিতে বিশ্বাসী, তাই সারা ভারতে এর প্রভাব দীর্ঘ পঁচিশ বছর স্থায়ী হয়ে রয়েছে। ভারতের গণশক্তি তাই গান্ধিজীর অবিসংবাদী নেতৃত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এই অসহযোগটাও বিশ্বাস করে না ইন্দ্রজিৎ চরকার উপর ওর কিছুমাত্র আস্থা নেই। চরকা দিয়ে চল্লিশকোটি লোকের কাপড় হয় না, এই ওর বিশ্বাস! যন্ত্রযুগের সভ্য মানুষ আজ যান্ত্রিক সভ্যতা বিস্তার করে রাজ্য চালাচ্ছে,—কাপড়ের মিল আর কলের লাঙ্গল তৈরী করেছে। কাগজের নোট ছেপে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিস্তার করেছে—এযুগে ঐ চরকা প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ যাদু ঘরেই রাখা যায়। ও দিয়ে অন্য কিছু হয়—বিশ্বাস করে না ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু কি দিয়ে হয়? আধ্যাত্মিকতায় আত্মার স্বাধীনতা আসতে পারে—দেশের স্বাধীনতা কেমন করে আসবে? আসবে—আত্মা নিয়েই দেশ। আত্মা যদি স্বাধীন হয় তো দেশ স্বাধীন না হয়েই পারে না। মনে পড়লো, বন্দী পুরুরাজের কথা—রাজ্যচ্যুত প্রতাপসিংহের কথা, মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজীর কথা—ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আত্মা যাদের স্বাধীন, দেশও তাদের স্বাধীন। কিন্তু আত্মাকে স্বাধীন করবার জন্য পৌরাণিক যুগের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে না ইন্দ্রজিৎ। ওগুলো পুরোনো হয়ে গেছে। এখন—"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" করতে হলে নবতম আধ্যাত্মিকতার উদ্ভাবন করতে হবে—যে আধ্যাত্মিকতা মানুষের আত্মাকে স্বাধীন করে—জীবনকেও স্বাধীন জীবন্মুক্ত রাখে।

সারি সারি কতকগুলো জীবিত কঙ্কাল হেঁটে চলেছে—দুর্ভিক্ষপীড়িত মানব স্রোত। কারো কাঁধে কাপড়ের পুঁটলি, কারো কোলে অর্দ্ধমৃত

শিশু—কেউবা লাঠি হাতে হাঁটছে। কোথায় এরা যাবে ? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে ওর কিন্তু একটা মজার ব্যাপার দেখে থেমে গেল।

গাছতলায় ক্যামেরা খাটিয়ে জনৈক ব্যক্তি ফটো তুলে নিচ্ছেন এই ক্ষীয়মান জীবনস্রোতের। পরপর কয়েকটা ছবি তুলে নিলেন। কয়েকটা লোক বললো—দাও বাবা দুটি পয়সা। একমুঠো চানা দাও মাণিক!

—ভাগ্! ক্যামেরা গুটিয়ে ষ্টেশনের উল্টোদিকে হাঁটতে লাগলেন ভদ্রলোক! ইন্দ্রজিতও ঐ পথে যাবে। লোকটির সঙ্গ নিতে সে তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে শুধুলো—এদের ছবি তুললেন কেন মশাহ ? কি করবেন ?

—কাগজে ছাপা হবে। আমি প্রেস রিপোর্টার—কেন ?

—না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি। ছাপা হলে কি হবে ?

—দেশের লোক জানবে, দুর্ভিক্ষটা ভয়ানক হয়েছে। তাছাড়া মিস্ কাবেরী চ্যাটার্জির ফেমিন রিলিফ ফণ্ডএর কলেকসন বাক্সে এই ছবি আটকে নিয়ে ফণ্ড কলেকসন করা হবে।

—কার ফেমিন রিলিফ ফণ্ড ? কাবেরী দেবীর ? মিঃ মোহিত চ্যাটার্জির মেয়ে ?

—হ্যাঁ, চেনেন নাকি ? উনিই তো পাঠিয়েছেন আমায় এদেশে। এই দিকেই মন্বন্তরটা বেশ জমিয়েছে দেখছি—কি বলেন ? আপনি কি কলকাতার লোক ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মন্বন্তর সব দিকেই জমেছে ভাল। ছবির অভাব হবে না, যত চাই, পাবেন—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—বলুন না। আপনি কি রিলিফ ফণ্ডের কেউ নাকি ?

—আজ্ঞে না। যে মন্বন্তর মানুষের সৃষ্টি তা রিলিফ করবার আমার শক্তি কৈ ?

—মানুষের সৃষ্টি! কি বলছেন ?

—হ্যাঁ, লোভী রাজকর্ম্মচারী আর গৃধ্র ধনিকসম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে এই

মন্বন্তর, কিন্তু সে কথা যাক—জিজ্ঞাসা করছি, মশাই এই কাজে কি রকম উপার্জন করেন ?

—তা মন্দ নয়—শো দুই টাকা মাইনে পাই, তাছাড়া যাতায়াত খাওয়া খরচ। ইন্‌টারেশটিং ছবি বেচেও পাই শ' খানেক। মোদ্দা আমার ভালই চলে। কতদূর যাবেন আপনি ? সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এবার কোথাও শোবার যায়গা দেখতে হবে। আপনার চেনা কেউ আছেন এদিকে ?

—না। আমি শোবার জন্যে আসি নি—তবে একটু বিশ্রাম করলে মন্দ হয় না। আসুন না, ঐ গ্রামখানায় দেখা যাক, বিস্তর কুঁড়ে খালি পড়ে আছে হয় তো ; প্রাণ বাঁচাবার লেগে সবাই তো সহরে পালাচ্ছে !

—চলুন ! ভালো সাবজেক্ট্, মানে শেয়ালে খাওয়া ছেলে বা মেয়ে পেলে ছবি তুলে নেওয়া যাবে। ঐ রকম ছবি একটা পেলে শোখানেক টাকা দাম হয়।

—ওঃ, দেখা যাক, আপনার ভাগ্যে জোটে কিনা—বলেই ইন্দ্রজিৎ এগুলো। ওর মনে হল, ব'লে যে শেয়াল-কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ছবি তুলতেও তো পারেন, কিন্তু কি ভেবে কিছুই বললো না।

আধ মাইল দূরে গ্রামটা। গ্রামে ঢুকতেই মস্ত বড় একটা গাছের ছায়ায় ছোট একটি কুঁড়ে—তার ভেতর থেকে একতারার আওয়াজ আসছে। ইন্দ্রজিৎ ঐ কুঁড়েতেই ঢুকে পড়লো প্রথম তারপর ফটোগ্রাফার। বৃদ্ধ খাটে শুয়ে বাজাচ্ছেন।

—কে ? কোত্থেকে আসছেন ? উনি একতারা বাজাতে বাজাতেই প্রশ্ন করলেন।

—আসছি কলকাতা থেকে। একটু বসতে পারি ? ফটোগ্রাফার বললো।

—হ্যাঁ, বসুন ! কিন্তু কিছু খেতে দিতে পারবো না—জল আছে, গড়িয়ে খান।

—দরকার নাই—আমার কাছে রুটি, মাখন, চা, কলা, লেবু রয়েছে। বলে ফটোগ্রাফার তার যন্ত্র আর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা নামালো। বেলা

আর বেশী নাই, তবে দিনের আলো এখনো বেশ স্পষ্ট। বৃদ্ধ ওদের শুধুলেন,—মন্বন্তরের ছবি তুলছেন আপনারা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি তুলছেন। আমি যাব বিহারীনাথ—আমার গুরুদেব সেখানে থাকেন—তাঁরই চরণ দর্শন করতে যাচ্ছি।

—কে থাকেন ? কোথায় থাকেন আপনার গুরুদেব ? জঙ্গলে থাকেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কোথায় থাকেন ঠিক জানি না। গিয়ে ডাক দিলে উনি বেরিয়ে আসেন—দেখা দেবার ইচ্ছা না হলে বেরোন না।

—ওঃ, বসুন সব। তা উনি আর কার ছবি তুলবেন ? গ্রামের সবাই হয়তো পালিয়ে গেছে। ফাঁকা ঘরগুলোর ছবি কি ভাল হবে ?

রাণী এসে দাঁড়ালো—বললো—ইনাদের লেগে উনুন জ্বালবো নাকি গো ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, উনুন জ্বালুন তো দয়া করে—বললো ফটোগ্রাফার, চা তৈরী করে নিতে হবে। আর চাল নিশ্চয়ই এখানে কিনতে পাওয়া যাবে না ?

—চাল ?—হাসলেন বৃদ্ধ! রাণীও হাসলো সেই সঙ্গে। রাণীই বলল,

—পাবে না কেনে বাবু ? চার টাকায় এক সের চাল জগু সৌ বিক্রি করছে। বল তো, টাকা দাও, আনছি কিনে এক সের।

—চার টাকা সের ? তা হোক, আমি কাল থেকে ভাত খাই নাই। দু'সের চল আনুন—সবাই মিলে খাওয়া যাবে—ফস্ করে একখানা দশ টাকার নোট ফেলে দিল ফটোগ্রাফার। রাণী বিস্মিত হয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে দেখলো, বললো,—বড় লুকরাই ভাত খেতে পায় বাবু, গরীবদের আর উপোয় নাই—চার টাকা সের চাল তুমরাই কিনতে পার···নোটখানা তুলে নিল। উনুনটায় আগুন জেলে দিল শুকনো কাঠ দিয়ে, তারপর জলের হাঁড়িটা নিয়ে জল আনতে গেল ! ফটোগ্রাফার এতক্ষণ প্রশ্ন করলো.

—উনি কে ? আপনার মেয়ে ?

—হ্যাঁ ! আমার জন্যে ও কোথাও যেতে পারছে না। ও কয়দিন কিছুই খায় নি !

—আহা! এ গাঁয়ের সবাই কি পালিয়ে গেছে?

—না, আছে যাদের চাল মজুত করা আছে! আমি তো বাইরে যেতে পারি না, বাবু···ওর কাছেই খবর পাই! আছে কয়েকজন এখনো! পালানো লোকগুলোর জমিজায়গা ভিটেমাটি তারাই দু'একসের চাল দিয়ে কিনে নিল। ধানসমেত ধানক্ষেত বেচে দিয়ে গেল চাষাগুলো!

—হ্যাঁ! তবে ওরা নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে একদিন?

—না—ওদের আর এসে কাজ নেই! ওরা জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মরণের অমৃত লাভ করুক। কোনো স্বাধীন দেশে গিয়ে জন্মাক, যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুর জন্য কঠোর কৈফিয়ৎ দিতে হয় রাষ্ট্রকে। ওরা যাক—বড় দুঃখ সয়ে গেল ওরা। ওদের মৃত্যু-তপস্যায় যেন সত্য জীবন আবির্ভূত হয় এই ভাগ্যহত দেশে।

বৃদ্ধের জ্যোতির্ময় চোখ দুটিতে অশ্রু টলমল করছে। ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে বসেছিল এতক্ষণ। অকস্মাৎ কি ভেবে উঠে বৃদ্ধের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল,

মরণ পথের যাত্রী হে মহাতাপস! পথভ্রান্ত আমি আপনার যজ্ঞশালায় এসে পড়েছি—আমায় আশ্রয় দিন···ইন্দ্রজিৎ অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসটাকে রোধ করে লজ্জিত হয়ে মাথা নামালো!

—বসো, আমি বুঝেছি, তুমি আমার আত্মার আত্মীয়। আমাদের তপোসাধনার যজ্ঞভূমিতে তোমরাই আত্মজ—এই যজ্ঞভূমি রক্ষা করো—এইখানেই তোমার আশ্রয়।

—ইন্দ্রজিৎ চুপ করে বসে রইল। রাণী চায়ের জল চড়াচ্ছে, দেখছে ফটোগ্রাফার হেসে বললো—কথাগুলো ঠিকমত 'ফলো' করতে পারছি না আমি!

—তুমি অনধিকারী বৎস; তুমি জানো না, কোন্ মায়ের গর্ভে তুমি জন্মেছ। তোমার আত্মার এখনো ঘুম ভাঙে নি—বলে বৃদ্ধ ইন্দ্রজিতের গায়ে হাত দিয়ে বললেন তাকে,

—এদের জন্যে বড় করুণা জাগে আমার তোমরা রইলে, এদের দেখো, এদের ঘুম ভাঙিও।

—কি করে ঘুম আমাদের ভাঙবে, বলতে পারেন ?—নাকি ভাঙবেই না ? বললো ফটোগ্রাফার।

—ভাঙবেই। ভিসুভিয়সের অগ্নি যেদিন উদ্গীরিত হবে, সেদিন পম্পাই নগরীর বিলাসের ঘুম ঠিকই ভেঙে যাবে, তবে দুঃখ এই যে, ঘরের বাইরে আসবার আগেই ছাই চাপা না পড়ে।

—কে সেই আগুন জ্বালাবে ?

—আপনি জ্বলবে। তার ইন্ধন তৈরী হবে যুগ-সাহিত্যের অন্তরে—যে অরণির আকস্মিক ঘর্ষণে তোমাদের চেতন-সত্বায় আগুন লেগে যাবে; সে জানিয়ে দেবে, যে উদ্গারণ আরম্ভ করেছে! আমাদের এই পবিত্র তপোসাধনার যজ্ঞশালায় সেই হোতাকে আনবার তপস্যাই আমরা করে গেলাম। এই যজ্ঞাগ্নিতে আমাদের আত্মজ জন্মাবে একদিন।

রাণী চা নিয়ে এল। দুজনকে দুটো মাটির পাত্রে চা দিল—কিন্তু ফটোগ্রাফারের কাছে এলুমিনিয়মের পাত্র রয়েছে, বললো—এইতে দিন ঢেলে। বৃদ্ধ বললেন, চা উনি খাবেন না। খেল ফটোগ্রাফার আর ইন্দ্রজিৎ। রাণী এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে চাল আনতে। ফটোগ্রাফারের মনটা অসন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে—কারণ বৃদ্ধ তাকে উপলক্ষ্য করেই কথাগুলো বলেছিলেন। চা খেয়ে সে বলল,

-আমরা বিজিত জাতি। আমাদের দ্বারা কি আর হোতে পারে ?

--না—বিজিত জাতি নই আমরা। সহস্র বৎসরের সংখ্যাহীন বৈদেশিক অভিযান এ জাতিকে বিজিত জাতিতে পরিণত করতে পারে নি—কোনোদিন পারবে বলে মনে করো না!

ফটোগ্রাফার হাসলো! বললো—ওগুলো ছোট মুখে বড় কথার মতন শোনায় মশাই। শুধু কথার আস্ফালন!

—তোমার কানে তাই শোনাবে—কারণ তুমি বিজাতীয় প্রভাবগ্রস্ত দেশদ্রোহী। কিন্তু আমি বৃদ্ধ, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি—তোমাকে দুটো কথা বলে যাচ্ছি, শোন—যদিও জানি, তোমায় সৎ কথা শোনানো আর অরণ্যে রোদন একই পর্য্যায়ে পড়ে।

—তাহলে থাক, অরণ্যে অনর্থক রোদন করবেন না—বলে ফটোগ্রাফার সিগারেটকেশ বার করে ওঁর সুমুখে ধরলো! এই অহঙ্কারী যুবকের আস্পর্দ্ধা ইন্দ্রজিতের অসহ্য বোধ হচ্ছে—বললো'—আপনার বাবা-জ্যেঠা নেই? লজ্জা করে না ওঁকে সিগারেট অফার করতে!

—থাক্—ওকে কিছু বলো না—বলে বৃদ্ধ চুপ করে যেন ধ্যান করতে লাগলেন—হঠাৎ বললেন,—ইরাণ-তুরাণ, শক-হুন্, পাঠান-মোগল কত এল, কত গেল—আর্য্য সংস্কৃতি অবিচল রয়েছে ঠিক হিমাচলের মত। বিশাল হিন্দুধর্ম্ম বারম্বার সহস্র অত্যাচার সহ্য করেছে—তবু তার সংস্কৃতি কোথাও চিড় খায় নি! এ. পর্য্যন্ত কোনো জাতি ভারতের উপর সাংস্কৃতিক জয়পতাকা স্থাপন করতে পারে নি। আজো ভারত স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, সৎ ধর্ম্মে আশ্রিত।

বৃদ্ধের কথাগুলি যেন ধ্যানস্থ সাধকের স্বতঃ উচ্চারিত মন্ত্রের মত শোনাচ্ছিল। ফটোগ্রাফার অকস্মাৎ বলে উঠলো—ভারতের ভুয়ো সতীধর্ম্ম আর মেকী জাতিভেদই যত কিছু অনর্থের মূল—এইবার সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এই মন্বন্তরেই ···।

—না, যাবে না, কারণ, ভারতের সতীধর্ম্ম শাশ্বত আর ভারতের জাতিভেদ চিরন্তন। জাতি—গুণ কর্ম্ম অনুসারে বিভক্ত হবেই, নইলে Division of labour থাকে না—কিন্তু তোমাকে আমি ঠিকই বলছি বাপু, তুমি স্বদেশজাত বিদেশী। তোমার রক্তের মধ্যে বেদ-বেদান্ত উপনিষদের যে মহান বাণী সুপ্ত রয়েছে, তাকে তুমি সুপ্তই রাখতে চাও। কিন্তু ভারতের আত্মার মধ্যে জাগ্রত সেই মহাবাণী কোনোদিন সুপ্ত হয় নি। কোন বিজেতা ভারতকে ভুলাতে পারিতনা তার ঐতিহ্য, তার কৃষ্টিধারা। সহস্র জাতি, সহস্র ধর্ম্ম ভারতকে ভুলাতে

ভারতের সংস্কৃতির উদরে পরিপাক পেয়ে গেল—কৃষ্টিগত জয় কেউ লাভ করলো না। ভারত জানে—সে অমৃতের সন্তান, অপরাজেয় পুত্র! সে কোন দিন বিজিত হয় নি। রাষ্ট্রগত পরাধীনতা তার কৃষ্টিগত স্বাধীনতাকে বারবার জয় করতে চেষ্টা করেছে—আজও সক্ষম হোল না।

—কৃষ্টি নিয়ে কি করবেন? বেদ-উপনিষদ বাঁচবার জন্য চালডাল দেয় না!

—দেবে! না দিলেও এ জাতি বেঁচে থাকবে শুধু তার কৃষ্টির অমৃত মন্ত্রে! কোন্ বিস্মৃতকাল থেকে সে বেঁচে আছে তার কৃষ্টি নিয়ে। এমনি করেই বেঁচে আছে, আর তার যজ্ঞশালা সে রক্ষা করছে—কোনো বিজেতা সে যজ্ঞশালা অধিকার করতে পারে নি।

—পারে নি?

—না! তোমাদের মতন জনকয়েক অর্ব্বাচীন হয়তো বিজাতীয় মোহে ভুলে নিজকে বিদেশীয় এবং বিধর্ম্মী ভাবতে পারো—তোমরা নিতান্ত নগণ্য। ভারত তার যুগসঞ্চিত ঐতিহ্যের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে অচল—অবিচল আছে।

ফটোগ্রাফার কি জানি কি ভেবে চুপ করে রইল এবার। কিন্তু ইন্দ্রজিত বলল—সাংস্কৃতিক জয় লাভের জন্যই এই অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষ⋯এই শিক্ষা আর সহুরেপনার আড়ম্বর—এই বিলাস আর ব্যভিচারের স্রোত বইছে গুরুদেব।

—ভয় নাই! শ্রুতি এবং স্মৃতি দিয়ে যারা বিস্মৃতদিন থেকে নিজেদের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের ঐতিহ্য রক্ষা করে এসেছে—সেই সাগ্নিক জনকয়েক থাকলেই আবার জ্বলবে বাড়বাগ্নি;—এ সংস্কৃতি-অনল নিববার নয়। এ আগুন ছাইচাপা পড়ে—আবার বাতাস পেলেই জ্বলে ওঠে।

—বাতাস দেবে কে?—সবাই তো মরতে বসেছে!—বললো ফটোগ্রাফার বিদ্রূপের কণ্ঠে,

—না—মরতে যারা বসেছে, তারা মরুক। তাদের মৃত্যুর শ্মশানভূমে এসে দাঁড়াবে সেই অগ্নিমন্ত্রের ঋষি—আমাদের সেই মানস-পুত্র, জাতীয় মনের আগ্নেয়গিরির জ্বালা যার প্রাণকে উদ্বেলিত করবে—যার মধ্যে জীবন্ত, ফুটন্ত,

পরিব্যাপ্তমান একটা প্রত্যক্ষ অনলকুণ্ড প্রকাশিত হবে—জাতির মনকে সেই আগুনে গলিয়ে সে দেবে আবার সেই পুরাতন ছাঁচে নবীন রূপ, নব যৌবন'

কথাগুলি গুরুগম্ভীর হয়ে উঠছে! ফটোগ্রাফার ক্যামেরা কাঁধে ফেলে উঠে বলল—রান্না হোক, আমি গ্রামখানা দেখে আসি, যদি ভাল সাবজেক্ট পাই তো ফ্লাসলাইট্ দিয়ে তুলে নেব।

ও চলে গেল।

খাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে ছিল, ইন্দ্রজিৎ ছিল জেগে। গভীর রাত্রে চুপেচুপে উঠে পড়লো ইন্দ্রজিৎ। ফটোগ্রাফার অঘোরে ঘুমুচ্ছে। রাণীর হাতের খিচুড়ী খেয়ে ওর তৃপ্তির ঘুমটা এখন ভাঙবে না। কিন্তু বৃদ্ধ জেগেই আছেন, চাপা কণ্ঠে বললেন—কোথায়?

—বিহারীনাথ! গুরুদেবের কাছে—তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিল ইন্দ্রজিৎ।

—ওঃ, আচ্ছা, যাও—রাস্তা চিনে যেতে পারবে তো? বন-নদী, তাছাড়া জন্তুজানোয়ার বেরিয়েছে আজকাল—সঙ্গে অস্ত্র আছে?

—আছে!

—ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রটা দেখালো কোমরবন্ধের সঙ্গে ঝোলান। উনি হেসে বললেন—ওটা চোরডাকাতের জন্য কাজে লাগতে পারে—বাঘ এলে ওতে কি হবে?

—বাঘ আসবে না। আমি ঠিকই ফিরে আসবো নিরাপদে—বলে ইন্দ্রজিৎ বেরুলো।

বৃদ্ধ আপন মনেই বলতে লাগলেন—

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি।"

ইন্দ্রজিৎ শেষ অবধি শুনে পথে নামতে নামতে ভাবছে—কী অমিত বীর্য্যবান ঐ বৃদ্ধ! এখনো কত তেজ ওঁর মনে, কত দীপ্তি ওঁর কণ্ঠস্বরে! উনি সেই প্রথম যুগের বিপ্লবী। ইন্দ্রজিৎ দেখেই অনুমান করেছিল, কিন্তু যখন শুনলো, উনিই নেতা সংকর্ষণ—তখন বিস্ময়ের তার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিশেষ কোনো কথা হতে পারে নি—কারণ ঐ ফটোগ্রাফারটা বেরিয়ে গিয়ে তখুনি ফিরে এসেছিল। ইন্দ্রজিৎ ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না। লোকটা গুপ্তচর নয়তো? বৃদ্ধও ওকে সন্দেহ করেছেন কি না, কে জানে?—তবে যে-সব কথা তিনি ইন্দ্রজিতকে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, ঐ লোকটা ফিরে আসায় তা' আর বললেন না। শুধু বললেন—তোমার গুরুদেবকে আমার কাছে একদিন আসতে বলো। আমি শক্তিহীন, নইলে নিজেই যেতাম। —ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনি কি তাঁকে চেনেন?

··হ্যাঁ!—এর পরই এল ফটোগ্রাফার। ইন্দ্রজিৎ ওর ফিরে আসায় মোটেই খুসী হতে পারে নি—কারণ বৃদ্ধের কাছে অনেক বিষয় তার জানবার ছিল—তাই ঠিক করেছে, আবার সকালে সে এখানে ফিরে আসবে। রাস্তা ঠিক মত চেনা নাই; আগে যেদিন এসেছিল, সেদিন অন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এসেছিল। আজ একা। সেদিন ফিরে যাবার পথে বিপজ্জনক পলায়ন আর একটি মেয়ের আশ্চর্য্য চাতুর্য্যের কথা ওর মনে গাঁথা হয়ে গেছে। কিন্তু সেটি কোন গ্রাম আর কে সেই মেয়েটি—আবার যদি খুঁজে পায় ইন্দ্রজিৎ! নামটি শুধু জানা আছে—সেঁজুতি! মানেটা নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে—কোনো ফুলের নাম হয়তো—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে এই কদিন এত ব্যস্ত ছিল ইন্দ্রজিৎ যে অভিধান দেখবার সময় ক'রে উঠতে পারে নি! নামের মানে যাই হোক, বেশ নামটি—"সেঁজুতি"! ইন্দ্রজিৎ নিজের বুদ্ধিকে তিরস্কার করছে—কেন সে সেদিন গ্রামের নামটা জেনে নেয় নি? প্রাণের ভয় কি এতোই বেশি হয়ে উঠেছিল সেদিন? হ্যাঁ, হয়েছিল ভয়। নইলে অমন করে যে জীবন বাঁচিয়ে দিল, অত যত্নকরে চা খাওয়ালো, তার ঠিকানাটাও নিতে মনে রইল না

ইন্দ্রজিতের? কিম্বা সেদিন ঐ ঠিকানার এতখানি গুরুত্ব ইন্দ্রজিৎ অনুভব করেনি! ভেবেছিল, যখন খুসী এসে জেনে নেবে। কিন্তু আজ যে বাংলা-দেশের এই অঞ্চলের অগণ্য গ্রামের অরণ্যে সেগ্রাম লুকিয়ে গেছে! কাউকে জিজ্ঞেসা করতেও লজ্জা করছে ওর। শুধু "সেঁজুতির বাড়ী কোন গাঁয়ে?—" এরকম প্রশ্ন হাস্যকর। অথচ ইন্দ্রজিৎ এদেশে আবার এসেছে, শুধু গুরুদেবের কাছেই নয়—সেঁজুতির কাছেও। হয়তো সেঁজুতির কাছে আসবার টানটাই বেশি। কিন্তু কোথায় সেঁজুতি?

"সেঁজুতি" নামটা ভারী মিষ্টি লাগছে ইন্দ্রজিতের মনে। বেশ একটি অচেনা আস্বাদন। সভ্য সমাজের বহু নারীই ওর পরিচিত, বিশেষ করে, কাবেরীদের, সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে ওকে বহু অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা এবং সুসভ্যা তরুণীর পরিবেষ্টনীতে কাটাতে হয়েছে। দু'একজনের কাছে ও হীরো হয়ে উঠেছিল—কিন্তু ঐ মেয়েটা, ঐ যে সেঁজুতি—ওর কাছে ইন্দ্রজিৎ যেন "কিছুই নয় একটা" হয়ে গেল! অথচ ঐ মেয়েটাই তাকে বাঁচিয়ে দিল—নইলে ইন্দ্রজিৎ এতদিন জেলে পচতো! ওকে খুঁজে বার করবে ইন্দ্রজিৎ। খুঁজবার জন্তে খুব বেশী হয়তো পরিশ্রম দরকার হবে না। ও মেয়ে আগুন—কোনো একদিন নিশ্চয় জ্বলে উঠবে—ইন্দ্রজিৎ ততদিন অপেক্ষা করবে!

মস্ত একটা খাল পার হতে হবে। টর্চ্চটার ফোকাস করে ইন্দ্রজিৎ দেখলো, খালের ওপাশ থেকেই জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে—বিহারীনাথ পাহাড়ের জঙ্গল। পাতলা অন্ধকারে বিহারীনাথের বিশাল অঙ্গ দেখা যাচ্ছে—যেন ঐরাবৎ ঘুমুচ্ছেন! কিন্তু অনেকখানা যেতে হবে এখনো—অন্ততঃ পাঁচ মাইল। ইন্দ্রজিৎ সন্তর্পণে খাল পার হোল—ওপাশে গিয়েই দেখতে পেল রেললাইন। এই লাইনটাই তাদের লক্ষ্য ছিল সেদিন। যাক—ইন্দ্রজিৎ এবার রাস্তা ঠিক করতে পারবে। দ্রুত হাঁটতে লাগলো সে! মাইল দুই এসে সেদিনের সেই ব্রীজটা—দিব্যি খাড়া আছে! এখুনি একটা গাড়ী যাবে এর ওপর দিয়ে—

হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত দুটো—ইন্দ্রজিৎ হাতঘড়ি দেখলো। দূরে ইঞ্জিনের আলো দেখা যাচ্ছে। লাইন ছেড়ে ইন্দ্রজিৎ নদীতে নামলো—ঝম্ ঝম্ শব্দে মেল ট্রেণ পাস করে গেল—দেখল দাঁড়িয়ে!

ইংরাজ জাতির অনমনীয় মনঃশক্তি, অদমনীয় শৃঙ্খলা! আগষ্ট আন্দোলনের এই রুদ্র-রূপকে ওরা গুণ্ডামী বলেই উড়িয়ে দিল এই কয়দিনেই! সব প্রায় স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এভাবে কিছু করা যায় না। নিতান্তই চ্যাংড়ামি করেছিল ইন্দ্রজিতেরা। অনর্থক কতকগুলো জীবন হানী, ধরপাকড, জেল—আরো ভীষণ কিছু—হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে—ইন্দ্রজিৎ নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিল। তার দলের প্রায় সাতাশটি ছেলে ধরা পড়েছে! এদের জীবনের জন্য ইন্দ্রজিৎ আজ নিজেকে দায়ী মনে করে! কেন সে করতে গেল এমন হঠকারিতা! আত্মগ্লানিটা ওকে ধিক্কৃত করতে চাইছে, কিন্তু নদীর তটের দিকে নজর পড়লো অকস্মাৎ! মুড়ো বাব্‌লা গাছটার কাছ দিয়ে সেদিন সে ছুটেছিল—ঐ দিকে গেলেই সেঁজুতিদের বাড়ী যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই ভীষণ ক্ষণে কোন্ পথ দিয়ে কেমন করে ছুটেছিল ইন্দ্রজিৎ, মনে করা অসম্ভব এখন! দূর ছাই! এরকম অব্যবস্থিত চিত্ত নিয়ে কিছুই করা চলে না। বিপ্লবীদের কথা ভাবতে ভাবতে ইন্দ্রজিৎ সেঁজুতির কথা ভাবলো। প্রেমে পড়ে গেল নাকি! ছিঃ! এতখানা অধঃপতন হোল তার! প্রেমে পড়বে ইন্দ্রজিৎ! না-না, কৃতজ্ঞতা ঐ মেয়েটির উপর। ও তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ওর কথা মনে না রাখলে ইন্দ্রজিৎ আর মানুষ থাকবে না!

নিজের চিন্তায় ফিরে এল ইন্দ্রজিৎ—হাঁটছে দ্রুত। নদীপারের বনজঙ্গল আর পাহাড়ের উচুনীচু পথ। নিস্তব্ধ বনানী যেন নিবিড় ধ্যান-নিমগ্ন। কিসের এ ধ্যান? কার জন্য এই তপস্যা? বনানীর প্রাণ সত্ত্বা কি ঈশ্বরের ধ্যান করে? ঈশ্বর কি সত্যি আছে? বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ পড়েনি ইন্দ্রজিৎ—পড়তে ওর ইচ্ছে করে না। যে জাতি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না পেট

ভরে তাদের আবার ধর্ম্ম কি?—উচ্চ চিন্তার প্রয়োজন কিসের?—ঈশ্বর হবে কি তাদের? পৃথিবীতেই তো তারা নরক ভোগ করছে!

না, প্রয়োজন আছে! ঐ বৃদ্ধ সঙ্কর্ষণ বললেন—বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের কৃষ্টিধারা আজো সঞ্জীবিত রেখেছে—সাগ্নিক করে রেখেছে সেই অগ্নি, ধারণ করে আছে সেই ধর্ম্ম—তাই সহস্র বিজেতার দুন্দুভিনাদ ভারতের গগনে বিলীন হয়ে গেল। ভারতের কৃষ্টি আজো অপরাজেয়। 'কালচারেল কংকোয়েষ্ট' কোনো বিজেতাই করতে পারে নি ভারতের উপর—তার একমাত্র কারণ, ভারতের ধর্ম্ম-সাধনা, ভারতের সংস্কৃত, ভারতের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্—নইলে ভারত আজ পাদরীদের 'সুসমাচারের' প্লাবনে আত্মাকে হারিয়ে ফেলতো! ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের দুটো উদ্দেশ্য—কেরানী তৈরী আর 'কালচারেল কংকোয়েষ্ট' ব্যর্থ হয়েছে ভারতের সানতন ধর্ম্মের কাছে। নারী-স্বাধীনতা ভারতকে গার্গী মৈত্রেয়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—নতুন ভাবে; বিলাতী কাপড় আর বিদেশী প্রসাধনে ভারতকে স্বদেশী "শকুন্তলা কাদম্বরীর" যুগে ফিরিয়ে এনেছে—স্বদেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে উদ্ঘাটন করেছে; সাংস্কৃতিক চেতনায় ভারত আজো বিজিত নয়—বৃদ্ধ ঠিকই বলেছেন।

কী যেন বিপুল গৌরব অনুভূত হচ্ছে মনে—ইন্দ্রজিৎ অক্লান্ত পদে দ্রুত হাঁটছে। আর দূর নাই, এসে পড়লো প্রায়। কিন্তু খাড়া পাহাড়—উঠতে প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে ওর। সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে!

উঠে এল ইন্দ্রজিৎ একটা জায়গায়—যেখান থেকে সাংকেতিক শব্দ করলে গুরুদেব শুনতে পাবেন। একরকম বন্য পাখীর ডাক তিনবার ডাকতে হয়; ইন্দ্রজিৎ দম নেবার জন্য অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলো—চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। নাঃ, কেউ কোথাও নেই। বেশ নিঃস্তব্ধ অরণ্য। তার পশ্চাতে কেউ অনুসরণ করছে কিনা, সেটাও ভাল করে পরীক্ষা করলো। তারপর ডাক দিল—তীব্র একটা অদ্ভুত শব্দ। তালুতে জিভ ঠেকিয়ে সেই শব্দ বার করতে অভ্যাস করতে হয়। তিনবার শব্দ করে ইন্দ্রজিৎ বসলো ঐখানে;

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনর মিনিট! কৈ, গুরুদেব তো আসছেন না! দেখা দেবার ইচ্ছা না থাকলে তিনি অন্য একরকম শব্দ করে উত্তর দেন--তাও তো দিলেন না! তাহলে কি তিনি উপস্থিত নাই এখানে! কিন্তু এই সাধন-স্থান ছেড়ে উনি তো কোথাও যান না! ইন্দ্রজিৎ আর একবার শব্দ করবে কি না ভাবছে, কিন্তু মনে পড়ে গেল—এরকম শব্দ পুনরায় করা নিষেধ! গুরুদেব কি তবে ঘুমিয়ে গেছেন? কি করবে বসে বসে ভাবছে ইন্দ্রজিৎ—আধঘণ্টা পার হয়ে গেল—তিনটে বেজে গেছে। এতখানা রাস্তা এসে দেখা না পাওয়ায় ওর মন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ছে! কিন্তু ফিরে যেতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। ইন্দ্রজিৎ রাত্রির রূপময়ী প্রকৃতির স্তব্ধতাব ভয়াল গাম্ভীর্য্য দেখতে লাগলো। আকাশের কোণে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই আলোতে বনানী যেন আরো অপরূপ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর আদিম দিনের অরণ্যের বিজনতা যেন বহু লক্ষ বৎসর পরেও তেমনি রয়েছে আজো। প্রকৃতি-মাতা যেন তেমনি প্রসারিত কোলে বসে আছেন ভীত, ক্লান্ত, সন্ত্রস্ত সন্তানকে আশ্রয় দেবার জন্য এখানে কোন ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই। মানুষের নিয়মনিগড় এখানে ব্যর্থ, আইন শৃঙ্খলা এখানে অবহেলিত! এ যেন মাতার কোল্—আরণ্যক দিনের আদিম মাতার প্রশান্ত অঙ্কতল! আদিম দিনে মানুষ এই মায়ের কোলে বাস করতো, সেদিন সে ছিল গণতন্ত্রবাদী। যুথবদ্ধ সেই মানুষের দল পরস্পরের সুখ-দুঃখের সবটুকু একাত্ম হয়ে উপভোগ করতো। পাথরের অস্ত্র আর শরীরের শক্তি সম্বল করে তারা সকলের জন্য সকলে পরিশ্রম করতো! ধনিক ছিল না, বণিক ছিল না—ছিল শুধু শ্রমিক আর কৃষক! শ্রমকে সেদিন কেউ টাকা দিয়ে কিনতে পারতো না--কৃষি সেদিন ছিল জাতীয় গৌরব। তাই সেদিনকার মানব-সন্তান কৃষি আর পর্জ্জন্যদেবতার হাজার বন্দনা গেয়ে গেছেন তাঁদের আদিম দিনের সহিত্যের মধ্যে

কিন্তু মানুষ সভ্য হোল—সভ্যতার বিস্তার করতে গিয়ে বাণিজ্য করতে

সুরু করলো—রাজতন্ত্র গঠন করলো। জাতীয় শক্তি এক-নেত্রীত্বের ইঙ্গিতে দেশের পর দেশ জয় করে সভ্য নগর, গ্রাম পত্তন করলো। ফলে হোল দলে দলে বিভিন্নতা, জাতিতে জাতিতে বিরোধ, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভেদ—যা আজকার মারণাস্ত্র নির্ম্মাণের চরম উৎকর্ষ আণবিক বোমায় উন্নীত হয়েছে! ধ্বংসযজ্ঞের এই হয়তো সর্ব্বশেষ অস্ত্র, কিম্বা এরও পরে আরো কিছু আছে, কে জানে! প্রপীড়িতা সেই আদিম দিনের প্রকৃতিমাতা আপন সন্তানের পদভারে আজ মূর্চ্ছিতা—সংজ্ঞাহারা! তার অন্তরের গোপন অভ্যন্তর থেকে মানুষ আজ মণিমুক্তা চায় না—খুঁজে ফিরছে গন্ধক-সোরা-সালফিউরিক য়্যাসিড—তাতেও তৃপ্তি নাই—ইউরেনিয়ম নিয়ে সে আণবিক শক্তিকে নিয়োজিত করছে তার ধ্বংসযজ্ঞে। মানুষ আজ মানুষের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে তার বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ধ্বংস-শক্তিতে। আদিম দিনের সেই গোষ্ঠীগত মানবসমাজ সেই গণতন্ত্রের সূত্র কোথায় যে হারিয়ে ফেলেছে, কে জানে? সভ্য মানুষ তাকেই আবার আবিষ্কার করবার জন্য থিওরী খাড়া করেছে—সেই থিওরীকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য কত লড়াই-ঝগড়া হয়ে গেল। অথচ সে জানে—সে গণতন্ত্রী হয়েই জন্মেছিল, বেড়েছিল। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস উল্টালেই সে বুঝতে পারবে—সে ছিল স্বাধীন, ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রগত স্বাধীন! কিন্তু আজ আর কেমন করে সেইদিনের অসভ্যতায় ফিরে যাওয়া যায়? যায় কি না পরীক্ষা চলছে—চলুক। স্বাধীন দেশে সে পরীক্ষা চলতে পারে—পরাধীন দেশে ওটা অচল।

ইন্দ্রজিৎ নিশ্বাস ফেললো একটা। নাঃ, কোন আশাই নেই! গুরুদেবও এলেন না। ও এবার ফিরে যাবে। উঠে দাঁড়ালো ইন্দ্রজিৎ। ভোর হয়ে আসছে, পূর্ব্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে, রাত্রির অন্ধকার দিনের প্রকাশের সম্ভাবনায় মৃত্যুপাণ্ডুর! ইন্দ্রজিৎ নীচে নামতে লাগলো আস্তে আস্তে!

—দাঁড়াও ইন্দ্রজিৎ!—কার সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর বনানীর স্তব্ধতাকে মথিত করে বাজলো!

ইন্দ্রজিৎ ঠিক করতে পারছে না—কে? কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে। নিঃশব্দেই সে দাঁড়িয়ে গেল ঐখানে। আধমিনিট পরে তার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন গুরুদেব। বললেন—আমি ইচ্ছা করেই আসিনি এতক্ষণ। এই স্তব্ধ নিশীথিনীর মোন মাধুর্য্য আশা করি তোমার মনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রভাবিত করেছে—তুমি নিশ্চয় আজ বুঝতে পেরেছ—যুদ্ধের মধ্যে শান্তি মেলে না—আর যুদ্ধোত্তর শান্তি—ঠিক শান্তি নয়—ক্লান্তি। শান্তি মানুষের জগতে আবার ফিরে আসতে দেরী আছে বৎস! আবার যেদিন মানুষ ধর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় নেবে, মানবত্বকে সবকিছুর থেকে বড় বলে জানবে—ক্ষমা, দয়া আর ঔদার্য্যে যেদিন মানুষ আবার মানুষের পর্য্যায়ে ফিরে আসবে—প্রেম যেদিন মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করবে, বিশ্বপ্রেমের প্রীতি আর মৈত্রী হবে মানুষের আশ্রয়, সেইদিন ফিরবে শান্তি। কিন্তু সেদিন ফিরতে দেরী আছে! আজ মানুষ আণবিক বোমার আবিষ্কার করে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চলেছে—ধর্ম্মকে সে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীর কাজে লাগাচ্ছে, মানবতার নাম করে মানবকুল ধ্বংস করছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার একাধিপত্যের সিংহাসনে ক্রীতদাস করে রাখছে—আজ কোথায় শান্তি!

—গুরুদেব, আমি ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবছিলাম!

—জানি! কিন্তু তোমাদের ঐ বৈপ্লবিক ছেলেমানুষীতে ভারত স্বাধীন হবে না। এ পথ ছাড়! নিরস্ত্র কোটি কোটি মানুষের আত্মিক শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। একটা আণবিক বোমায় শতবর্গমাইল জনপদ ধ্বংস হয়—তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মত কোথায় তোমার হাতিয়ার যে অনর্থক উত্তেজিত হয়ে শক্তির অপব্যয় করলে! শোন ইন্দ্রজিৎ, ভারত চিরদিন শান্তির সাম গান গেয়ে এসেছে। ভারত তার স্বাধীনতা হারিয়েছে ধর্ম্ম রক্ষা করে নয়—ধর্ম্ম ত্যাগ করে। সেই ধর্ম্মকে আবার জাগ্রত করতে হবে। সেই কৃষ্টিধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে আবার ধর্ম্মের একতাসূত্রে বাঁধতে হবে—নইলে তোমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

কিন্তু আমি মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর পূজার ধর্ম্মের কথা বলছি না—বলছি মানব-ধর্ম্মের কথা, জীবন-ধর্ম্মের কথা, বীর-ধর্ম্মের কথা—যে ধর্ম্ম ভারতের চিরদিনের আদর্শ ধর্ম্ম।

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। গুরুদেব আবার বলতে লাগলেন,—সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস তোমাদের ভাল জানা নাই। বাংলাতেই এর উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু এর পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল পাঞ্জাবে। বাঙালী অনিরুদ্ধের নেতৃত্ব সেদিন প্রযোজনীয় হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের পক্ষে, যে অনিরুদ্ধের মাথার মূল্য সরকার থেকে বহু হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হয়! জানো ইন্দ্রজিৎ, টাকার অভাবে যখন আমাদের সেই বিপ্লবীদল কি করবে, ভেবে পাচ্ছিল না, তখন ঐ অনিরুদ্ধই বলেছিলেন, "তাকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কারের সেই কয়েক হাজার টাকা আনা হোক।" বাঙালীর ছেলের ত্যাগ-নিষ্ঠায় সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল পঞ্চনদের হিন্দু ও শিখ সমাজ! কিন্তু তখনো ভারতের পাপের ভোগ সমাপ্ত হয় নি, তাই অতবড় বিপ্লবীদলে ভাঙন ধরলো, আর তার ভেতর প্রবেশ করলো গুপ্তচর—সেদিন যে কাজ সহজ ছিল, আজ তা কঠিনতম হয়ে উঠেছে। আজ আর পূর্ব্বের বৈপ্লবিক পন্থায় কিছুই হবার নয়—হিংস বিপ্লবের মূলে দেশের সমর্থন তুমি পাবে না!

—বর্ত্তমান অসহযোগটাই কি একমাত্র পথ, বলছেন?

—একমাত্র নয়—তবে ওটাও একটা প্রশস্ত পথ! কংগ্রেসের অনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মযজ্ঞে গান্ধীজী একটা সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-সূচী দিয়েছেন—কংগ্রেসকে নির্দ্দিষ্ট একটা আকার দিয়েছেন—মাত্র এই একটি কারণেই তিনি নমস্য।

—কিন্তু বাংলাদেশের উপর তাঁর যেন কোনো কর্ত্তব্য নাই—এমনি মনে হয়, মনে হয় বাঙালীকে তিনি চান না। তাঁর নেতৃত্বে দেশ দীর্ঘ পঁচিশ বছর দুঃখ বরণ করছে—বাঙালী বোধ হয় সব থেকে বেশী দুঃখ বরণ করেছে—অথচ বাঙালীই আজ সর্ব্বভারতীয় উচ্চ রাজনীতিতে অবহেলিত!

সেটা বাংলার দুর্ভাগ্য! অতি মাত্রায় উচ্ছ্বাসপ্রবণ বাঙালী যখন যাকে

ভালবাসে, তাকে একেবারে মাথায় তুলে নাচে। নিজের বুদ্ধি খরচ করে বাঙালী ভেবে দেখে না—কি করছে সে, অথচ বুদ্ধির তার অভাব নাই। এই বেশি বুদ্ধিই তাকে নির্ব্বোধের মতন কাজ করায়—কিন্তু যাক সে কথা, কংগ্রেসের নেতা, হিন্দু মহাসভার নেতা বা অন্য কার কে নেতা, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। নেতা আজো জন্মান নি। কিম্বা কোথাও হয়তো তিনি জন্মেছেন, আমরা তাঁর খবর পাচ্ছি না—যথাকালে পাব। নেতা তিনি, যাঁর আহ্বান হবে অনিবার্য্য, ইর্‌রিজিষ্টিব্ল। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর আহ্বান শুনে গোপীরা যেমন কুলমান ছেড়ে যমুনাকূলে ছুটতো, নেতার আহ্বান হবে তেমনি;—তিনি যেদিন জন্মাবেন—সেদিন তাঁর কাজ তিনি করবেন। হয়তো তিনি জন্মেছেন এবং কোথাও হয়তো তাঁর বিজয়ভেরী বিপুল উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করে দিচ্ছে তাঁর অনুরাগী সৈনিকগণের অন্তর;—সেখানে হয়তো তিনি নেতাজী—তিনিই সর্ব্বাধিনায়ক! কিম্বা যদি তিনি না জন্মেছেন, তাহলে তাঁর জন্মাবার দিনকে নিকটতর করে আনতে হবে আমাদের—ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে হবে—সেই ক্ষেত্রই তোমাদের তৈরী করতে বলছি!

—এখনো ক্ষেত্র তৈরী করবো? আর কতদিন ক্ষেত্র তৈরী হবে প্রভু!

—যতদিন ঠিকমত ক্ষেত্র না হয়। ক্ষেত্র যে হয় নাই তার প্রমাণ তো নিত্য পাচ্ছ! প্রদেশে প্রদেশে বিরোধ, ভাষায় ভাষায় ঝগড়া, জাতিতে জাতিতে অসন্তোষ, ধর্ম্মে ভেদ, কর্ম্মে ভেদ—সর্ব্বত্র ভেদনীতি চলছে। আর এই যুদ্ধের বাজারে কয়েকজন স্বার্থপর ধনী চাজার রকম অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করছে, যার ফলে দেশে এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ লাগলো। জানো ইন্দ্রজিৎ—এই মন্বন্তর শুধু মানুষের মৃত্যুই ঘটাচ্ছে না, বাঙলার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু—বাংলার সংস্কৃতি, বঙ্গ নারীর সতীত্ব আর বাংলার যুবকের শিক্ষা, সেই মহারত্নগুলি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। বাংলার পল্লীতে যারা দীর্ঘ দুঃখরজনী মৃৎপ্রদীপ জ্বেলে জেগে এসেছে—তারা আজ সহরের পথে বেরিয়ে গেল জীবন রাখবার

জন্ম। বাংলার যুগব্যাপী সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—ওকে বাঁচাও। দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার চেয়ে এই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অনেক বেশি মূল্যবান।

—কেমন করে বাঁচাবো? দেশের সর্ব্বত্র ঘুণ ধরে গেছে। গরীবের মেয়ে পেটের দায়ে আত্মবিক্রয় করছে, সেটা হয়তো সম্ভব, কিন্তু মধ্যবিত্তরা শুধু পেটের দায়ে নয়—বিলাসের মোহেও দেহ দান করছে! ধনীরা তো ওটাকে 'স্পোর্ট' বলে মনে করতে শিখেছে কিছুকাল থেকেই।

—হ্যাঁ—তবু বাংলার সংস্কৃতি বাঁচাতে হবে। জাতীয় জীবনে এর থেকে বড় বিপদের ক্ষণ আর আসে নি! বাঙালীর সাংস্কৃতিক পরাজয় কখনো ঘটেনি—এই পরাজয় ঘটলে বাংলাদেশে আর বাঙালী থাকবে না।

—বুঝলাম—কিন্তু গুরুদেব, ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে—বাঙালীর সবকিছু ধ্বংস করবার জন্যই এই মন্বন্তরের আবির্ভাব। নিরুপায়ের মত হাত পা কামড়ে দেখতে হচ্ছে আমাদের। এ দুর্ভিক্ষ তো নৈসর্গিক নয়—এ দুর্ভিক্ষ মানুষের হিংসা-দ্বেষ-লোভ প্রসূত!

—হোক! তবুও এই দুর্ভিক্ষের বিপুল বিক্ষোভের মধ্যে বাঙলার সুপ্ত প্রাণ জেগে উঠবে যদি এর সংস্কৃতিটুকু রক্ষা করতে পার। দেশের স্বাধীনতা অর্জন অত সহজ নয় ইন্দ্রজিৎ—দেশকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে সে দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। আর শোন—অস্ত্রবলে ভারতের স্বাধীনতা আনা অসম্ভব—কিন্তু আধ্যাত্মিক বলে ভারত আজো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। এই আধ্যাত্মিক বলই ভারতকে শুধু যে ভারতের স্বাধীনতাই এনে দেবে, তা নয়—পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা এনে দেবে। মনে আছে—শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'India should be freed through her temples' ভারতেই এই একটিমাত্র বস্তু আছে—পৃথিবীবাসী আজো যার কাছাকাছি আসতে পারে নি! পৃথিবীর ক্ষমতামত্ত প্রভুত্বপরায়ণ জাতিরা আজ এ্যাটোম বোম আবিষ্কার করে বিশ্বের ধ্বংসের ব্যবস্থা করছে—তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, মানবতা আর শান্তিরক্ষার মেকী বুলি ঝেড়ে একজাতি অন্যজাতির উপর নির্দ্দয় হত্যালীলা

চালাচ্ছে—ভারত তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গেলে ভুল করবে। ভারতের যজ্ঞশালায় শান্তির মন্ত্র ধ্বনিত হয়, সাম্য-মৈত্রীর বাণী ক্ষরিত হয়—অমৃত উৎসারিত হয়। আজ ভারত পরাধীন, তাই তার শান্তির বাণী প্রভুত্বপরায়ণ জাতিগুলির কাছে অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু তারা নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন নেজেরাই করছে বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরী করে! এতে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ লাগিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেরী লাগবে না। সেদিন যেন ভারতের পবিত্র আত্মা বেঁচে থাকে—তাদের মৃত্যুর শ্মশানভূমে শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করে।

—কিন্তু কেমন করে থাকবে বেঁচে ?

—রাখতে হবে বাঁচিয়ে। যেমন করে হোক, ভারতের পবিত্র সদ্ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—আর এই ধর্ম্মের শক্তিতেই মানুষ আবার মনুষ্যত্বে ফিরে আসবে।—যাও, তোমায় যে কাজ করতে বলা হয়েছে—কর গিয়ে।

ইন্দ্রজিৎ প্রণাম করে চলে এল।

পঞ্চাশ সালের পুজার সময়। দেশজুড়ে হাহাকার—অন্ন নাই। মানুষ মরছে শুধু না-খেয়ে নয়—লোঙ্গরখানার খাদ্য পেটচাড়া দিয়ে খেয়েও! দেশের বহু জায়গাতেই লঙ্গরখানা, অর্থাৎ, নিরন্নদের খাদ্য দেবার জায়গা। যুদ্ধের বাজারে যারা হাজার রকম ফিকির ফন্দী খাটিয়ে দু'দশ লাখটাকা কামিয়ে নিল, তারা দু একশ' খরচ করে সেই সঞ্চিত পাপটা কাটিয়ে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে নিতে চায় কাঙালীভোজন করিয়ে। ভবিষ্যতের সুদিনের আশাও আছে তাদের। দেশটাকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করে এইসব মুনাফাখোর মেকী স্বদেশসেবক দেশের বুকে বুক ফুলিয়ে বক্তৃতা ঝাড়ছে—"এদের আমরা বাঁচাবো—এদের জন্য আমরা সর্ব্বস্ব পণ করবো।" কিন্তু মোটর নইলে এরা

চলতে পারে না। দু'পাশের মৃত মানুষের দুর্গন্ধে তারা নাক চেপে ধরে আর যে পার্কগুলোতে ওরা বক্তৃতা দিতে আসে তার চারদিকেই পড়ে থাকে মৃত্যুকাতর মানুষ—ওরা তাই দেখে বক্তৃতা রচনা করবার প্রেরণা পায়—সে বক্তৃতায় থাকে বলশেভিজম্, সোশ্যেলিজম্, কমিউনিজম্—কি না থাকে? শুনলে মনে হবে—কথা দিয়ে ওরা হিমালয় গড়তে পারে! কিন্তু ওগুলো ফেনা—খানিক পরেই গলে জল হয়ে কোথায় গড়িয়ে যায় তার ঠিক থাকে না।

নেতারা সব জেলে। বাংলাদেশের জন্ম বিশ্ববাসী ভেবে অস্থির হোল, কিন্তু চাল এল না! চার টাকা মন চাল চল্লিশ টাকায় উঠেছে! মানুষের ক্রয়শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে—কিন্তু চাকর আর মনিবের ক্রয়শক্তি ঠিক আছে! তারাই কেনে চাল—খায়-দায়—বেশ আছে। কিন্তু তারা এই বিরাট বাংলা দেশের অতি তুচ্ছ অংশ! বাংলার যারা প্রাণ, সেই কৃষক, মৎস্যজীবী কারুজীবী, তেলী, তাঁতী, মালী, মালাকার, নৌকার মাঝি আর পাল্কীর বেহারা ঝড়ে আম পড়ার মত মরছে। বাংলার প্রাণশক্তিটাই মৃত্যুবরণ করলো, বেঁচে রইল দেহের কয়েকটা অধঃ অঙ্গ—অপরের হুকুম মোতাবেক যে-অঙ্গ চলাফেরা করে!

লোকাধীশ গ্রামের পথ বেয়ে চলছিল। কয়েক ঘর মধ্যবিত্ত এখনো আছে, যারা অনাহারে মরলেও ভিক্ষা করতে পারে না। বাকী যারা—যারা এই গ্রামের সমৃদ্ধির মূলে, সেই কৃষক শ্রমিকদল গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, কিন্তু যাবে কোথায়? মৃত্যু দেবতা সারা বাংলাদেশ জুড়ে জাল ফেলেছেন। রেল লাইন ভেঙেছে বর্দ্ধমানের ওপাশে—কলকাতা যাবার পথ বন্ধ—আর শোনা যাচ্ছে, কলকাতায় নাকি লঙ্গরখানা হয়েছে বিস্তর—তাই নির্ব্বোধের মত অশিক্ষিত পল্লীবাসী কলকাতার দিকেই ছুটছে। মাঝে কে কোথায় মরলো, কে জানে? সাতপুরুষের ভিটে ছাড়া হয়ে ওরা রাস্তায় পড়ে মরে গেল—মরে গেল বাংলার প্রাণসত্ত্বাটুকু!

এই মৃত্যুর ইতিহাস উগ্রবেদনায় একদিন জ্বালা ধরিয়ে দেবে জাতির জীবনে—সেদিন কবে আসবে, কে জানে—কিন্তু আসবে। তাই লোকাধীশ চলেছে পথে। সে এই মৃত্যু-যজ্ঞের অঙ্গারগুলি কুড়িয়ে রেখে যাবে—রেখে যাবে অনাগত যুগের বীরধর্ম্মী বাণী-উদ্গাতার জন্য, যিনি মন্ত্রের মত অমোঘ শক্তি সঞ্চারিত করবেন তাঁর সাহিত্যে—মৃত জাতিকে আবার সঞ্জীবনীমন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তুলবেন। জাতির এই বেদনার ইতিহাসই হবে তখন জাতীয় মুক্তিসাধনার অভীমন্ত্র!

কিন্তু কে সেই মহাসাধক! কখন তিনি আসবেন? পরানুগ্রহপুষ্ট অনুকরণপটু এই সাহিত্যের আসরে কবে কোন্ মহেন্দ্রলগ্নে ধ্বনিত হবে তাঁর কণ্ঠস্বর! লোকাধীশ নিরাশ হয়ে পড়েছে;—সে সাহিত্য কি সৃষ্টি হবে এই দেশে? যে সাহিত্য উগ্র উদাত্তকণ্ঠে বলতে পারে—

"Grace, teurer freund, its allc, Thearic
Und grun des Lebeus goldner Bauni"—Goethe

"All theory, my friend is grey, but the spreading tree of life is green." "হে বন্ধু, সমস্ত মত এবং পথ বদলে যেতে পারে—কিন্তু জীবনের বিশাল মহীরুহ চির সবুজ—চির-জীবন্ত"—মৃত্যুকে ভয় করো না। মৃত্যুর মুখোস পরে আজ অমৃতলোকের বার্ত্তা এসেছে তোমার দুয়ারে; হে বন্ধু, এই মৃত্যুর শ্মশানে তোমার জীবনের মহীরুহ রোপন কর।

লকুদা!—সেঁজুতি ভাঙা দেওয়ালটার ওপাশ থেকে ডাক দিল! লকু হেসে বললো—তুই কি ঐ খানটাতেই বসে থাকিস সেঁজুতি দিনরাত্তির?

—না—তোমায় দেখতে পেলাম যে রান্নাঘর থেকে। এসো, উঠে এসো!

লোকাধীশ উঠোনে এসে দাঁড়ালো। সেঁজুতিকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—

—তাহলে রান্নাঘরেও তোর কাজ থাকে আজকাল—বাঃ! সুখবর তো!

—হ্যাঁ—লকুদা—আজ একটু কাজ পড়েছে রান্নাঘরে—সেঁজুতিও হাসলো!

চাল কোথায় পেলি ?—লকু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটার পানে।

—ভয় নাই, অন্যায় কিছু করি নি—হাসছে সেঁজুতি—চাল নয় লকুদা—বাড়ীর গাছে একটা মৌচাক হয়েছিল, পাড়তে গিয়ে মৌমাছির কামড় খেলাম—এই দেখ...।

সেঁজুতির হাতের দু'তিন জায়গায় ফুলে উঠেছে, কিন্তু সে-বিষয়ে কিছু না বলে লকু শুধুলো,

—মধু পেলি কিছু! তাহলে মধু খেয়ে একটা দিন চলে যেতে পারে!

—পেয়েছি একটু! অর্দ্ধেকটা নিয়ে যাও, তারই জন্যেই ডাকলাম।

কিন্তু লোকাধীশের নেবার ইচ্ছে নাই। কতটুকুইবা মধু পেয়েছে,—তাই এরা তিনজন হয়তো খাবে—তার অর্দ্ধেক ভাগ লোকাধীশ নিলে কারুরই বাঁচবার আশা থাকবে না। লোকাধীশ বললো—ও থাক—ওর আর কি ভাগ নেব সেঁজুতি!

—তোমার জন্যে তো নিতে বলছি না—বৌদি আর খোকার জন্যে নিয়ে যাও!

সেঁজুতি একটা পাথরের বাটিতে দিল আধপোয়াখানেক মধু! বলল,—বেশি খেলে গা গুলোয় লকুদা,—দুচার ফোটা করে তিন চার দিন খাওয়া যাবে।

হাসলো সেঁজুতি—যেন কান্নার উচ্চতম সংস্করণ! লোকাধীশ সেই হাসিটুকু দেখে বললো—দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছিস সেঁজুতি ?

—না লকুদা, নিজের কথা ভাবছি না—সারা দেশটাই গেল। বাংলার বারো মাসের তেরো পার্ব্বণে যারা বাঁচিয়ে রেখেছিল হাজার বছরের সভ্যতা, তুলসীতলার প্রদীপে আর সকাল-সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনিতে যারা জীবনে নিত্য নূতন আস্বাদ আনতে পারতো, তারা সব মরে গেল লকুদা—বাংলার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে গেল!

—না! লকু দৃঢ়স্বরে বললো—না! যতক্ষণ তোর মত দুটোচারটে মেয়ে আছে ততক্ষণ নিশ্চয় বাংলার বিশেষত্ব নষ্ট হবে না।

—আমরা আর কদিন ?

—তোদের আমরা বাঁচাবোই। তোরাই বাঙলার সংস্কৃতির বাতিকা—তোরাই আবার আনবি যুগের ভগীরথকে। সেঁজুতি, তোদের সন্তানই বাঙলার ভস্মসাৎ সগর-বংশকে আবার নতুন জীবনে জীইয়ে তুলবে।

সেঁজুতি কিছু বললো না। লকুও বাটিটা নিয়ে আস্তে পথে নামলো!

কিন্তু বাড়ী এলো না লোকাধীশ—গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে চলতে লাগলো। জমিদার সুবোধ বাড়ীর বারান্দায় বসে রয়েছে—চারপাশে অনেকগুলি লোক। কাছাকাছি তিন-চার খানা গ্রাম থেকে লোকরা এসেছে। সুবোধ বলছে—চালের মন আজ-কাল তিন কুড়ি টাকা—পুজোর সময় সবাই চাল চাইছো; আমি এত পাই কোথায়? আর জমিগুলোন যে তোমরা বেচতে চাইছো, এর পর খাবে কি?—আসছে বছর বাঁচবে কি করে?

—ই বছর আগে বাঁচি বাবুমশাই। আসছে বছর যা হয় হবে—আপুনি রক্ষে করুন।

—বেশী কাউকে চাল দিতে পারবো না। তিন বিঘে জমি লিখে দাও—একমন চাল।

—যে-আজ্ঞে! লোকগুলোর মুখে হাসি ফুটলো! তিন বিঘে জমি, যার দাম হাজার টাকা, আর একমন চাল নিয়েই সেটা বিক্রী করতে পারলে বেঁচে যায় এরা! উঃ। চাল যে সোনার চেয়ে, হীরার চেয়ে মূল্যবান—তা এই মন্বন্তরে ভালো করে বুঝলো সব। লোকাধীশের মনে পড়লো—আর্য্য ঋষির বাণী—"অন্নং বহু কুর্ব্বিত তৎব্রতম্" আবার মনে পড়লো বাংলা সরকারের "গ্রো মোর ফুড্" আন্দোলন। কৃষিপ্রধান ভারতের জীবাত্মা রয়েছে শস্যক্ষেত্রে আর গোচারণভূমিতে। ভারতের সমস্ত সাধনা রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমিতে "সীতা" রূপে জাগ্রত হয়েছিল—কিন্তু অনার্য্য রাক্ষস

দ্বারা অপহৃতা সেই সীতা—বৈদেশিকের বিশালায়ত যন্ত্র-দানবের গগন চুম্বী চিমনীর কৃষ্ণ ধূম্রজালে আজ অস্পৃশ্য হয়ে গেছে—অদৃশ্য হয়ে গেছে। আজকার ভারতে "গ্রো মোর ফুড্" আন্দোলন একটা বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত ছাড়া কিছু নয়।

সুবোধ দেখতে পেলো লোকাধীশকে। নিঃশব্দে সুসংযতভাবে বসিয়ে মিষ্ট কণ্ঠে ডাক দিল—এসো হে লকু এদিকে কোথায় এসেছো ?

—এলাম তোমারই কাছে !—বলে লকু এসে বারান্দার এক ধারে দাঁড়ালো।

—বসো ! কি খবর ভাই ! খোকা আর বৌদি ভাল আছে তো ?

—হ্যাঁ ! এখনো আছে ভালই। তবে গ্রামের চালগুলোকে যেভাবে তুমি সরাচ্ছো, তাতে ভালো আর কেউ থাকবে না—কিন্তু সুবোধ, আমি ভাবছিলাম—গ্রামের সবাই যদি মরে যায় তো জমিদারী নিয়ে তুমি করবে কি ?

—আমি চাল সরাচ্ছি ? কি সব বলছো তুমি লুক !—সুবোধের চোখ দুটো কপালে উঠলো।

—হ্যাঁ, তুমিই সরাচ্ছো ! তুমি অনেক চাল কিনে রেখেছো। নদীপারের কারখানায় সেগুলো বিক্রী করছো, আর একমন চাল দিয়ে এই হতভাগাদের তিন বিঘে জমি কিনছো—কিন্তু সুবোধ, এরা মরে গেলে তোমার সেই তিন বিঘা জমি চাষ করবে কে ?

—দেখো লকু ! তোমার সঙ্গে পড়েছিলাম, বন্ধু বলে মনে করি, তাই তোমাকে আমি কিছু বলি না। কিন্তু মনে রেখো, মানুষের সহ্য শক্তিরও সীমা আছে ! আর কোনো কথা বলবার আছে তোমার ?

—হ্যাঁ—বলছি যে তোমার সহ্য শক্তির সীমা নাই। তুমি অসহনীয় অপমান সইতে পার—টাকার জন্য তুমি ক্রীতদাস হতে পারো—সম্পদের জন্য তুমি সব করতে পারো—কিন্তু একটা অনুরোধ তবু করতে এলাম, এই গাঁয়ের

চালক'টা তুমি বাইরে যেতে দিও না। গাঁয়ের লোকগুলোকে বাঁচাও, তোমার ভালো হবে সুবোধ!

—আচ্ছা! অনেক উপদেশ ঝেড়েছো লকু: এবার বাড়ী যাও! আমার চাল এত ফেলনা নয় যে গাঁয়ের লোকদের বিলি করতে হবে—পয়সা থাকে কিনে নিক!

—ওঃ, কিন্তু ওরাই তোমার খামারে ধানগুলো তুলে দিয়েছিল—আসছে বছর কে দেবে?

—সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না।

আবেদন নিবেদন নিষ্ফল, লকু জানে, তবু আর একবার কি ভেবে বললো,

—গরু-বাছুর. ঘটি-বাটি ওদের আর নাই কিছু, তুমি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে চাল দাও!

—চাল কাকে দেওয়া হবে না-হবে, সে আমি বুঝবো লকু, তোমার পরামর্শ অনাবশ্যক।

লকু আর কিছু বললো না। আস্তে নেমে নদীর দিকে চলতে লাগলো! গাঁয়ের চাষাপাড়া, ডোম—বাগ্দি বাউরী ইত্যাদি তথাকথিত ছোট জাতিদের কুঁড়ে এদিকে। মাস কয়েক আগেও এপাড়াটা কত সমৃদ্ধ ছিল। চালে চালে লাউ লতা, পুঁই লতা খেলে বেড়াতো—উঠোনে শাকের শ্যামলাভা আর ঘরে ধানের পিরামিড্ ছিল তাদের—মাত্র এই মাস আট-দশ আগে। কোথায় গেল সেই গোলার ধান আর কোথায় বা গেল সেই পিরামিডের অধিকারী ফারুক-ফ্যারাই সম্রাটের দল! সভ্যতার প্রাচীনতম ভূমি মিশরের মতই মরুময় হয়ে গেছে আজ পাড়াটা—খড়ের ঘরগুলো ঠিক পিরামিডের মতই খাড়া আছে—নির্জ্জন, নিস্তব্ধ! লকু ঈশানের ঘরে ঢুকলো—মরে পড়ে আছে ঈশান—শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! তার বছর তের চোদ্দ বয়সের মেয়েটাও মরেছে, যেন পাশাপাশি দুটো ম্যমি সাজানো রয়েছে। উঠানে শক্ত বেড়া, তাই কুকুর শেয়াল এসে খেতে পারে নি এদের! আর শেয়ালকুকুরের খাদ্যের

তো এখন অভাব নেই ; এ দুটো না খেলেও চলবে তাদের। ম্যমী—হ্যাঁ, ম্যমীর মতই দেখাচ্ছে! মেয়েটার পরনের ছেঁড়া শাড়ীখানা তার পচা মাংসে লেগে গেছে ঠিক ম্যমীর মতই দেখাচ্ছে ওকে—মিসরের সমৃদ্ধ দিনের স্মৃতি নিদর্শন!

লোকাধীশ আর বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়ালো না। ঈশান ছিল তার বড্ড অনুগত—আর গাঁয়ের ভালো চাষী। একমুঠো চাল দিয়ে লকু তাকে রক্ষা করতে পারে নি—তার মেয়েটাকেও না—যাক্, ওরা মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি লাভ করুক। লকু নিঃশব্দে এগিয়ে চললো! গ্রামের শেষ প্রান্তে ফকির বাউরীর কুঁড়ে—কুঁড়ে তো নয়, যেন সৌখিন বাংলো! কবিয়াল ফকির অনেকগুলি টাকা খরচ করে মনের মত করে এই মাটির ঘর তৈরী করেছিল। বাইরের দেওয়াল খড়িমাটি দিয়ে নিকোনা, তার উপর সিঁদুর আর পিঠুলির আল্পনাচিত্র, ভেতরে প্রাচীন যুগের পট টাঙানো আর উঠোনে করবী, চাঁপা, গন্ধরাজের গাছ। একটা অশোক গাছও আছে ; কোথা থেকে এনে পুঁতেছিল ফকির। কুঁড়েটিতে ঢুকলেই মনে হবে—কবি কালিদাসের আশ্রম কিম্বা ঋষি বেদব্যাসের তপোবন! শান্তির নিলয় একটুকরো!

লোকাধীশ বাঁশের ফটকখানা ঠেলে উঠোনে ঢুকলো। কে যেন কাৎরাচ্ছে—উঃ মাঃ জীবন যায় না গো!

ফকির!—লোকাধীশ দেখতে পেলো! কাছে গিয়ে বললো—ফকির! চোখদুটো খুলে তাকালো ফকির, বললো—লকুবাবু এসো, আর সময় নাই আমার—তুমি এসেছো, খুব ভাল হোলো—বলে হাসলো ফকির!

—আমি কিছুই তোমার করতে পারবো না ফকির—আমার অবস্থা তোমারই মত!

—তা হোক শুনো লকুবাবু, কি করে এই পাড়াটা নির্ব্বংশ হোলো, আমি নিখে রেখেছি ঐ কাগজে। জমিদার বাবু কতরকম করে আমাদিকে খুন করলো আর পাড়ার বৌ বিটিগুলো কি করে জাহান্নামে গেল, সব নিখা

যাছে—যা দেখলুম, লিখে গেলুম—তুমি ঐ খাতাটা নিয়ে যাও লকুবাবু—আমার ত অনেক কষ্টের লিখা…উঃ মাগো।

লকু হাতের বাটি থেকে কয়েক ফোটা মধু দিল ফকিরের মুখে, তার পর জল দিল কয়েক ঢোক—ফকির চোখ বুজলো। হয় তো ঘুমুবে—লকু চলে আসছে, ফকির চোখ খুলে বললে কষ্টেই—বাঁচবো না লকুবাবু। মরলেই বাঁচি। আমার কবিগানের পুঁথীগুলোন আর ঐ খাতাটি তুমি নিয়ে যাও—ভগবান তোমাদের জীইযে রাখুক, তোমাদের ছেলেপিলেরা পড়ে দেখবে, কত কষ্ট পেয়ে আমরা মরে ছিলুম।…

লকু পুঁথীগুলি আর খাতাটি নিয়ে বললো—এ সম্পদ আমি হীরার মতন যত্নে রেখে দেব ফকির—বাংলার এই মৃত্যুর ইতিহাস আমারই লিখে রাখবার কথা ছিল—তুমি আমার কাজটাই করেছ। ঈশ্বর তোমায় শান্তিময় কোলে ঠাই দিন!

—নারায়ণ!…ফকির চোখ বুজলো! হয় তো মরলো, না হয় এখুনি মরবে। এই মৃত্যুকাতর পল্লীকবির আত্মা আজ তার প্রিয় জন্মভূমির মায়া কাটালো। নিঃসন্তান নিঃসঙ্গ ফকির, পুঁথী, পুরাণ আর কবিগান নিয়েই মেতে থাকতো। মৃত্যুর যজ্ঞশালাতেই সে জীবন-যুদ্ধের ইতিহাস লিখে গেলো—এই মৃত্যুকে অমরত্ব দিয়ে গেলো!

লোকাধীশ বেরুলো আবার পথে। নদীর ওপাশে বিরাট কারখানা, বিশাল এরোড্রাম, বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। জীর্ণ-কঙ্কালসার কতকগুলো নরনারী নদী পার হচ্ছে—কেউ-কেউ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে আর হাঁটতে পারছে না। মারী রাক্ষসী ওদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এতদূরে; এইবার ওরা মরবে। ওদের মৃত্যুর কথা লেখা থাকবে নদীর ঐ বালুকণায়—লোকাধীশ চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

কিন্তু কে যেন একজন নদী পার হয়ে এপারে আসছে; একটি মেয়ে! মন্থর গমনটাকে যথাশক্তি সে ক্ষীপ্র করেছে—যেন ছুটে আসছে। লোকাধীশ

ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো ওর কাছে আসবার। তার মনে হচ্ছে ঐ মেয়েটা যেন তারই কাছে ছুটে আসছে!—এসে পৌছালো মেয়েটি। রাণী ধোপানী! আসতে আসতে বললো—বাবা আর বাঁচবেনা ঠাকুর, চল! এতখুন হয়তো আছে কি নাই কে জানে—আমি ছুটে আসছি তোমাকে ডাকতে। —খুব খারাপ অবস্থা? অসুখ না কি?—লোকাধীশ বললো।

—চার পাঁচ দিন কিছুই খেতে দিতে পারি নাই দাদাবাবু; চলো—দেখবে চল।

—আমি একবার বাড়ীতে বৌদিকে বলে আসি রাণু—তুই এইখানে একটু জিরো আর দেখ—এই মধুটুকু রাখ, যদি বেঁচে থাকেন তো মুখে দেব গিয়ে।

লোকাধীশ ছুটলো বাড়ীর দিকে। রাণী মধুর বাটিটা হাতে নিয়ে বসে রইল একটা শিমুল গাছের ছায়ায়। বাটির মধুটুকুতে একটা কাঁচা পাতা ছিঁড়ে ঢাকা দিলে—নদীর বালি উড়ে লাগতে পারে। শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে ওর। অমন যে স্বাস্থ্য, একেবারে ধ্বসে গেছে যেন! ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল্লো গাছের শীতল ছায়ায়—চোখ বুজলো।…

লোকাধীশ প্রায় ছুটেই বাড়ী এসে ডাকলো—বৌদি, জ্যেঠামশই বোধহয় আর বাঁচবেন না—যাবে তুমি দেখতে বৌদি?

স্বাহা মিনিট খানেক থেমে থেকে বললো—হ্যাঁ, কিন্তু খোকাকেও নিয়ে যেতে চাই। ওঁর আশীর্ব্বাদ খোকা এখনো পায়নি—কি করে নিয়ে যাবে ঠাকুরপো? বড্ড কচি ছেলে, আর এই রোদ…

—তা হোক, তুমি চলে এসো ওকে কোলে নিয়ে! ও কি খেয়েছে বৌদি?

—মাইদুধ ছাড়া তো আর কিছু নাই ঠাকুরপো—মাইদুধও আর নাই!

—তা হলে থাক বৌদি—আমি একাই যাই, তুমি পারবে না অতখানা যেতে!

—না, আমি যাবই! আর খোকাকেও নিয়ে যাবো চলো—স্বাহা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লো! শাশুড়ী বসে সুতো কাটছিলেন, কিছুই বললেন না।

নদীর ধারে শিমুল তলায় এসে ওরা দেখলো, রাণী ঘুমিয়ে গেছে আর পাতা ঢাকা মধুর বাটিটার উপর রাজ্যের বালি উড়ে পড়েছে এসে। স্বাহা সাবধানে বাটিটা তুলে নিল—আঁচল দিয়ে ঢেকে নেবো ঠাকুরপো, চলো।

রাণীকে ডাক দিয়ে তুলে লোকাধীশ নদীতে নামলো। পিছনে স্বাহা, তার কোলে ছেলে আর সবার পিছনে রাণী। ওপারে এসে ওরা দেখলো, পাকা সড়কের উপর দিয়ে সারি বন্দী মিলিটারী লরী চলেছে—কোথায় যাচ্ছে কে জানে! কিন্তু কত লোক, কত সবল সুস্থ, স্বাধীন, সহাস্য মানুষের মিছিল! যুদ্ধ লেগেছে, মারণাস্ত্রের বিভীষিকায় মৃত্যু গর্জ্জন করছে অহরহ—কিন্তু এদের ভ্রুক্ষেপ নেই। হাসি-গান-গল্পে এরা মসগুল—জীবনের অমৃতায়তনে এরা অবিচল, আনন্দময়। যুদ্ধ লেগেছে পৃথিবী ব্যাপী—ভারতের পূর্ব্বসীমায় জাপানী বোমার আস্ফালন চলছে। ভারত রক্ষার জন্য এরা তাই যূথবদ্ধ সৈনিক;—এরা এসেছে কত দূর দূর দেশ থেকে—কত বিশাল সাগর মহাসাগর পার হয়ে এসেছে ভারতকে রক্ষা করতে—আর ভারতের চল্লিশকোটি নরনারী নিঃশব্দে দেখছে, তাদের জন্মভূমি রক্ষা করবার তারা কেউ নয—"তারা নিজবাস-ভূমে পরবাসী।" বাংলার এক সীমান্তে মৃত্যুর গর্জ্জন শোনা গেল বোমার বিস্ফোরণে, অন্য সীমান্ত ভিক্ষা হীনতার ভয়াল আবর্ত্তে চূর্ণীকৃত হচ্ছে। সাত কোটি বাঙালী বাংলাকে রক্ষা করবার জন্য এক মুঠো চাল পেলো না। বাংলার চাল, সারা ভারতের চাল, যারা পৃথিবীর অন্ন একদিন আহরণ করে এনেছে—"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়," সেই বাঙালী-জীবন স্তিমিত হয়ে গেলো। বোমাতঙ্কের নিষ্প্রদীপের সঙ্গে বাঙালীর জীবনও নিষ্প্রদীপ হয়ে যাবে—মুছে যাবে বাঙালীর নাম, বাঙালীর কৃষ্টিধারা, বাঙালীর সাহিত্য সম্পদ, বাঙালীর

ধর্ম্মগৌরব। গোপাল দেবের বাঙালী, বীর প্রতাপাদিত্য—সীতারামের বাঙালী, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রাণ বাঙালী, রঙ্গলাল দ্বীজেন্দ্রলালের চারণ বাঙ্গালী, মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিমের প্রতিভাদীপ্ত বাঙালী, শ্রীরবীন্দ্র অরবিন্দের বিশ্ব বিজয়ী বাঙালী লুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে? না-না-না! কখনো না। লোকাধীশ চোখের জল সম্বরণ করে নিজের মনে যেন আবৃত্তি করলো!

"নিঃশেষে করিব পান,মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা, উপকণ্ঠ ভরি—"

বলেই লোকাধীশ পিছনে চাইল। স্বাগা ছেলেকোলে পিছিয়ে পড়েছে। লোকাধীশ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গেলো ওদের জন্যে। সারি সারি লরী চলেছে রাঙামাটির পথ কাঁপিয়ে ধূলি উড়িয়ে—জয়যাত্রার জীবন্ত বিগ্রহ! মৃত্যুর মধ্যে ওরা অমৃতলোকের সন্ধানে চলেছে, তাই ওদের মৃত্যু শ্লাঘ্য—ওদের মৃত্যু অ-শোক, ওদের মৃত্যু অপাপবিদ্ধ! এমনি করে মরবার অধিকার কি নাই লোকাধীশের? না, নাই! লোকাধীশদের মরতে হবে দিনে দিনে শুকিয়ে, তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে। ভীরু কাপুরুষের মতন মরতে হবে, উঃ—

"শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, কলঙ্ক-সংশয়—"
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়—"

কিন্তু কোনো উপায় নাই। জীবনকে খণ্ডবিখণ্ড করে যন্ত্রণার অপমৃত্যুই সইতে হবে! পরাধীন দেশের দুর্ভাগা মানুষ—কি আর তার করবার আছে? তার বেঁচে থাকার অধিকারও তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না—মরে যাওয়ার ও না!

স্বাহা খোকাকে কোলে নিয়ে এসে পৌছালো। লরী গুলো এখনো চলছে! সুন্দর স্বাস্থ্যবান যোদ্ধারা সব চলেছে। ভারতমাতার কেউ নয় ওরা—তবু ওরাই ভারতকে আজ শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে চলেছে—ওদের ধন্যবাদ দিতে হয় কিন্তু মা'র অসহায় নিরস্ত্র সন্তান আজ অন্নহীন হয়ে পথে পথে ঘুরছে! ভারত রক্ষা করতে গিয়ে আজ বাংলার বুভুক্ষিত নরনারীর জন্য খাদ্য আনবার



'ওয়াগন' নাই। যে চাল আছে তা স্বার্থলোভী বণিক আর দায়িত্বহীন রাজ-কর্ম্মচারীরা লুঠপাট্ করে নিল। দেশের যারা শ্রেষ্ঠ সন্তান—দেশকে যারা অন্নবস্ত্র দিয়ে এ যাবৎ বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেই কৃষক-শ্রমিক আজ মৃত্যু শয্যায়। রেল নাই, নৌকা নষ্ট করা হয়েছে, চাল গুদামজাত করেছে ধনীরা—নিরুপায় বাঙলা-মা বক্ষের নিধিকে কোলে নিয়ে মৃত্যুপথ-যাত্রী!

আকাশের তলা দিয়ে দু'খানা বিরাটকায় প্লেন কর্কশ শব্দে উড়ে গেল। যেন বিশ্ব জয় করতে চলেছে গড়ুর পক্ষী! ঐ প্লেন যারা চালিযে যায়, মৃত্যু তাদের করায়ত্ত। জীবনকে তারা খেলার বস্তু মনে করে। হ্যাঁ, লোকধীশও তাই মনে করতে পারে—মনে করতে পারে—জীবন অতি তুচ্ছ। কিন্তু জীবন যে মহৎ—হোক না তা তুচ্ছ, ঐ তুচ্ছ অগ্নিশলাকা দিয়ে যে মানুষ সৃষ্টি করেছে মহত্তম মানবত্বের যজ্ঞাগ্নি! তুচ্ছ জীবনকে মহৎ মৃত্যুর সুযোগ দান করতে পারলে তবে সে জীবন সার্থক হয়—ওরা তাই দিচ্ছে—ঐ শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদল! আর লোকাধীশ ভীরু অসহায়, অন্নহীন হয়ে মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছে, কোথায়, কে জানে? তুচ্ছ জীবন তুচ্ছই রযে গেল তার কাছে—জীবনের পরাজয় ঘটলো তার!

—ঠাকুরপো!—স্বাহার ডাকে যেন চমকে উঠলো লোকাধীশ। ফিরে ওর কোল থেকে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে লরীগুলোকে দেখতে লাগলো। ওগুলো চলে না গেলে রাস্তা পার হবার উপায় নাই এদের। ওরা যুদ্ধযাত্রী—ওরা বীর সৈনিক, ওরা দেশের সার্থক সন্তান। আর লোকাধীশ? ছেলেটাকে অকস্মাৎ দু'হাতে উচু করে তুলে লোকধীশ চীৎকার করে উঠলো—

"হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
—ঝনন্ রণন্!......
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্ধকারে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন!
—হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয় ভেরী,

করহ আহ্বান,

আমরা দাঁড়াবো উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব—

অর্পিব পরাণ—"

—ঠাকুরপো ?—চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে যে ভাই !

—কাঁদছো ! কেঁদো না বৌদি ! কাঁদবার দিন নয় আমাদের আজ। আজ বল,

"মহৎ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী করে দাও মোরে বজ্রের আলোতে .. ..

তার পরে অকস্মাৎ ছিন্ন কর, চূর্ণ করে লও .....

শেষ লরীখানাও পাস করে গেল। রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল একেবারে ! এই রাঙামাটির রাস্তাটি বহুকালের। নবাবী ফৌজ এর বুকের উপর দিয়ে একদিন চলেছিল ; কে জানে, তারও আগে কোনো হিন্দু রাজার অশ্বমেধ ঘোড়া এর উপর চলেছিল কি না—কিন্তু কিছু দূরেই নিদেশ আছে, পঞ্চ পাণ্ডব এই দেশে এসেছিলেন। মধ্যম পাণ্ডব হিড়িম্বা রাক্ষসীকে নাকি এখানেই বিবাহ করেছিলেন আর এখানেই নাকি ছিল বিরাট গোগৃহ—এই দেশে। হয়তো এই রাস্তাটি সেই গোচারণ ভূমির উপরই ছিল তখন—হয়তো অর্জ্জুনের রথ এই পথেই যাত্রা করেছিল অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে !

অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ কলিযুগে। কেন ?—লোকাধীশের চিন্তার মোড় ফিরে গেল। রাস্তাটা পার হতে হতে আপন মনে বললো—সেই শেষ অশ্বমেধ।

—কি ঠাকুরপো ? স্বাহা পিছন থেকে প্রশ্ন করলো।

—অশ্বমেধ ! ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞানুষ্ঠান। জানো বৌদি, বীরত্বের এত বড় পূজা জগতের আর কোনো জাতি করে নি—শুধু দৈহিক বীরত্ব নয় বৌদি, অশ্বমেধ করতে পারতেন সেই সম্রাট, যিনি বীরত্বে, প্রেমে আর আত্মত্যাগে মানুষের মধ্যে মহত্তম হতে পারতেন—যাঁর মানবধর্ম্ম আদর্শ হ'তে পারতো—তাই শত অশ্বমেধের জন্ত তিনি ইন্দ্রপ্রতিম হতেন। ভারত এমন এক বীর ধর্ম্মের

আদর্শ স্থাপন করেছিল বৌদি—যে বীরত্ব শুধু দৈহিক নয়, আধ্যাত্মিকতাতেও অপরাজেয় ছিল ..কিন্তু......

স্বাহা রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পার হচ্ছিল, কারণ ওদিক থেকে আরো কতকগুলো লরী আসছে। ওপাশে গিয়ে বললো—তবু তো ভারত পরাধীন হোল ভাই!

—হ্যাঁ—তবু ভারত পরাধীন হয়েছে। কিন্তু ভারত বিশ্বাস করে "ঈশ্বর মঙ্গলময়"; এই পরাধীনতার হয়তো প্রয়োজন আছে বৌদি—হয়তো ভারতের রাষ্ট্রগত পরাধীনতার বেদনা ভারতকে অধিকতর শক্তিশালী করবে—সেই বিপুল শক্তির মাঝখানে তিনি আবার জন্ম নেবেন—ভারতের পরিত্রাতা রূপে।

স্বাহা কিছু বললো না আর। ওর মনের অবস্থা খুবই খারাপ। চোখের জল রুখতে পারছে না। এ রাস্তাটা ওর খুবই চেনা, অনেকবার এসেছে কিন্তু পায়ে হেঁটে আগে কখনো আসে নি—গাড়ী পাল্কীতেই এসেছে। তাই শুধুলো,

—আর কত দূর ঠাকুরপো! বড্ড মন কেমন করছে আমার। বাবা হয়তো এতক্ষণ......

—বীরের মৃত্যুতে শোক করতে নাই বৌদি...তবে আমার আশা হয়, এখনো তিনি আছেন! উনি পিতামহ ভীষ্মের মত আমাদের শান্তিপর্ব্ব শুনিয়ে তবে দেহত্যাগ করবেন।

কিন্তু স্বাহা খুব দ্রুত হাঁটছে। খোকাকে কোলে নিয়ে লোকাধীশও আসছে। রাণী বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—দুবার হেঁটে তাই অনেক পেছনে আসছে। দূরে এরোড্রোমের এরোপ্লেনগুলো গর্জন করছে—উড়বে আকাশে। একটা এ্যান্টি এয়ার গান থেকে গোলা ছেড়ে অভ্যাস করছে কয়েক জন। ওদিকে যেতে মানা—তাই ঘুর পথে ধান ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে যেতে হবে এদের। স্বাহা বললো—এই দিকেই যাই ঠাকুরপো—চলো—কি আর করবে

-আটকে রাখতে পারে বৌদি!—তাহলে আরো দেরী হয়ে যাবে!

স্বাহা ক্ষেতের আলেই উঠলো। ঘাসে ভরা আল পথ—মানুষ চলে চলে মাঝখানে সাদা দাগ হয়ে গেছে। দুপাশে ধানের শীষ নুয়ে পড়েছে—খুব ধান হয়েছে এবার। এ ধান উঠলে দেশের দুঃখ আর থাকবে না। সোনার ধান —না—না, ধানের সোনা! সোনা না হলে চলে মানুষের, ধান না হলে চলে না। স্বাহা হাত বাড়িয়ে গোটা কয়েক শীষ তুলে নিল। আহা, কি সুন্দর! হীরে মোতি মাণিক সুন্দর হয়েছে এই ধানের জন্যই। ধান আছে তাই ওগুলো সুন্দর—নইলে ওদের দাম কি! স্বাহা মাথার খোপাতে গুঁজে রাখলো শীষগুলি।

গ্রামটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিঃশব্দ একটা গ্রাম—কোনো সাড়া নাই, কোনো শব্দ নাই—কোনো ঘর থেকে আগুনের ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছে না। মৃত নিঃসাড় গ্রামটা পড়ে রয়েছে বড় বড় আম, জাম, কাঁঠালের অরণ্যের মধ্যে। যেন কোন্ ঐতিহাসিক যুগের হারিয়ে যাওয়া গ্রাম—পরিত্যক্ত—প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু! মস্ত বড় একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামে ঢুকবার মুখেই, ষাঁড়টার চোখে জল ঝরছে! কেন? কেউ নাই দেখে ষাঁড়টা কাঁদছে নাকি! স্বাহা ওর গায়ে হাত দিয়ে বললো,

—কি বাবা ভোলামহেশ্বর! কাঁদছিস কেন?

ষাঁড়টা ওর দিকে তাকিয়ে রইলো—কিছুই করলো না—যেন গভীর দুঃখে স্তব্ধ পাথর হয়ে গেছে! স্বাহা মাথার খোপা থেকে একটা শীষ খুলে দিল ওর মুখের কাছে ধরে।

—খাও…ও বাবা বিশ্বনাথ, খাও…!

না…খেলো না ও! শুঁকে ফেলে দিল। নকু বললো—চলো বৌদি—দেরী করো না!

এসেই পড়েছে ওরা। আর শখানেক হাত তফাতেই তাঁর আস্তানা। স্বাহা গিয়ে ঢুকলো দরজাটা ঠেলে। আকাশের তলায় মাটির উপর উনি শুয়ে আছেন—একটি কম্বলের উপর। মাথায় বালিশের বদলে দু'খানা পুঁথী—পাশে একতারাটি।

বাবা !—স্বাহা ডাকলো। বৃদ্ধ হাসলেন, ক্ষীণ দুর্ব্বল হাসি।

—আয়-মা—খোকাকে এনেছিস? দে, আমার বুকের উপর বসিয়ে দে একবার।

বৃদ্ধ হাত তুলতে চেষ্টা করলেন। স্বাহা ওঁর কোলের কাছে বসে বললো —একটু মধু দিই বাবা তোমার মুখে—বলেই মধুর বাটিটাতে দেখলো বাতি পড়ে গেছে। আঁচল দিয়ে ও ছেঁকে নেবে, কিন্তু বৃদ্ধ হেসে বললেন—বাতি পড়েছে। বাঃ বেশ—বলেই রামপ্রসাদী গান ধরলেন,

"কত রঙ্গ জানিস কালী……

কারো দাও মা দুধে চিনি, কারো শাকে বালি—

কত রঙ্গ জানিস কালী !"

অত দুর্ব্বল, তবু কণ্ঠস্বর এখনো যথেষ্ট সতেজ। কিন্তু লোকাধীশ বললো —গান আর এখন গাইবেন না জ্যেঠামশাই……পরিশ্রম হবে।

—হোক লকু! তোরা এসেছিস, যে-কটা মিনিট বাঁচি একটু গান-গা করে নিই! তোরা এসেছিস, আর তোদের বংশধর এসেছে—এই অমৃতস্য পুত্র!—বলেই উনি খোকার চিবুক ছুঁয়ে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ!

স্বাহা মধুটুকু ছেঁকে ওঁর মুখে দিতে আসতে, উনি আঙুলে নিয়ে খোকা মুখে দিতে দিতে বললেন—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীঃ সন্তোষধিঃ॥ মধুনক্তমুতোষসো মধুমত পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তনঃ পিতা মধুমান্নোবনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তনঃ॥

স্বাহা কয়েক ফোঁটা মধু ঢেলে দিল বৃদ্ধের মুখে। সেটুকু গিলে উনি হেসে বললেন—মৃত্যু কখনো জীবনকে জয় করতে পারে নি মা স্বাহা! জীবন চিরদিন তার গতি অপ্রতিহত রেখে এসেছে, চিরকালই রাখবে। কিন্তু জীবনকে মহনীয় করতে হবে।

—কেমন করে মহনীয় করবো বাবা? জীবনের শেষ অগ্নিকণাও নিবে

—না—বৃদ্ধ উত্তেজনায় উঠে বসতে যাচ্ছেন—লোকাধীশ ধরে ফেললো। উনি বলতে লাগলেন—মারণাস্ত্রের এই বিপুল উৎসবের দিনে তোদের দুটো আশার কথা শুনিয়ে যাই মা, ভারত মরবে না—বাঙলা তো নিশ্চয়ই নয়—কারণ বাঁচিয়ে রাখবার মত মন্ত্র ভারতের আছে—আর বাঙলা সে মন্ত্র জপ করে—সে মন্ত্র ভারতের সাহিত্য, ভারতের যুগযুগান্তব্যাপী জীবন-সাধনার ইতিহাস—সে জীবন অগ্নিশুদ্ধ, তার মৃত্যু নাই।

—সাহিত্য কেমন করে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখবে বাবা?—স্বাগা করুণকণ্ঠে বললো।

—শুধু বাঁচিয়ে রাখবে না—স্বাধীন-স্বশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ করে বাঁচিয়ে রাখবে। জানিস মা—জগতের যে-কোনো জাতির ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য দেয়—শোন—বেদ-উপনিষদ পুরাণাদি······

—হ্যাঁ জ্যেঠামশাই, জগতের ইতিহাসে প্রচুর প্রমাণ আছে তার—সাহিত্যই জাতীয় জীবনে মৃত সঞ্জীবনী—কিন্তু এদেশে তেমন সাহিত্য সৃষ্টি যে প্রায় অসম্ভব, জ্যেঠামশায়—বলে লোকাধীশ বিষণ্ণভাবে চেয়ে রইল আকাশের পানে।

—সাহিত্য জাতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে—জাতির প্রাণশক্তিকে প্রস্ফুটিত করে—জাতির ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে—জাতীয় জীবন-সাধনাকে তার প্রাচীন সংস্কৃতির ভিত্তিতে সুদৃঢ় করে—সে সাহিত্য এদেশে কেন সৃষ্টি হবে না লকু? রাজনৈতিক কতকগুলো বাঁধা বুলি আউড়ে সাহিত্যের বাজারে সস্তা নাম কেনার কথা বলছি না আমি—যে সাহিত্য জীবনের স্ফুলিঙ্গে দীপ্ত—অন্তরের আবেগে অসহনীয় আর জাতীয় কল্যাণে উদ্বুদ্ধ, সে সাহিত্য সৃষ্টির তো কোনো বাধা নেই—তবে স্রষ্টা হয়তো এখনো জন্মান নি। বঙ্কিম-মধু-রবীন্দ্রের বাংলা-সাহিত্য আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, আর আমি বিশ্বাস করি—এই সাহিত্যই বাঙালীকে সহস্র অপমৃত্যুর নিশ্চিত বজ্রপাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে—বৃদ্ধ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

—তুমি একটু বিশ্রাম করো বাবা!—স্বাহা আস্তে বললো। বৃদ্ধ আরো উচ্চকণ্ঠে বললেন,

—না, এবার চিরবিশ্রাম…না মা, আমার বিশ্রাম নেই। আমি সেই অগ্নিযুগের উপাসক--পথের ভুল আমার চোখে ধরা পড়েছে, কিন্তু গন্তব্যের লক্ষ্য আমি তো হারাই নি! তোদের এখানে আসতে বলার প্রয়োজন শুধু তোদের চোখে দেখা নয়, আমার জীবনব্যাপী সাধনার কথা আর আমার মৃত্যুকালের ইচ্ছার কথা তোদের জানিয়ে যেতে হবে।

বৃদ্ধ থামলেন। স্বাহা আর লকু চুপ করে অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধ খোকার চিবুকে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন,

—জেগে থাকিস, ওরে জ্বলন্ত যজ্ঞাগ্নি, জাতির জীবনকে অগ্নিময় করবার জন্য যেন তুই জ্বলে উঠিস বৈশাখের বজ্রের মত—যেন বলতে পারিস

" ..মত্ত হাহারবে ..
উন্মাদিনী কাল বৈশাখীর নৃত্য হোক তবে…"

বৃদ্ধের গলাটা ধরে আসছে---বেশী কথা আর বলতে পারছেন না, তবু বললেন,

—যে জাতির সাহিত্য আছে, আছে যুগার্জ্জিত কৃষ্টিধারা আর অন্তরের অনির্ব্বাণ সৃষ্টিশক্তি, সে জাতি মরে না---মৃতকল্প হয়, আবার বাঁচে—তাই ভারত বারম্বার বেঁচে উঠেছে—ভয় নাই! স্মরণাতীত যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত কত কি ঘটলো, অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন—আত্মবিস্মৃতির অচল গুহায় কতবার নিমজ্জিত হয়ে গেল জাতি, কিন্তু আবার উঠলেন কে কোথায় যুগসাধক—বজ্রনির্ঘোষে জানালেন—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবমি যুগে যুগে" আমি আবার এসেছি তোদের স্মরণ করিয়ে দিতে—ওরে অমৃতের পুত্র—তোরা অমর। তোদের পিতৃ-পুরুষের মহত্তম আশীর্ব্বাদ তোদের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের মধ্যে অমৃতরূপে সঞ্চিত আছে—আহরণ কর– আবার বেঁচে উঠবি!

—কিন্তু এ বাঁচায় লাভ কি জ্যেঠামশাই?

"শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি, সরমের ডালি- -
নিশিদিন রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি..."

—আছে লাভ! ঐ কবিতার বহ্নিকে অন্তর দিয়ে অনুভব করবার জন্তই তোরা বেঁচে থাক্—তোরা সাধকের বংশধর...সশিধ হয়ে বেঁচে থাক্—তোদের জীবনের যজ্ঞশালায় যাজ্ঞসেনী জন্মাবে, যার অপমানের প্রতিশোধ কুরুক্ষেত্রকে সৃষ্টি করে—শ্রীভগবানকে আবির্ভূত করে—গীতামৃতসিন্ধু প্রবাহমান করে মৃত্যুর শ্মশানভূমিতে।...

বৃদ্ধ চুপ করলেন। জীর্ণ বক্ষ উত্তেজনায় দুলে দুলে উঠছিল—স্বাহা বুকে হাত বুলুতে লাগলো। উনি আস্তে আস্তে বললেন,

—আমার আর সময় নাই মা স্বাহা—মাথার কাছে এই পুঁথিদুখানি নিয়ে যাস, আর আমার দেহটাকে ঐ নদীর কূলে পুড়িয়ে দিস। আমার জীবনের অসমাপ্ত কাজ তোদের হাতে দিয়ে গেলাম। জাতিকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুপরিকল্পিত পন্থা আমার এই পুঁথিতে লিখে রেখেছি। যদি কোনো দিন যোগ্য কোনো সাধকের দেখা পাস তো তাঁকেই দিস এই পুঁথি।

—তাঁর যোগ্যতা কেমন করে যাচাই করবো বাবা?—স্বাহা বললো।

—তাঁর নিষ্ঠা তাঁকে প্রদীপ্ত সূর্য্যের জ্যোতি দান করবে মা—তাঁকে চিনবার জন্ত কোনো চিন্তা করতে হবে না।

সবাই চুপ করে রইল। রাণী এসে বললো,—আমার কাছে যে বালিশটা রেখেছো বাবা, সেটি কি করবো? দাদাবাবুকে দিব নাকি?

—না—ওটা ইতিহাস। আমাদের মুক্তিসাধনার ভুলভ্রান্তি আর অসাফল্যের কথাই আমি লিখে রেখেছি ওতে। আগামী যুগের সাহিত্যিকের জন্ত ওটা রেখে গেলাম—পথ আমাদের ভুল ছিল কিন্তু দেশপ্রেম আমাদের কিছু কম ছিল না। আজ যে স্বদেশ রক্ষার জন্ত মিত্রবাহিনী লক্ষ লক্ষ সৈনিককে মরণের মুখে এগিয়ে দিচ্ছেন, তাদের কারো চেয়ে কম ছিল না আমাদের দেশভক্তি—কিন্তু ওপথ ভারতের নয়। ভারত শান্তিমন্ত্রের উদ্গাতা—বিপ্লব আর ধ্বংস ভারত

কখনো সমর্থন করবে না। আমি জানিয়ে যাচ্ছি তোদের—এই যুদ্ধে যে বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরী হবে, তার থেকে জগতের সভ্যতাকে বাঁচাতে পারবে ভারতের শান্ত তপোবনের শান্তিমন্ত্র। সে মন্ত্র স্বেচ্ছায় ওরা নেবে না কিন্তু মহাকাল ঐ ধ্বংসের মধ্যেই প্রচার করবেন শান্তির মন্ত্র—সে মন্ত্র ভারতের ঋষির মহাবাণী—উপনিষদের মহাঋষির—"ওঁ য একোবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ

অবিবেকান্নিহিতার্থো দধাতি ॥

বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

উনি দেহত্যাগ করলেন। মাতৃমন্ত্রের উপাসক মুক্তি-সাধক এই বীর সন্তানের শব বহনের জন্য হয়তো বিরাট উৎসব হতে পারতো—জাতীয় জীবনে হয়তো স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতো সেই দিনটি কিন্তু কিছুই হোলো না। পরাধীন দেশের এক নগণ্য বিপ্লবী নাম-না জানা এক গ্রামের পাতার কুটীরে দেহত্যাগ করলেন—কেউ জানলো না, কেউ চীৎকার করে দেশ মাতৃকার সব সন্তানকে জানিয়ে দিলো না—"তোদের জ্যেষ্ঠ সহোদর নির্ব্বাণ লাভ করেছেন—যিনি তাঁর দেশভক্তিতে পৃথিবীর যে কোনো স্বদেশভক্ত বীর সৈনিকথেকে তিল মাত্র কম ছিলনা না—অগ্রজ হয়ে যিনি সহস্র দুঃখ বরণ করে তোদের শিখিয়ে গেলেন, কেমন করে মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রগামী হতে হয়! তাঁর পথ ভুল হতে পারে কিন্তু তাঁর ঐকান্তিকতা নিশ্চয়ই তোদের আদর্শ।"

কিন্তু থাক সে কথা। স্বাগা বড় বেশী কাঁদছিল। নকু বললো,—ছিঃ বৌদি, বীরের মৃত্যুতে শোক করতে নেই যে! তা ছাড়া উনি তো ওঁর কাজ সম্পূর্ণ করে গেলেন—মনে করো বৌদি, ওঁর শেষ আবৃত্তি করা কবিতাটি

"কর্ম্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করে গেনু দান
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে গেলাম ঘোষণা করে
মাতার আহ্বান !"...

স্বাহা আত্মসম্বরণ করতে পারছে না ! চির নির্য্যাতিত চিরদুঃখী পিতা তার জীবনের কোন এক বিস্মৃত দিনে—যেদিন যৌবন ছিল তাঁর এই শীর্ণ শরীরে দৃপ্ত গৌরবে সমুজ্জ্বল, সেইদিন ঘর ছেড়েছিলেন মানব-জীবনের সব ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে। দেশমাতৃকার আহ্বানকে অন্তরের অগ্নি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন; জীবনের যথাসর্ব্বস্বকে তিনি সেই আহিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ করে দিয়েছেন—আজ শেষের দিনে সেই চির যোদ্ধা সৈনিকশ্রেষ্ঠ পিতা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে অসহায়ের মত মৃত্যু বরণ করলেন। স্বাহা সান্ত্বনার কোনো অবলম্বন পাচ্ছে না—কিন্তু লোকাধীশ আবার বললো—এমনি হয় বৌদি, পৃথিবীর যাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তান, মাতা ধরিত্রী তাঁদের এমনি করেই লালন করেন। এরই মধ্যে ওঁর বাণী ভুলে যেও না বৌদি—"হবে হবে হবে জয়, হে দেবি করি না ভয়, হবো মোরা জয়ী"...

দুঃখের এই তিমির রাত্রি শেষে আমরা নিশ্চয় গাইবো আমাদের জাতীয় মহাকবির গান,

"বিজয় গর্জন-স্বনে অভ্র ভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গল নির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্ম্মল
কঠিন সন্তোষ !

আর সেই গান হবে আমাদের

"শুধু তাহা সম্ভ্রমাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।"

আজ কান্নার দিন নয় বৌদি—ওঠো, চলো :—

"পদ্মাসনে বসো আসি রক্তনেত্র ধূলির ললাটে
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর
সুখ দুঃখ আশাও নৈরাশ……
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধুলাসম উড়ুক গগনে,
ভরে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ সনে,
আকুল আকাশ।
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরামৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা লক্ষকোটি নরনারী হিয়া—
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন তন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে……"

স্বাহা উঠে দাঁড়ালো। বাবার শেষ কাজ ওকেই করতে হবে। রাণী খানিকটা দূরে বসে কাঁদছিল; লোকাধীশ শুধুলো—শশ্মানে যেতে এ গাঁয়ে আর কি লোক মিলবে না রাণী?

—সবাই তো পালাইয়ে গেল দাদাবাবু—কে জানে কেউ যদি থাকে ভদ্দলুক!

লোকাধীশ আর কথা না বাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে খুঁজতে বেরুলো। সন্ধ্যা হয় হয়—কিন্তু এখনো দিনের আলোর আভা রয়েছে—পথ চিনে যেতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু কৈ? সব বাড়ীগুলোই ফাঁকা—সবাই পালিয়েছে! কোথায় পালাবে ওরা? কোথায় গিয়ে এই মহামন্বন্তরের মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে! মৃত্যুকে ওদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ মৃত্যু ঠিক ডাল কুত্তার মতন—লেলিয়ে দিলে তার পিছন ছাড়ে না! বাংলাদেশের লোকগুলোর উপর মৃত্যুরূপী সারমেয়কে লেলিয়ে দিয়েছে ওরা—ঐ যারা জীবনের আনন্দে চঞ্চল প্রজাপতির রূপ ধারণ করছে—আর মাঝে মাঝে এদের

দিকে তাকিয়ে সভ্যতার মেকী নিশ্বাস ছাড়ছে—"আহারে! ওদের বাঁচাবো আমরা—লঙ্গরখানা খুলে বাঁচাবো —ওরা না বাঁচলে আমাদের এই প্রজাপতির পাখনা সাজাবে কে?

আরো এগিয়ে চললো লোকাধীশ—পূর্ব্ব পাড়ার শেষ প্রান্তে চলে এলো—এর পর একটা বড় তালপুকুর, তারপর মাঠ—ঐ মাঠেই হাওয়াই-জাহাজের অস্থায়ী আবাস—এর উত্তর দিকে নদীটা বয়ে গেছে। লোকাধীশ এতখানা রাস্তা হেঁটেও একটা লোক দেখতে পেলো না—পালিয়েছে সবাই—প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কোথায় গিয়ে ওরা বাঁচবে! বাঁচবে না। তার চেয়ে সাতপুরুষের ভিটেতে পড়ে মরে থাকলেই ভাল হোতো। লোকাধীশ তার নিজের গাঁয়ের পলাতক লোকগুলোকে সেই কথা বলে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু এ গাঁয়ে কেউ হয়তো সে রকম কথা বলে নি। নিরাশ হয়ে লোকাধীশ ফিরছে—যাহার সাহায্যেই মৃতদেহ শশানে নিয়ে যাবে কিন্তু দেখতে পেলে একখানা মোটর গাড়ী আসছে এই দিকে—চমৎকার মোটরটা। তার মধ্যে দু'তিনজন লোক—ওদের একটি মেয়ে—তার জরি দেওয়া শাড়ীর আঁচলটা বাতাসে কাঁপছে—দেখলো লোকাধীশ! কে ওরা? এমন অসময়ে গ্রামের দিকে আসছে কেন! চিন্তিত, বিস্মিত লোকাধীশ দাঁড়িয়ে গেলো।

গাড়ীখানা এসে পড়লো—লোকাধীশকে ছাড়িয়ে চলে গেল গ্রামের মধ্যেই। কে ওরা? লোকাধীশ দ্রুতপদে গাড়ীর পথরেখা ধরে চলতে লাগলো! যে দিকে গাড়ীটা গেল—লোকাধীশ সেদিকটায় খোঁজ করেনি—তাই সে গেল ঐ দিকে। পুরোনো একখানা দোতালা বাড়ী—তার সামনেটা চুণকাম করা হয়েছে—চার পাঁচটা নূতন চেয়ার সাজানো রয়েছে আর সেই চেয়ারে বসলো গিয়ে এই নবাগত মোটর আরোহীরা। দু'জন পুরুষ আর একটি মেয়ে! চমৎকার মেয়েটি। বাড়ীর অধিকারী যোড়হাত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন—লোকাধীশ তখনো দূরে, ওদের কথা শুনতে পেলো না।

ওখানে কিন্তু আরো কয়েকজন লোক রয়েছে—ওদের কাছে শব সৎকারের কথাটা বললে, দু'একজন আসতে পারে, ভেবে লোকাধীশ এগিয়ে এলো। দেখেই চিনতে পারলো—বাড়ীখানি এই গাঁয়ের মাতব্বর তালুকদার মহাশয়ের এবং সশরীরে তিনিই উপস্থিত রয়েছেন এঁদের কাছে। লোকাধীশ এসে এক কোণায় দাঁড়ালো, বললো,

—পাল মশাই, জ্যেঠা মশাই মারা গেলেন...দু'একজন লোক যদি দেন তো শ্মশানে নিয়ে যেতে পারি......

—মারা গেলেন! কখন?—বলে পাল মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আবার বললেন,

—কি হয়েছিল? জ্বর? কৈ কিছু জানতে পারিনি তো! ইস, বড্ড দুঃখের কথা!

—হ্যাঁ, কিন্তু শেষ কাজটা শেষ করে যেতে চাই .....লোক দু'একজন কি পাওয়া যাবে?

—লোক! ভারী মুস্কিলে ফেললেন, দেখছি! আমার তো নড়বার উপায় নাই—এঁরা সব কলকাতা থেকে এসেছেন . ..তাছাড়া এই গাঁয়ে যে-কজন এখন আছে তারা আবার.. ...থেমে গেলেন পাল মশাই!

—তাঁদের দু'একজন যদি আসেন—লোকাধীশ বললো। কিন্তু ঐ দু'একজনের একজন বললো—আমরা যেতে পারতাম কিন্তু ওঁর তো এখন আর জাতি নেই—ধোপার জল-ভাত খেয়ে উনি আর ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

—ওঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন না!—লোকাধীশ বিস্ময়ের শব্দে বললো—কিন্তু উনি এখন মৃত। মৃতদেহের জাতের বিচার নাই করলেন......জীবনে উনি দেশের জন্য .....

—তা কি হয় মশাই! ধোপার বাড়ীর রান্না যিনি খেয়েছেন তাঁকে দাহ করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। গাঁয়ে তো সমাজ বেঁধে আবার বাস করতে হবে!

—ও! আচ্ছা! লোকাধীশ আর কোনো কথা না বলে ফিরবার জন্য পা বাড়াল। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে, দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

লোকাধীশ প্রায় দশ পনর হাত চলে এসেছে, হঠাৎ নারী-কণ্ঠের আহ্বান এল—শুনুন—দাঁড়ান একটু!

লোকাধীশ নিজের মনে বলছে—

"দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে..."

হ্যাঁ, সত্যি!—মেয়েটি লকুর কাছে এসে দাঁড়ালো......কে মারা গেছেন বললেন?

—আমার একজন বৃদ্ধ আত্মীয় এই গ্রামে থাকতেন—একজন ধোপার মেয়ে তার সেবা করতো—এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তিনি আজ দেহত্যাগ করলেন।

লোকাধীশ চলে আসছে, কিন্তু মেয়েটি বললো—আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?

—আপনি! ধন্যবাদ—কিন্তু আপনারাই তো সাহায্য করেছেন কয়েক মাস থেকে—আমাদেরকে মৃত্যু-পথের পরিব্রাজক করবার জন্য আপনারাই তো দেশের চালগুলো কিনে গুদামজাত করলেন—জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি

দেবার জন্ত এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করলেন—আরো কি সাহায্য করতে চান? লঙ্গর খানা খুলবেন নাকি?—ওতে আরো তাড়াতাড়ি লোক মরে।

মেয়েটি বিহ্বল হয়ে লকুর কথা শুনছিল--লকু চলে আসছে, সে হঠাৎ বললো,—আমি জানি—জানি আমি, এই মৃত্যুর জন্ত কারা দায়ী! কিন্তু মৃত্যুর ওপারে যিনি চলে গেলেন, তাঁর আত্মার কাছে এই পাপীদের জন্ত ক্ষমা চাইবো।

—ক্ষমা চাইবেন!—লকুর কণ্ঠে তীক্ষ বিদ্রূপ—একি ক্ষমা চাইবার মত অপরাধ! এ অপরাধে অপরাধীদের ফাঁসী হওয়া উচিৎ; কিন্তু ক্ষমা চাইবার কিছু দরকার নেই—ওরা কেউ অভিশাপ দেবে না। মহাকবি আমাদের শুনিয়ে গেছেন অনেক আগেই,

"শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে···
নাহি জানে, কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে;—
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘ শ্বাসে
মরে সে নীরবে।....."

—ওরা অভিযোগ করবে না—বলে লকু ত্বরিত বেগে চলে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটি চীৎকার করে আবৃত্তি করলো—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত—সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখুনি সে পলাইবে ধেয়ে······"

কিন্তু লকু ততক্ষণ দৃষ্টির বার হয়ে গেছে। মেয়েটি ফিরে এসে বললো,

—আমি যাচ্ছি ঐ লোকটির সঙ্গে।

—কোথা যাবি তুই!—আশ্চর্য্য হয়ে বললেন সাহেববেশী বাঙালী ভদ্রলোকটি।

—ঐ যে যিনি মারা গেছেন, তাঁর সংকারে সাহায্য করতে—বলেই সে এসে মোটরে উঠে বসলো।

—চালাও ভজন সিং। ঐ বাবুর পিছু পিছু চলো!

গ্রাম পথ বেয়ে গাড়ী চলতে লাগলো—আর সাহেব বেশী বাঙালীটি ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গাড়ীর পিছনে। গাড়ীখানা দৃষ্টির বাইরে গেলে বললেন,—কে ঐ লোকটা? কে মরেছে? কতদূর বাড়ী ওদের?

—ওর দাদর শ্বশুর, ওর বাবার বন্ধু, তাই জ্যেঠা মশাই বলে। বুড়োটা গাঁয়ের ও-পাড়ায় একটা বোরেগীর আখড়ার মতন করে থাকতো। ধোপার মেয়ের রান্না খেতে—জার জন্ম পর কিছু ছিল না স্যার।

—তা না থাক্! এ গাঁয়ের কে ছিল সে?

—কেউ না! সে স্বদেশী আন্দোলনের আসামী। আন্দামান ফেরৎ—বজ্জাতের ধাড়ী, গাঁয়ের ছোটলোকগুলোকে খুব হাত করেছিল ক'দিনে! এই যুদ্ধ লাগাতেই—জানেন স্যার, বেশিবেশি মজুরী কবুল করে অনেক কষ্টেও আমি তাদের আনতে পারিনি আপনার কাজে! তারপর চাল যখন আর কোথাও পাওয়া গেল না, তখন দায়ে পড়ে ব্যাটারা গাঁ ছেড়ে পালালো—মরলো তবু শূয়ারগুলো ওরই কথা শুনতো।

—পুলিশে খবর দেন নি কেন?

—ও স্যার, জেল ফেরৎ শতয়ান! পুলিশকে ও থোড়াই কেয়ার করতো। ব্যাটা মরেছে, জ্বালা গেছে! ও আবার গাঁয়ের মুচি মেথরদের লেখাপড়া শেখবার জন্যে টোল খুলে ছিল—জানেন স্যার—ঐ ধোপার মেয়েটাকে নিয়ে বুড়োবয়সে ব্যাটা কি কাণ্ড যে করছিল গাঁয়ে বসে......

তালুকদার বাকি সব কথাগুলো উহ্য রাখলো। সাহেবী বাঙালী নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন তার কথা। বললেন,

—চলুন দেখি গিয়ে। মেয়েটা আবার গেল! কতদূরে বাড়ীটা?

—এই তো সার কাছেই—বলে তালুকদারই এগিয়ে রাস্তা দেখাতে লগলো।

সাহেবী বাঙালী এবং অন্য ছোট সাহেবটি পিছনে হাঁটতে লাগলো।

লোকাধীশের উপর তালুকদারের রাগটা উগ্রতর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ!

ভারতের একান্ন মহাপাঠে একান্নটা ধর্ম্মমণ্ডল গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক মণ্ডলেই একজন করে আচার্য্য আছেন। তাঁদের কাজ—ভরতের প্রাচীন বীরধর্ম্ম প্রচার করা—যে ধর্ম্ম ভারতকে বহু বহু যুগ ধরে স্বাধীনতার শক্তিতে ধারণ করে রেখেছিল, আর যে ধর্ম্মের পতনেই ভারতের পতন—ভারতের পরাধীনতা, ভারতের দাসজাতিতে পরিণত হওয়া! এই ধর্ম্মমণ্ডল বিশ্বাস করেন—ধর্ম্মকে রক্ষা করতে না পারার জন্যই—ধর্ম্মের নামে গুরু পুরোহিতের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই—গণ-গত ধর্ম্মকে ব্যষ্টি-গত স্বার্থে নিযোগ করার জন্যই ভারতের এই দুর্দ্দশা। এই মহাপাপ আরম্ভ হয়েছে বুদ্ধের আবির্ভাবেরও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর থেকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম মিশ্রিত হয়ে যায় ভারতের মহাধর্ম্মে।

ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্মের মিলনে সেদিন যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হোলো, তার ভিত্তি-হোলো নেহাৎ কাঁচা—কারণ ভীমার্জ্জুনের স্বর্গারোহণের পর সত্যিকার বীর বলতে আর কেউ রইল না ভারতে। পরীক্ষিত হলো একটা দাম্ভিক রাজা আর তার ছেলে জন্মেজয় ভীরু গল্পখোর খোকাবাবু। এর পর ভারতের চন্দ্রবংশ আর সূর্য্যবংশ কোথায় যে গেল তলিয়ে তার আর হদিস রইল না। ওদিকে

পাপ ঢুকেছে সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে—সে পাপ আগুনের মত ব্যাপ্ত হতে হতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে হাজার খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি হোলো—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আক্রোশ জেগে উঠলো। আর সেই সুযোগে চলতে লাগলো বিদেশী দস্যুদের আক্রমণ। বীর ধর্ম্ম গেলো রসাতলে—তার স্থান অধিকার করলো কূটকৌশল। তার পূর্ণ পরিণতি চাণক্যের রাজনীতিতে চন্দ্রগুপ্তের সম্রাজ্যে। রাজনীতি যে এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে—পৃথিবীর কোনো দেশ বোধ হয় তারা আগে জানতো না। চন্দ্রগুপ্ত একছত্রাধিপতি হলেন এই নীতির বলে কিন্তু পরবর্ত্তী সম্রাটদের মধ্যে সে নীতি দুর্নীতি নিয়ে এল। তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের চললো রেষারেষি—কাজেই ধর্ম্ম আর রইল না—শুধু রেষারেষিটুকুই রয়ে গেল। অশোক পর্য্যন্ত আগের প্রভাবে কোনোরকমে কেটে গেল কিন্তু তারপর যাঁরা এলেন তাঁরা আরম্ভ করলেন—"মারি অরি পারি যে কৌশলে!" কিন্তু অরিদেরও কৌশল আছে এবং অধর্ম্মের ফলে আত্মবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয়ে অনৈক্যে দুর্ব্বল ভারত দিনে দিনে বলহীন হতে লাগলো। বহু শতাব্দীর সেই পুরাতন পাপ সুলতান মামুদ আর মহম্মদ ঘোরীর হাতে সমর্পণ করে দিল ভারতের স্বাধীনতা—ক্রীতদাস হয়ে গেলো ভারত।

কিন্তু এতো সব ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি আর বিশ্লেষণের কিইবা প্রয়োজন? ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা পৃথিবীর যেকোনো দেশের তুলনায় হীনতম—দীনতম। প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি ভারত আজ বিদেশে অসভ্য অন্ত্যজ দেশ বলে ঘোষিত হয়—তাও আবার ভারতেরই অর্থে! আজ ভারত নিজের পুত্রকন্যার জন্য একমুষ্টি অন্নের যোগাড় করতে না পেরে কাঁদে। যে ভারতের রাজর্ষি জনক স্বহস্তে হল চালনা করে ধান্য-লক্ষ্মী সীতাকে লাভ করেছিলেন! যে ভারত বস্ত্রশিল্পে জগদ্বিখ্যাত, যে ভারতের রাজশক্তিও দ্রৌপদিকে বিবস্ত্রা করতে সমর্থ হয়নি, যে ভারতের শাড়ীর নাম মুখস্থ করতে শ্রুতিধর ছাত্রের সপ্তাহাধিক সময় লাগতো, সেই ভারত অর্দ্ধোলঙ্গ—তাহোক, তবু ভারত বেঁচে আছে—বেঁচে

আছে তার পবিত্রতম ধর্ম্মের আশ্রয়েই। যে ধর্ম্ম জগৎকে শান্তির বাণী শুনিয়েছে, যে ধর্ম্ম জগৎকে ক্ষমা, মৈত্রী, ত্যাগ, তপস্যায় দীক্ষিত করেছে, যে ধর্ম্ম মৃত্যুকে জয় করে অমৃতের গান গেয়েছে—আজো সেই ভারত বেঁচে আছে। যখন বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মারণাস্ত্র আবিষ্কারেই মানবজীবনের চরম সাফল্য বলে মনে করে—রক্ষক রাজশক্তির পরিমাপ হয় যখন তার ধ্বংস-শক্তির বিরাটত্বের পরিমাণে—জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয় যখন বর্ণগত আর বাণিজ্যগত বিভিন্নতার বিদ্বেষে, তখনো ভারত বেঁচে আছে। মুমূর্ষু হয়েছে, কিন্তু মরবে না। সে অমৃতের পুত্র, সে জানে, বিশ্বের ধ্বংস-শক্তিকে অতিক্রম করে উচ্ছিন্ন করে, উপেক্ষা করে, তার অভীঃমন্ত্র উচ্চারিত হয়,—শান্তম শিবম্ সুন্দরম্—ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে তার গান বাজে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—রসো বৈ সঃ।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের চিন্তার গতি ভিন্নপথ ধরলো—ভারত তার বিশাল ধর্ম্মরাজ্যে যতই বড় হোক, বর্ত্তমানের বাস্তবজগতে সে দাঁড়াবে কোথায়? কে তার শান্তির বাণী শুনতে আসবে? এইতো বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর পথ আকীর্ণ করে তুলছে, নিত্য নূতন পন্থায় মৃত্যুর দ্বার উদ্ঘাটিত হচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিনিচয় নিত্য নব নব নীতি ঘোষণা করছে—মানুষের জগতে দানবের প্রলয়ঙ্কর অভিযান আরম্ভ হয়েছে—পৃথিবী হয়তো শ্মশান হয়ে যাবে—তখন কে শুনবে ভারতের সেই শান্তির বাণী! ক্ষমা মৈত্রীর গান—আত্মার অবিনশ্বরত্বের মহিমা!

কিন্তু শুনবে, শুনতে ওরা বাধ্য হবে। বিশ্ব যখন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এগিয়ে যাবে, তখনি ফিরবে মানুষের চেতনা। তখনি মানুষ বুঝবে, সে পৃথিবীর অন্য জীব হ'তে পৃথক—সে জীবশ্রেষ্ঠ—ধ্বংসের জৈব-প্রবৃত্তিই তার ধর্ম্ম নয়—সৃষ্টির শান্তি-মন্ত্রের সে উদ্গাতা। ভারতের ঋষিরা সেই কথাই শুনিয়েছেন; সেই শান্তি মন্ত্রের উপাসনাই করেছেন তাঁরা। তাই তাঁদের যুদ্ধে বীরের নীতি আর ধর্ম্মের নীতি অনুসৃত হোত—তাই তাঁদের আবিষ্কৃত বজ্র, পাশুপত,

ইত্যাদি ব্রহ্মাস্ত্র অক্ষম দুর্ব্বলের উপর নিক্ষিপ্ত হোতো না—যুদ্ধ্যমান ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই ছিল অবধ্য তাঁদের কাছে। শান্তির পূজারী সেই ঋষিরা বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—যুদ্ধ শুধু স্বদেশের ধর্ম্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই; স্ত্রীগণের পবিত্রতা আর শিশুর নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ। অনার্য্য রাবণের হাতে যেদিন আর্য্যের সীতা লাঞ্ছিত হোলো, যুদ্ধ বাধলো সেইদিন—সেই আদর্শ যুদ্ধের কথা এবং যুদ্ধের আদর্শের কথা মানুষ আজ ভুলে গেছে। এখন সংস্কার-সংস্কৃতি সতীত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ হয় না—যুদ্ধ হয় এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য—সে প্রভুত্ব শুধু রাজনৈতিক। এই রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্পৃহার অবসান যতদিন না ঘটাবে ততদিন পৃথিবীতে শান্তির বার্তা প্রচার আকাশ কুসুম মাত্র।

কিন্তু এই প্রভুত্ব স্পৃহার অবসান একদিন ঘটবেই। কোনো রাজশক্তি অত্যদ্ভুত মারণাস্ত্র আবিষ্কার করে হয়তো সারা পৃথিবীতে একাধিপত্য করবে—; তখন তার রণকণ্ডূয়ন নিবৃত্তির আর কোন পথ খোলা থাকবে না—কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না—সে তখন শান্তির মন্ত্র শুনতে আগ্রহান্বিত হবে;—কিম্বা হয়তো অত্যাশ্চর্য্য কোনো মারণাস্ত্রের আবিষ্কার এবং তার প্রতিরোধের জন্য অধিকতর শক্তিশালী মারণাস্ত্র প্রয়োগ করতে করতে পৃথিবী একদিন মানবশূন্য হয়ে যাবে—তার পর আবার আসবে নব সৃষ্টির প্রয়োজন। অথবা মানুষ তার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার চরমতম সৃজনী-শক্তিতে এমন কিছু আবিষ্কার করবে, যখন সে আর মরবে না—শুধু দেহ পাল্টে আবার তার পূর্ব্ব সংস্কার-সংস্কৃতির ধারা ধরে চলতে থাকবে; হয়তো সেই ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ হবে অতিমানব—তারই প্রয়োজনে মানবশক্তি আজ ভবিষ্যতের পথ বেয়ে চলেছে মৃত্যুর মধ্যে, পূর্ণ জীবনের পূর্ণতম প্রতিভার আবিষ্কারে।

ইন্দ্রজিৎ এতটা সময় অকারণে চিন্তা করে কাটালো, অথচ ওর কয়েকটা জরুরী কাজ করবার রয়েছে। নিজের উপর বিরক্ত হয়ে বললো,

—দূর ছাই! এসব ভেবে লাভ কি! কত যুগ যুগান্তরের সংস্কার-সংস্কৃতির

বাহক আমরা—যদি বেঁচে থাকি তবে সেই শান্তির বাণীও বহন করে চলবো। সে বাণী সত্য বাণী। সহস্র আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ, ধ্বংস-সঙ্ঘাত অবহেলাকে অগ্রাহ্য করেও সে বাণী এখনো জাগরুক—এর নিশ্চয় কোনো মহান সার্থকতা আছে—কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে বিশ্ব বিধাতার,—যার জন্য ভারতের সব গিয়েও কিছু যায় নি—সর্ব্বরকমে পরাজিত, বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত হয়েও ভারত আজও তার স্বধর্ম্মে, তার সংস্কার-সংস্কৃতিতে অপরাজেয়। তার বৈশিষ্ট্য এখনো

ইন্দ্রজিৎ ভাবতে ভাবতে পথে চলতে লাগলো—ভারত সনাতনপন্থী, চিররক্ষণশীল। রক্ষণশীলতার অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তার মস্ত বড় গুণ এই যে আপনার সংস্কার ছাড়তে সে কিছুতেই পারে না। জাতীয় ঐতিহ্য তাই রক্ষণশীলদের মধ্যে এমন সুদৃঢ়ভাবে বেঁচে থাকে যুগ যুগান্তর ধরে—নইলে হয়তো ভারতের সব সাংস্কৃতিক গৌরব আজ তাতার-তুরক্ শক-হুন-গ্রীস-পারস্য ইরান-তুরাণের সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতো! ভারতের ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে এই রক্ষণশীলতার প্রয়োজন আছে—তাই এমন শক্ত পোক্ত করে বেঁধে দিয়ে গেছেন সনাতন সেই সদ্ধর্ম্মকে।

কিন্তু এই রক্ষণশীলতাও ভাঙবার চেষ্টা চলছে—গুরুদেব এই ভাঙনকেই ভয় করছেন। তিনি বারম্বার বলছেন—ভারত যেন এইখানে অপরাজেয় থাকে, তাহলেই সে অজেয় থাকবে—কিন্তু ওপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না। ভারতের সংস্কৃতি নষ্ট করবার কাজে বৈদেশিক শিক্ষা, বৈদেশিক ভাবের অনুপ্রেরণা দিয়ে দিনকতক বেশ জোরালো ভাবেই ভাঙনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ভারত সামলে গেলো উনবিংশ শতাব্দিতেই; তারপর সুরু হোলো বৈদেশিক বিলাস-স্রোতের তীব্র প্রবাহ—ভারত এখন সে স্রোতেরও প্রতিরোধ করতে শিখেছে। অতঃপর ভেদনীতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মগত বিভাগ, "হরিজন" নামক এক নূতন এবং অর্থহীন কথার আমদানী—সনাতন পদ্ধতিকে ভেঙে কতকগুলো অসার উপদেশাত্মক কথার বুকনি দিয়ে কয়েকজন ভারতীয়

ভারতের আর্য্যধর্ম্মে ভাঙন ধরাতে আরম্ভ করেছে—তাদের যুক্তি শুধু এই যে "যুগোপযোগী হতে হবে।" কিন্তু যুগ শব্দ চিরদিন আপেক্ষিক এবং যে-কোনো দেশ তার প্রাচীন সংস্কার আশ্রয় করে সব যুগেই যুগোপযোগী হয়ে থাকে। ভারতেরই কয়েজন ব্যক্তি আবিষ্কার করলেন ঐ 'হরিজন' কথাটা। অমনি ভারত সরকার ঐ কথায় সুবিধাটুকু গ্রহণ করলেন—জাতিকে বিভক্ত করে "সিডিউল-কাষ্ট" মার্কা করে দিলেন—ধর্ম্মগত ভাবে রাজনৈতিক বিভেদের সৃষ্টি হোলো—এমনি হাজার ব্যাপারে বিভেদ-বিচ্ছেদ চলেছে—তবু এখনো আসমুদ্র হিমাচল সেই এক হিন্দুধর্ম্মে আবদ্ধ; এই আবদ্ধতার শক্তি সহস্রগুণে বাড়াতে হবে; প্রাত্যক ভারতবাসীর কাণে কাণে দীক্ষামন্ত্রের মত জানিয়ে আসতে হবে—তুমি ভারতীয়, তোমার সংস্কার সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সেই স্বাতন্ত্র্য ছাড়লে তোমার আত্মার অপমৃত্যু হবে। তোমার দেশ পরাধীন কিন্তু তুমি তোমার সদ্ধর্ম্মে অজেয় হয়ে আছো; এই শেষ অবলম্বনটুকু রক্ষা করে তুমি তোমার ঋষি পিতৃপুরুষগণের পরিতৃপ্তি বিধান করো। বিশ্বে তুমি বিশ্বজিৎ হয়ে থাকবে।

পশ্চিম আকাশে কুণ্ডলায়িত মেঘ দেখে ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারলো ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা—এ সময় আশ্রমের বাইরে আসা বিপজ্জনক, কিন্তু গুরুদেবের আহ্বান—ইন্দ্রজিতকে যেতেই হবে। নদীর কিনারা ধরে ইন্দ্রজিৎ চলতে লাগলো। অনেক দূর তাকে যেতে হবে, প্রায় আট দশ মাইল।

ভারতে একাত্ম মহাপীঠের অন্তর্গত এই পীঠস্থানে ইন্দ্রজিতৎ তার ধর্ম্ম-সংঘের একটি আশ্রম স্থাপন করেছে মাত্র তিন মাস আগে। কাজকর্ম্ম এখনো ভাল রকম ভাবে চালাতে পারছে না· কারণ, এদেশের লোকগুলি সব অশিক্ষিত কৃষিজীবী—তরাপর এই মন্বন্তরের করাল বিভীষিকায় সকলেই

দিশেহারা। ধর্ম্মপ্রাণ কৃষক আজ উদরপ্রাণ জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ ভেবে পাচ্ছে না—গুরুদেবের আদেশ কেমন করে কার্য্যে পরিণত করবে—কি ভাবে এই মরণোন্মুখ মানুষদের মধ্যে ধর্ম্মবোধ জাগ্রত রাখবে!

প্রতি অমাবস্যায় বিহারীনাথ পাহাড়ের বনভূমিতে গভীর রাত্রে গুরুদেব সকলকে দর্শন দেন—আজ অমাবস্যা। ইন্দ্রজিৎ তাই যাচ্ছে সেখানে। নদীর এপারে যাচ্ছে সে, কিন্তু গুরুদেবের কাছে যেতে হলে নদী পেরুতে হবে—শুকনো নদী নয় আজ—গৈরিক স্রোতের আবর্ত্তে নদী এখন ভয়ঙ্করী। এসব নদীতে বারমাস জল থাকে না বলে নৌকাও থাকে না। তাছাড়া এ বেলা বান আসে, ওবেলা বুক জল হয়ে যায়, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ চেয়ে দেখলো, আজ নদীতে বান এসেছে এবং আকাশের যে রকম অবস্থা তাতে বৃষ্টিও হবে—ত-হলে বান আরো বাড়বে—কিন্তু তার পূর্ব্বেই ইন্দ্রজিৎ পার হয়ে যাবে নদীটা।

যতদূর সম্ভব দ্রুত হাঁটছে ইন্দ্রজিৎ, কিন্তু হাঁটা যায় না—রাস্তা তো নাই, তার উপর শরঝোপ আর কাশ ফুলের গাছ—তার ভেতরে ভেতরে লতাবিছুটির সর্পিল ভ্রূকুটি আর লজ্জাবতী লতার নিঠুর কাঁটা ইন্দ্রজিতকে অস্থির করে তুলছে। বালিতে পা' ডুবে যাচ্ছে—জোরে হাঁটা অসম্ভব এ পথে। ইন্দ্রজিৎ ঠিক করলো—নদী কিনার থেকে আরো খানিকটা তফাতে গিয়ে শুকনো মাঠ ধরে সে হাঁটবে, তাহলে হয়তো দ্রুত যেতে পারবে—মনের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করতে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ দেখতে পেলো, খানিকটা দূরে কাঁচা সড়ক—তার উপর চার পাঁচ খানা গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে চলেছে—শব্দ হচ্ছে গাড়ীর চাকার—ক্যাঁচ, ক্যাঁচ-কোঁ-ও-ও-ও! গাড়ীতে কি আছে জানবার কোনো আগ্রহই ইন্দ্রজিতের হোতো না কিন্তু সে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো—সব-পিছনের গাড়ীর পিছনে একটা লোক [illegible], মাঝে মাঝে সরু বাঁশের লাঠি দিয়ে গাড়ীর উপরে[illegible]বস্তায় খোঁচা দিচ্ছে [illegible] ঝিরঝির করে পড়ছে কি যেন—লোকটা সন্তর্পণে [illegible] গুলি কাপ[illegible] ধরে নিচ্ছে। কি ও? চাল নাকি!

ইন্দ্রজিতের সন্দেহ হোলো—গাড়োনগুলোকে ফাঁকি দিয়ে লোকটা চাল বের করে নিচ্ছে নিশ্চয় !

তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ অকস্মাৎ লোকটাকে আক্রমণ করলো। রোগা-দুর্ব্বল লোকটা চাল সংগ্রহেই ব্যস্ত ছিল—ইন্দ্রজিতকে দেখে নি—হঠাৎ আক্রান্ত হোয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। ইন্দ্রজিৎ তার হাতখানা ধরে বললো, —কি বার করলি—দেখি ?

ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল লোকটা। দুর্ব্বল হাতের আঙুল তার শিথিল হয়ে গেলো—কাপড়ের খুঁট আলগা হতেই চালগুলি রাস্তায় পড়ে গেলো ঝরঝর করে—লোকটা হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে গেলো !

কিন্তু আগের গাড়ীর গাড়োয়ানরা গাড়ী থামিয়েছে ব্যাপার কি জানবার জন্য। সব আগের গাড়ী থেকে একজন বাবু এসে ব্যাপারটা মুহূর্ত্তে বুঝে ফেললো—চীৎকার করে বললো,—চাল চুরি করেছিলি হারাজাদা !—বলেই চটাস করে একটা চড় মারলো লোকটার গালে, তারপর তার ঘাড়টা ধরে ঠেলে দিলো। লোকটা অনশন-ক্লিষ্ট—অত্যন্ত দুর্ব্বল, দেখলেই বোঝা যায়—ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লো গিয়ে রাস্তার পাশে একটা বনকুলের ঝোপে—গাড়ীর বাবুটি তখনো গাল দিচ্ছে—শুয়ারের বাচ্চা !

ইন্দ্রজিতের অসহ্য বোধ হোলো এই অবিচার। গর্জ্জন করে বললো,—কে শুয়ারের বাচ্চা ? ও না আপনি ? এই মড়কের দিনে অনাহারী লোকটাকে আপনি ঐ ভাবে ঠেলে দিলেন ! লজ্জা করে না আপনার ?

ইন্দ্রজিৎ ছুটে গিয়ে তুললো ওকে কাঁটাঝোপ থেকে, তারপর গাড়ীর বাবুকে বললো—কোথায় নিয়ে যাবেন এই চাল—বলুন ? দেশের লোকের মুখের খাদ্য কেড়ে নিয়ে আপনার কোন বাবার মুখে তুলে দিতে যাচ্ছেন—জানতে পারি কি ?

সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। ইন্দ্রজিতের হা[illegible]র লাঠি আর [illegible]টাও বেশ লম্বা-চওড়া ওর। গাড়ীর ভদ্রলোকটি [illegible] সঙ্গে

চার-পাঁচটা গাড়োয়ান রয়েছে, কাজেই নিজেকে যথাসাধ্য দৃঢ় করে বললো—

—ও ব্যাটা চুরি কেন করছিল মশাই ? চাইলেই তো দিতাম একমুঠো !

—দিতেন ! খুবই দেন বুঝি আপনি ! তাই ওদের খেতে না দিয়ে চাল গুলো বিক্রী করতে নিয়ে যাচ্ছেন ঐ কারখানায়—কেমন ?—ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বর বিদ্রূপ মেশানো ধমক ! লোকটি আম্‌তা আম্‌তা করে বললো, —বিক্রী না করলে চলবে কেন ? বলুন চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা দর তো আর পাওয়া যাবে না ?

ইন্দ্রজিৎ লোকটার নির্লজ্জতা দেখে আর কিছু বলতে চাইল না—ব'লে কিছু লাভও নেই। তাই শুধু বললো—কিন্তু আপনি ওকে খুন করে ফেলতেন ! ওর অপরাধ, ওরই জাত-ভাইরা যে ধান চাষ করে আপনাদের গোলায় তুলে দিয়েছে, আজ খেতে না পেয়ে ও তারই চাট্টি না-বলে নিচ্ছিলো—

—নিক না, আমি দিচ্ছি ওকে সেরখানেক—ভদ্রলোকটি কথা বলতে বলতে বস্তা খুলে দু' তিন আঁচলা চাল দিল সেই রোগা লোকটাকে। ইন্দ্রজিতের হাসি পাচ্ছে ওর ভীরুতা দেখে—হেসেই বললো,

—আপনার বাড়ী কোথায় মশাই ? নাম কি আপনার ?

—নাম ? কেন বলুন তো !

—অপনার মতন দাতাকর্ণের বাড়ীতে কোনো একদিন অতিথি হতে পারি।

—তা যাবেন, যাবেন। আমাদের জমিদার বাবু সুবোধ চাটুজ্যে, ঐ যে গ্রামটা নদীর ওপারে—ঐ যে দেখছেন চিলে কোঠা দেখা যায়—ঐ তাঁর বাড়ী, যাবেন একদিন।

ইন্দ্রজিৎ একবার দেখে নিল চিলে কোঠাখানা, তারপর নদীর কিনারা ধরেই চলতে লাগলো। অনেকখানা গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখলো, গা[illegible] দূরে চলে গে[illegible] [illegible] সেই দুর্ব্বল লোকটা মাটিতে পড়ে-যাওয়া চাল গুড়ি[illegible] টে[illegible] চি[illegible] আহা, চাল ! সোনার চেয়ে যার দাম বেশি

সে-চাল কি আর মাটিতে ফেলে যেতে পারে কেউ? চাল, মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ কণা—ওর প্রত্যেকটি দানায় অমৃতবিন্দু সঞ্চিত রয়েছে যে!

ইন্দ্রজিৎ নদীর ওপারে আর একবার চাইলো সেই চিলে কোঠার দিকে—পাংশুটে রংএর ছাদটা দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারেই ঐ গ্রামটা ঐ চালের গাড়ীগুলো তাহলে নদী পার হয়েই এসেছে এ দিকের রাস্তায়—তাহলে নদী পেরুতে পারা যাবে—টান হয়তো খুব বেশি হবে না। ইন্দ্রজিৎ আরো খানিকটা অগ্রসর হোলো এদিকের কিনারা ধরেই, তারপর নদীতে নামবে কি না ভাবছে। এ ভাবে সাঁতার দিয়ে নদী পেরুনো ওর অভ্যাস নেই। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এলো। যদি স্রোতে ভেসে যায় তো কেউ তাকে দেখতেও পাবে না! চারদিকে চেয়ে দেখলো ইন্দ্রজিত, কোনোদিকে জনমানব দেখা যায় না। নদীতে এমন করে একলা নামতে সাহস হচ্ছে না ওর! সেই রেলওয়ে ব্রিজটার কাছ অবধি যেতে পারলে নদী পার হয়ে যেতে পারে ব্রিজের ওপর দিয়ে কিন্তু সেটা যে কতদূরে তা আন্দাজ করা ওর মত নতুন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্য্যন্ত নদীতে নামাই স্থির করলো। কাপড় সামলে লাঠিটা আগে দিয়ে জল মাপতে মাপতে প্রায় কোমর অবধি জলে নামলো ইন্দ্রজিত। উঃ! কি ভয়ঙ্কর স্রোতের টান—ইন্দ্রজিতের সর্বাঙ্গ টলে যাচ্ছে—পায়ের নীচের বালি সরে যাচ্ছে, পড়ে যাবে ইন্দ্রজিৎ।

টাল সামলে উঠে আসবার জন্য মুখ ফেরালো—তীরে দাঁড়িয়ে চার পাঁচ জন মানুষ! ভূতের কঙ্কালের মতন চেহারা তাদের—যেন শ্মশানের প্রেত! কে ওরা! ইন্দ্রজিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললো—কে তোমরা? কি চাও আমার কাছে?

—চাল! এই শালা দু-সের চাল পেয়েছে—আমাদিগকে কেনে ভাগ দিবে না—বল তুমি বাবু—তুমি তো চাল যুগ [illegible] দিবেন [illegible]

[illegible] আমাদিগেও দাও!

ইন্দ্রজিৎ দেখলো, সেই গাড়ীর চাল-চো[illegible] নিয়ে

এসেছে ! সে লোকটা করুণ চোখে চাইতে লাগলো ইন্দ্রজিতের পানে, যেন বলতে চায়—বাবু, এইকটি চালের যেন আর ভাগ দিতে না হয়। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ জানে, ভাগ ওরা নেবেই—কেড়ে নেবে। কিন্তু কেন ঐ পাঁচখানা গাড়ীর সব চাল ওরা লুঠ করতে পারে না—কেন ? কেন ?

—তোরা তখন গেলিনে কেন গাড়ীর কাছে ? আমি সবাইকে চাল দেওয়াতাম—ইন্দ্রজিৎ বললো। কিন্তু ওরা সে কথা গ্রাহ্য না করে বললো,

—এই শালা ইকালা এতো এতো চাল নিয়ে যাবে বাবু ! আমরা যে কদিন খাই নাই, মনে পড়ে না—দে শালা, দে চাটি চাল।

টানাটানি করছে ওর পোটলাটা নিয়ে। ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারলো—গাড়ী থেকে চাল দেবার সময় এরা সেখানে ছিল না—পরে যখন মাটি থেকে চাল কুড়চ্ছিল তখন এরা এসে জুটেছে। বললো,

—এই থাম—আমি সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছি।

কিন্তু ভাগ করবার দরকার হোলো না—ওরা তার আগেই পোটলাটা ছিনিয়ে নিয়েছে, আর পাতলা পুরোনো ন্যাকড়া ছিঁড়ে চালগুলির কিছু কিছু নদীর ভিজে বালিতে পড়ছে—আহা হা ! চীৎকার করে উঠলো সেই চাল চোর, কিন্তু বাকি চার জন এর মধ্যে পোটলটা নিয়ে দৌড় দিল। চাল চোর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল পলাতকদের দিকে।

আহা কি অবস্থা ! বৃটিশ-শাসিত বাংলার গৌরবময় দিন। যুগান্তের ইতিহাসে এদিনের কথা যেন আগুনের হরপে লেখা হয়। মানুষের শরীর মনের জন্ম অত্যাবশ্যক অন্ন-বস্ত্র-আরোগ্যের এমন শোচনীয় দুর্গতি পৃথিবীর আধুনিক শাসন-যন্ত্র চালিত কোনো দেশে কখনো ঘটেছে কি ? এই দেশের কোটি কোটি জন[illegible] জগতের [illegible]ভ্য-শ্বেতজাতির অপরিমেয় অবজ্ঞা আর ঔদাসীন্য মানবে[illegible] ব্যর্থতা ;—কিন্তু এর কারণটা কোথায় ? ইন্দ্রজি[illegible] উঠে এলো—মনে পড়লো, ঋষি রবীন্দ্রনাথ এক [illegible] এই পর জাতিয়ের পৌরুষ দলিত করে

দিয়ে তাকে চিরকালের মত নির্জীব করে রেখেছে”—* হ্যাঁ, সত্যি! এই মহামন্বন্তরের মধ্য দিয়ে জাতিকে আরো নির্জীব, আরো অসহায়, আরো ক্লীব-কাপুরুষ করে দেওয়া হচ্ছে।—কিন্তু এত কথা ভাববার সময় পেলো না ইন্দ্রজিৎ। সেই চাল চোর লোকটা আছাড় খেয়ে পড়লো ওর পায়ের উপর, বাবু-রাজা-বাবু।

—আমি রাজা নই বাপ্-আমার—তোর কোন উপকারই করতে পারবো না—বললো ইন্দ্রজিৎ।

লোকটা হাপুস নয়নে কাঁদছে—কাঁদতে কাঁদতেই বললো—গুলাপীকে আর বাঁচাতে নারলুম বাবু—আহা-হা! আঠার বছরের বিটি শুকুইয়ে মরে গেলো ওঃ!

লোকটা বালির মধ্যেই মুখ গুঁজড়ে পড়লো। ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো মিনিট খানেক—তার পর বললো—এই নদীর উপারে যেতে পারবি?

—হুঁ বাবু—চাল প' যাবে? রেলের পুল দিয়ে পার হয়ে যাবো!

—চল—বলে ইন্দ্রজিৎ ওর হাত ধরে তুললো। কিন্তু রেলের পুল এখান থেকে কিছু দূরে, তাই বললো—চালের গাড়ীগুলো কি করে পার হয়েছিল রে?

—গোরুর গাড়ী পার হতে পারে বাবু! উরা সব দুপহরে পার হইছিল তখন বান কম ছিল—এখন আরো বাড়ছে বান। পচ্ছিমে হয়তো জল হয়েছে খুব।

ইন্দ্রজিৎ ওর কথা কিছু বুঝলো, কিছু বুঝলো না—হাঁটতে লাগলো। কিন্তু ওপারে একে নিয়ে গিয়ে চাল কেমন করে যোগাড় করবে ভাবছিল ইন্দ্রজিৎ।

—উ গাঁয়ে তুমার কুটুম বাড়ী আছে নাকি? চাল পাব তো?

—চল দেখি—বলে ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে চলেছে—কিন্তু [illegible] একে ব্যাকুল করে তুললো। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে! দূরে [illegible] যাচ্ছে। ঐ ব্রিজটাই কিছু দিন আগে ইন্দ্রজিৎ দেখেছিল [illegible] তাতে

* সভ্যতার সঙ্কট—রবীন্দ্রনাথ

উপকার হোতো দেশের ? ব্রিজ ভাঙলে ব্রিজ গড়া যায়—কিন্তু এই যে মানুষের জীবনের সকল সংস্কার-সংস্কৃতির ভাঙন, একে আর কি দিয়ে গড়া যাবে—কি ভাবে মেরামত করা যাবে ?" পৃথিবীর ইতিহাস থেকে প্রাচীন ভারতের জীবন-সাধনা লুপ্ত হয়ে যাবে হয়তো !

কাবেরী চলে এলো লকুর পিছনে। স্বাহা বাবার মাথাটি কোলে নিয়ে কাঁদছিল, খোকা রয়েছে রামীর কোলে। রামীও কাঁদছিল তফাতে বসে। লকু একবারও পিছনে চেয়ে কাবেরীকে দেখে নি—কাবেরীও কোনো কথা বলে নি রাস্তায় যাতে লকুর মনোযোগ আকৃষ্ট হতে পারে। লকু ঘরে ঢুকে স্বাহাকে বললো—মানুষ এখানে সবাই মরেছে বৌদি—দানব কয়েকটা বেঁচে আছে—ওরা অশুচি, ওদের ডাকতে গিয়ে এই পবিত্র মৃতদেহের অপমান করেছি আমি—বলে লকু বসলো মৃতের পা'তলে।

স্বাহার নিঃশব্দ ক্রন্দন আর রামীর অনুচ্চ ক্রন্দন রোল এমন একটা করুণ-তম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে কাবেরী কি করবে ভাবতে পারছে না। হঠাৎ স্বাহাই ওকে দেখে লকুকে শুধলো—উনি কে ঠাকুরপো ? আসতে বলো।

লকু এতক্ষণে দেখলো কাবেরীকে ; বললো—আপনি এসেছেন দেখছি যে ! আসুন।

কাবেরী এগিয়ে এলো নিঃশব্দে। মৃতের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর আ[illegible] [illegible]বীরের মৃত্যুতে শোক করতে নেই দিদি—উঠুন, ফুল পা[illegible] [illegible]জিয়ে দিই, জন্মভূমির মৃত্তিকায় ওঁর কপালে তিলক [illegible] [illegible]তলে লিখে দিই—"হে আমাদের আত্মার আত্মীয় [illegible]

স্বাহা বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রয়েছে কাবেরীর মুখপানে ! কে মেয়েটি—কোত্থেকে এল !

লকু বললো—উনি পঙ্কজিনী বৌদি—পাঁকের কদর্যতা আর আঁধার জলতল ছাড়িয়ে উঠেছেন প্রদীপ্ত সূর্য্যালোক পানে।

স্বাহা উঠে হাত ধরলো কাবেরীর, বললো—তোমার মৃণাল এখনো কিন্তু পঙ্কে সংলগ্ন ভাই !

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো এই মুহূর্ত্তেই আমায় পাঁক থেকে ছিঁড়ে নিতে পারেন পূজার জন্য !

—জানি না পারি কি না—তোমার পঙ্কের জন্ম-অধিকারীরা ঐ বুঝি আসছে !

তিনজন লোক ঢুকলো—সাহেব বেশী দুজন আর গ্রামের সেই তালুকদার। সাহেবদের একজন ঘরে ঢুকেই বললো—আহাহা, ইনি ! এই সেদিন এখানে এসে এঁর সঙ্গে কত আলাপ করলাম—জানেন, মিঃ চ্যাটার্জি—ইন্দ্রজিৎবাবুও এসেছিলেন সেদিন !

—ইন্দ্রজিৎ ? এখানে ? কবেকার কথা বলছেন আপনি—কাবেরী প্রশ্ন করলো :

কথাটা ফাঁক করে ভালো করে নি ফটোগ্রাফার, বুঝলো। কারণ ইন্দ্রজিৎ এখানে এসেছিল একথা জানিয়ে সে কাবেরীর শ্রদ্ধাটাকে ইন্দ্রজিতের পানেই এগিয়ে দিচ্ছে। তাই একটু থেমে বললো—এসেছিল, মানে, আমরা দুইজনেই রাস্তার গতিকে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ইচ্ছে করে আসি নি কেউ—হঠাৎ এসে পড়েছিলাম আমরা, তারপর আলাপ হয়।

—ও ! কাবেরী আর কিছু না বলে উঠোনের একদিকে যে গাঁদা, স্থলপদ্ম, করবী ইত্যাদি গাছে ফুল ফুটেছিল তাই তুলতে গেল আগন্তুকদের [illegible] সকলকে উদ্দেশ করে বললো—ইনি ধোপার মেয়ের [illegible] দিয়েছেন [illegible] আপনারা এখানে থেকে অনর্থক নিজেদের জাতিত্ব [illegible] জন্যই বা এলেন এখানে ?

কেউ কিছু কথা বললো না কিছুক্ষণ, পরে মিঃ চ্যাটার্জিই বললেন—ওসব গোড়ামী আমার নাই। ইনি একজন দেশসেবক, ওঁর মৃত্যুর পর দেহের সৎকার করবার ভার আমাদের—জীবনে উনি কি করেছেন, এখন তার বিচারের সময় নয়।

ফটোগ্রাফার উৎসাহিত হযে উঠলো—নিশ্চয নিশ্চয়…মৃতের সম্মান আমরা নিশ্চযই রক্ষা করবো—চন্দন কাঠ এখানে তো পাওযা যাবে না—সহরে…লোক পাঠালে…।

—থামুন!—কাবেরী এসে থামিযে দিল ওকে।—চন্দন কাঠ চাই না, চলে গেলেই ভালো হয আপনারা। তোমরা যাও বাবা, এ দেহ ছোঁবার তোমাদের অধিকার নেই। যে সংস্কৃতি তোমারা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছো, ইনি সেই সংস্কৃতি রক্ষার জন্য জীবন দিলেন—তোমাদের হাতে ওঁর পুণ্যদেহ কলঙ্কিত করো না।

—না মা কাবেরী, আমি জানি, আমরাই আজ এঁর কাছে অস্পৃশ্য কিন্তু ইনি তো সে সবের অতীত সন্ন্যাসী—ওঁর দেহ স্পর্শের পুণ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না—বলে একটু থেমে কাবেরার বাবা স্বাহার উদ্দেশে বললেন,—অনুমতি কর মা, ওঁর শেষ কাজ আমরা সম্পন্ন করি। ওঁর দেহ স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের অতীত।

স্বাহা চুপ করেছিল—কি ভেবে একবার মুখ তুলে ওঁর পানে তাকিযে বললো,—আপনার এই মুহূর্তের কথাকটিতে যদি সত্যনিষ্ঠা থাকে তাহলে আপনিও এখন আমাদের স্বজাতি—কিন্তু সত্যি কি তা আছে? আপনার এটা শ্মশান বৈরাগ্য নয়তো? তথাপি আমি বিশ্বাস করলাম আপনাকে, আচ্ছা! থাকুন!

কা[illegible] তাকালেন স্বাহার মুখপানে, কিন্তু কিছুই [illegible]মার বল[illegible]ত করতেই সে শবদাহের ব্যবস্থা করতে [illegible]গ্রাফারই বেশী চেঁচামেচি করছে—যেন

তারই পিতৃদায়! লোকাধীশ একপাশে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত লোকটার আশ্চর্য্য কার্য্যকারণের বিষয় ভাবছিল। লোকটা শুধু যে ধনীর পদলেহী, তাই নয়, হীনচরিত্র। কাবেরী দেবীর বাবার প্রসন্নতাই সে শুধু অর্জ্জন করতে চাইছিল না—স্বয়ং কাবেরী দেবী তার কাজ দেখে খুশী হচ্ছেন কি না, আড়চোখে সেটাও দেখছিল, আর স্বাগার পানেও তাকাচ্ছিল। ওর যা কিছু কাজ—সবই এই দুটি মেয়েকে কেন্দ্র করে, যা কিছু চিন্তা, এদের প্রসন্নতার জন্যই!

যে মহাপুরুষ দেহত্যাগ করলেন, তার সর্ব্বশেষ পার্থিব কার্য্যের সময় এমন একজন নারী-লোভী কাপুরুষ সব কিছু স্পর্শ করবে—লোকাধীশের মন এতে পীড়িত হচ্ছে। বললো—আপনি কলকাতার মানুষ, এসব অভ্যাস তো নেই, আপনাদের মুখের উৎসাহই যথেষ্ট। আমরাই সব করে নিচ্ছি—বলে লোকাধীশ এগিয়ে এলো।

—সে কি মশাই! বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই আমি—আমার থেকে এসব কাজ আপনি ভাল পারবেন, মনে করেন? তাছাড়া, আপনারা শোকগ্রস্ত, যান, বসুন গে!

—না! শোকগ্রস্ত নই আমি—লোকাধীশ বলল—বীর সৈনিকের মৃত্যুকে আমি শ্লাঘনীয় মনে করি। আর আমাদের শোক করবার সময়ই বা কোথায়? মৃত্যুকে তো এখন বরণীয় মনে করছি আমরা। নিরাপদে নিষ্কলুষ থেকে যদি এই পরাধীন দেহখানা ত্যাগ করা যায় তাহলে তো ভাগ্য মনে করবো—কারণ দেহমনকে বিশুদ্ধ রাখার আর কোন উপায় দেখছি না—কথা বলা বন্ধ রেখে লোকাধীশ এসে মৃতদেহ বহন করবার জন্য বাঁশের একটা ডুলি তৈরী করতে আরম্ভ করলো। কাবেরীর বাবা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ওর কথা। বললে,—তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে [illegible] আমি।

লোকাধীশ হাসলো, কিন্তু সে কিছু বল[illegible] দিলেন উ[illegible] কাবেরী।

—ও তুমি বুঝবে না বাবা—দেহকে [illegible] অন্নবস্ত্রের দরকার তা তো তোমরা কেড়ে নিয়েইছ—[illegible] যে শিক্ষা

সংস্কার দরকার তাও ভেঙে চুরমার করে দিলে। এ দেশের একটা মানুষও অবিশুদ্ধ হয়ে, খাঁটি হয়ে বেঁচে থাকবে, এ তোমরা চাও না। তোমরা চাও দেশের সব মানুষগুলো যাতে ভেজাল-ফিরিঙ্গী হয়ে যায়!

—তুই কি বলছিস কাবেরী—আমি এদেশের মানুষ নই?

—না।—কাবেরীর কণ্ঠস্বর শান্ত-গম্ভীর—তুমি এদেশের মানুষ নও বাবা, তা যদি হতে তাহলে এমন করে এই মন্বন্তরকে ডেকে আনবার জন্য তোমার ব্যবসার জাল ফেলতে না। উঃ! এখন আমি বুঝতে পারছি বাবা, কেন তুমি আমাকে সঙ্গে আনতে চাইছিলে না! কিন্তু আমি জানি—দেশকে এমনি করে শ্মশান করে দেওয়ার মূলে তোমারও কিছু কৃতিত্ব আছে! কিন্তু তুমি আমার বাবা—তোমাকে আর আমি কি বলবো, বাবা—আমার দুর্ভাগ্য!

কাবেরীর চোখ দুটোতে জলের জ্যোতিরেখা জেগে উঠলো। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে একটা আকন্দগাছের চওড়া পাতার উপরকার সাদাসাদা গুঁড়োগুলো হাত দিয়ে রগড়াচ্ছে সে। মোহিতবাবু চাইলেন মেয়ের মুখের পানে। কি যেন ব্যথা-বেদনায় মনটা তাঁর মোচড় দিয়ে উঠছে।

—তুই আমার উপর এমন অভিযোগ আনলি মা, কাবেরী!

—না বাবা, অভিযোগ কেন করবো! আমি তোমার একমাত্র মেয়ে। তোমার চোরাবাজারে পাওয়া লাখ লাখ টাকা আমারই বিলাস-ব্যসনে ব্যয় হবে—কিন্তু বাবা,—কাবেরী কেঁদে ফেললো—আমার গর্ব্ব ছিল, আমার বাবার মতন বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ মানুষ হয় না—আজ বুঝতে পারলাম বাবা—সে বুদ্ধি ডাকাতের বুদ্ধি—সে প্রতিভা দস্যুর প্রতিভা—চোখের জল মুছাবার জন্য কাবেরী [illegible] বাগানের [illegible] একটা এগিয়ে গেলো।

[illegible] কণ্ঠস্বর বড্ড বেশী করুণ শোনাচ্ছে তাঁর নিজেরই [illegible] চিত্ত শক্তিতে দৃঢ় করে উনি এগিয়ে এলেন মেয়ের [illegible] এলেন।

—কি তুই চাইছিস মা, বল—তুই কি চাস, আমি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিলি করে দেবো ?

—দেশ আর রইল কোথায় যে বিলি করবে?—কাবেরীর কণ্ঠে বজ্র ঝনঝনা—তোমার মতন লাখো-লাখো বাবা স্ত্রী পুত্রের জন্য চোরা বাজার খুলেছে, ব্যাঙ্ক আর ব্যবসার মারফৎ দেশের বিশুদ্ধ প্রাণটুকুকে টুঁটি টিপে মারছে, তারপর লঙ্গরখানা খুলে শবদাহের সসমারোহ ব্যবস্থা করবে—বলে কাবেরী একটু থামলো—তারপর আবার বললো—ব্যবসার রহস্য আর রোমাঞ্চের কথা আমায় তুমি অনেকবার বলেছো বাবা, কিন্তু আমি জানতাম না যে ব্যবসাদার মানুষরা এমন অমানুষ হয়—এমন খুনী হয়, এমন দেশদ্রোহী হয় !

লকু এই পিতাপুত্রীর কথাগুলি শুনছিল—কিন্তু তার খুবই অবাক লাগছে। কথাগুলোর আভ্যন্তরীণ রহস্য সে বুঝতে পারছিল না কিন্তু ফটোগ্রাফার এসে বললো—শুনুন মিস্ চ্যাটার্জি, আপনার বাবাকে অনর্থক দোষী করছেন। মন্বন্তরের উপর মানুষের কোনো হাত নেই। তাছাড়া, এই যুদ্ধের বাজারে প্রত্যেক ব্যবসায়ীই দু'পয়সা করবার সুযোগ পাচ্ছে—দেশে ইন্‌ফ্লেসন, দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, কিন্তু লোকের ক্রয় শক্তিও বেড়েছে যথেষ্ট···।

—তাই খেতে না পেয়ে এত লোক মরলো ! ক্রয়শক্তি বেড়েছে বই কি ! না হলে আপনার তোলা জ্যান্ত মানুষের দেহকে শেয়ালে ছেঁড়ার ছবি পাঁচশো টাকায় কিনবে কেমন করে ? কিন্তু এ ক্রয়শক্তি দেশের লোকের, নাকি দেশদ্রোহী ধনীকদের ? কিন্তু থাক, আপনার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই নে—যা করছেন করুন গে।—বলে কাবেরী চলে [illegible] ছ। কোল ঘেঁসে বসে বললো—খোকাকে আমার কোলে

স্বাহা কিছু না বলে খোকাকে ওর কো [illegible] থাকার চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে বললো আস্তে—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ম্ময়—
—তিমির-বিদারী উদার অভ্যুদয়।
প্রভাত সূর্য্য, এসেছো রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোলো লয়!"

কাবেরীর দুচোখ থেকে বড় বড় মুক্তাবিন্দুর মত জল ঝরে পড়লো খোকার মাথার চুলে। স্বাহা চেয়ে দেখছিল, এতক্ষণে বললো—ভারতের মহাশ্মশানে শবসাধনা করে যে ভৈরবী, তুমি তাদেরই একজন বোনটি—তোমার প্রচ্ছন্ন বেশ আমায় ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল—মাফ করো।

কাবেরী স্বাহার পায়ে হাত রেখে বললো,—আমার জন্মের জন্য আমাকে ছদ্ম বেশ পরতে হয়েছে দিদি—কিন্তু আজ সে বেশ খুলে ফেললাম, আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের শেষ নিশ্বাসটিও যেন ভারতের মুক্তি সাধনায় ব্যয় করতে পারি!

—মাতা ভারতের কোল তোমার মত সন্তান-গর্ব্বে গর্ব্বিত হোক।

স্বাহা থামলো। লোকধাঁশ তার কাজটা শেষ করে এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। শব দেহকে এবার তুলে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। বললে,

—ধর বৌদি, তুমি মাথার দিকটায় ধরো, আমি পায়ের দিকে ধরছি। কাবেরী উঠে বললো,—ওঁর পা'র দিকে আমায় একটু জায়গা দেবেন।

—আপনাকে ওঁর পায়ের ধুলা দেওয়া হয়েছে, ঐ খোকাকে। এই মন্বন্তরে যদি আমরা মরে যাই তাহলে ঐ ধূলিকণাটিকে সঞ্চিত রাখবেন আপনি, ও আমাদের অনেক তপস্যার ধন।

কাবেরী নিশ্চুপ হয়ে লকুর মুখপানে তাকিয়ে রইলো। শবদেহকে দোলায় তোলা হোলো [illegible] করতে হবে। ফটোগ্রাফার বলতে যাচ্ছে "বল হরি [illegible] দিয়ে বললো,

—[illegible] চিত্ত

স্বা[illegible] কণ্ঠ মিলালো।

শবদেহ শ্মশানের পথে যাত্রা করেছে—কাবেরীর বাবাও চলেছেন পিছনে আর সেই ফটোগ্রাফার। তালুকদার আর তার কয়েকজন লোক কাঠ ইত্যাদি নিয়ে আরো পিছনে আসছে, সবার পেছনে আসছে রাণী। মেয়েটা কান্না কিছুতেই সামলাতে পারছে না, অধীর হয়ে উঠেছে একেবারে। ও যে কতখানি ভালবাসতো এই বৃদ্ধকে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ওকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

ফটোগ্রাফার আস্তে বললো কাবেরীর বাবকে—উনি যে এতখানি সেন্টিমেন্টাল তাতেঃ জানতাম না স্যার! এখানে এমন করে সময় নষ্ট..

—চুপ কর, শুনতে পাবে ও! এখানে ওর সুরে সুর আমাদের মেলাতেই হবে, নইলে যা একগুঁয়ে মেয়ে, হয়ত ফিরে যেতেই চাইবে না!

ঐ জন্তেই বলেছিলাম স্যার, ওঁকে আনবার দরকার নাই। আপনিই···

—হ্যা, আমিই এনেছি! কিন্তু না আনলে আরো বিপর্য্যয় ঘটতো! আজ কাল ও আবার কারখানা যেতে আরম্ভ করেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের সুখ-দুঃখ জানতে যায়—মুস্কিল বাধিয়েছে!

—এ রকমটা হোলো কেন স্যার? আপনার মেয়ের তো এরকম হবার কথা নয়।

—কি জানি, দেবা ন জানন্তি। ইন্দ্রজিৎ চলে আসবার পর থেকেই বদলে গেলো।

—ইন্দ্রজিৎ! কোন রকম প্রেম ঘটিত ব্যাপার নাকি স্যার?—বলেই ফটোগ্রাফার সামলে গেলো। পিতার কাছে পুত্রীর সম্বন্ধে একথা বলা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি সেদিকে লক্ষ্য না করে বললেন,

—মেয়েরা ধন, জন, যৌবনকে কোনো দি [illegible] সত্যি করে। তারা সত্যি ভালবাসে জীবনের সত্যাদর্শকে [illegible] জীবনের গরীষ্ঠতাকে।

—ফিলজফির কথা স্যার ?

—না, সহজ সত্য জীবনের কথা। মহত্তর সংস্কৃতির উপর নারীর নিষ্ঠা ঐকান্তিক, তাই নারীর আশ্রয়ে লালিত হয়ে মানুষের সভ্যতা এত উচ্চে উঠেছে। নারীর মধ্যে এই গুণ না থাকলে মানুষ আজো বর্ব্বর আরণ্যক থেকে যেতো। নারী চায়, তার প্রিয়জন উন্নত হোক, আদর্শবাদী হোক, মানুষ হোক।

—হ্যাঁ, স্যার, তাতো নিশ্চয়ই! ওঁরাই তো আমাদের মানুষ করেন। কিন্তু স্যার, আমরা তো ওঁদেরই জন্য এতসব করছি, এই ফিকির ফন্দি করে টাকা রোজগার ইত্যাদি!

—করছি কিন্তু করা উচিৎ ছিল না, কারণ, যাদের জন্য এসব করছি তারা সত্যি সুখী হয় না এতে। চোরের ছেলে কখনো তার বাপকে সত্যকার শ্রদ্ধা দিতে পারে না, দেশদ্রোহীর পুত্র তার পিতাকে কোনো দিন ক্ষমা করে না—ব'লে মিঃ চ্যাটার্জি থামলেন। সামনে কাবেরীর সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে জয়ধ্বনি কাঁপছে—"জন গণ মন অধিনায়ক হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা…জয় হে"।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—কার জন্য এসব ক'রলাম! হাজার হাজার মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিযে ঐ একটা মাত্র মেয়েকে সুখী করতে চেয়েছি। ওর মা ঠিকই বলেছিল, "কাবেরী তীর্থ-সলিল, তুমি যতই তাকে আবিল করো, সে তীর্থ ই থাকবে —" ও সাগরাভিমুখী, ওকে আর ফেরানো যাবে না—মিঃ চ্যাটার্জির চোখ অশ্রু-সজল। ফটোগ্রাফার তাঁর মুখপানে চেয়ে বললো—কলকাতায় ফিরলেই এ সব ভুলে যাবেন উনি স্যার।

—না, ও সে মেয়েই নয়। আমার মুখের ওপর আমাকে ডাকাত বলতে ওর বাধে না- [illegible] আমার যাকিছু…নিশ্বাসটা ছাড়লেন।

—স[illegible]সব ছেলেমানুষী হুজুগ!

কা[illegible] চিত্তিলেন না

ওখ[illegible]

১০

নদীর ধার ধরেই চলেছে ইন্দ্রজিৎ, সঙ্গে সেই লোকটি। ব্রীজের উপর নদী পার হ'য়ে ওরা জমিদার সুবোধের বাড়ী যাবে—কিন্তু ইন্দ্রজিৎ যেতে চায় বিহারীনাথ পাহাড়ে। দ্রুত পথ চলতে পারছে না, কারণ, সঙ্গের লোকটা এত দুর্ব্বল যে অতি আস্তে হাঁটছে। ইন্দ্রজিৎ বিরক্ত হয়ে উঠছিল, কোথাকার একটা আপদ এসে জুটলো! কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজকে তিরস্কার করলো ইন্দ্রজিৎ। ভারতমাতার বুভুক্ষু নিরন্ন হতভাগ্য একটি সন্তানের জন্য ইন্দ্রজিৎ যথাসাধ্য কিছু করতে চেষ্টা করবার অধিকার পেয়েছে—এটা তার ভাগ্য। এই সেবাধর্মের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রসন্ন দৃষ্টি অর্জন করা যায় ; মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী…"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"…

ইন্দ্রজিৎ পিছিয়ে-পড়া লোকটার জন্য অপেক্ষা করছে, দাঁড়িয়ে ডাক দিলো,

—এসো হে, একটু তাড়াতাড়ি এসো !

—এজ্ঞে, যাই কর্ত্তা…লোকটা প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটছে, সন্ধ্যার পাত্‌লা অন্ধকারে ইন্দ্রজিৎ দেখতে পেলে। কিন্তু কোথা থেকে গান ভেসে আসছে "বন্দেমাতরম্"—সুর যেন পরিচিত, ইন্দ্রজিৎ কান পেতে শুনতে লাগলো ; নারীকণ্ঠের সুর :—

ত্বং হি দুর্গে দশপ্রহরণ ধারিণীং নমামি তারিণীং

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্—বন্দে…!

এইখানে নদী-কিনারের নির্জ্জনতায় কে জাতীয় সঙ্গীত গাইছে ? বিস্ময়ে ইন্দ্রজিৎ থেমে গেলো ! সঙ্গের লোকটার কাছে এসে শুধুলো—কে গান করছে হে, জানো ?

—না বাবু মশাই, ক্যাম্‌নে জানবো ! … বেড়াইতে এসেছে হয় তো !

একে জিজ্ঞাসা করাই বোকামী ই… সঙ্গীতের কথাই কখনো শোনে নি।

—কিন্তু শোনাতে হবে, জানাতে হবে—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা…।"

ইন্দ্রজিৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে হাটতে লাগলো আস্তে। লোকটা বললো,—উদিকে শ্মশান আছে বাবু, কুনো বড়লুকের কেউ মরেছে, পুড়াইতে এসেছে হয়তো!

—কোন দিকে শ্মশান? সামনে?

—হুঁ, বাবু!

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে চলেছে, গানের সুর নিকট হয়ে আসছে ক্রমশঃ—তার সঙ্গে মানুষের গলার আওয়াজ। কয়েকটা কাশঝোপের আড়াল পার হতেই আলো দেখতে পেলো ইন্দ্রজিৎ—জনকয়েক লোকও। কে মরেছে যাকে এই মন্বন্তরের দিনে এত সমরোহ করে দাহ করা হচ্ছে? জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে? ইন্দ্রজিতের কৌতূহল জাগলো। জাতীয় সঙ্গীতটা আবার নারী-কণ্ঠের এবং সেকণ্ঠ মার্জিত, রাগ-তাল-মান ত্রুটিহীন! ইন্দ্রজিৎ শ্মশানের দিকেই চলতে লাগলো। সঙ্গের লোকটি বললো—উদিকে কোথা যাবে বাবু?

—চল না, দেখি কে মরেছেন—বলেই ইন্দ্রজিৎ জোরে চলেছে আর ভাবছে, এটা কোন্ যায়গা হতে পারে! এখানে সে আগে এসেছে কি না? কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে, দূরের কোনো গ্রাম দেখা যাচ্ছে না—ইন্দ্রজিৎ কিছু ঠিক [illegible]

আ[illegible]!, শবদেহটাকে নামানো হচ্ছে মাটিতে। দুটি মেয়ে, [illegible] চিতা রচনা করছে দুজন। ইন্দ্রজিৎ ভাবলো, কি হবে ও[illegible]! [illegible] নষ্ট—মরছে তো অজস্র লোক, ইনি হয়তো

তাদের মধ্যে ভাগ্যবান, তাই শ্মশানে পুড়তে এসেছেন। ও দেখে কিছু লাভ নাই—ইন্দ্রজিৎ ঘুরে নদী-কিনার দিকে আসতে লাগলো।

লোকটা বললো,

—শ্মশানে যাবে না বাবু।

—না, থাকগে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলো, কে যেন বলছে :—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ-ভার ;
… … …
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

নাঃ! ইন্দ্রজিত না গিয়ে আর পারলো না ওখানে। সঙ্গের লোকটা অত্যন্ত দুর্ব্বল, হাঁফাচ্ছে,—ওকে বললো,—তুই এখানেই জিরো খানিক; আমি দেখে আসি কে মরেছে।

—চল কেনে বাবু! আমিও যাই—লোকটা পিছু ছাড়ে না, পাছে ইন্দ্রজিৎ পালিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ইন্দ্রজিৎ এসে দাঁড়ালো শ্মশানে। কাবেরী তখন উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছে—

সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে,
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র
অসত্যেরে হানে।

মহেন্দ্রের বজ্র হ'তে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি,
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ-মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে,
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ
সব লও লুঠে।

—ইন্দ্রজিৎ! মিঃ চ্যাটার্জি ডাক দিলেন। ইন্দ্রজিৎ চেয়েও দেখলোনা ওর দিকে। ধীরে এসে কাবেরীর সামনে দাঁড়ালো, বললো,

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি—
তারে নমো নমঃ!

চিতায় আগুন দেওয়া হচ্ছে—কাবেরী এগিয়ে এসে হাত দুটি যোড় করে প্রার্থনা করলো, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ—

"দাও, খুলে দাও দ্বার—ওই তার বেলা হোল শেষ
শান্তি অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎস-ধারে॥

দাউ দাউ চিতা জ্বলে উঠলো। কাবেরী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ইন্দ্রজিৎও তেমনি দাঁড়িয়ে,

মিঃ চ্যাটার্জি এসে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—খুকী! ইন্দ্রজিৎ এসেছে, [illegible]

—[illegible] আজ ওঁকে আমার দরকার ছিল, তাই ঈশ্বর এনে দিয়েছে[illegible]বাবু?

—বলুন। [illegible]নবার জন্ত অপেক্ষা করছে। কাবেরী বললো,

—আপনার ধর্ম্মসাধনার কথা শুনেছি আমি, কিন্তু কর্ম্মসাধনাও তো করতে হবে, তার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

—কর্ম্ম ধর্ম্মেরই অন্তর্গত দেবী। ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্মই জগতকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। যে কর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মের, মানবতার, মাহাত্ম্যের মর্ম্মকোষ নেই, তা মৃত। কাজেই ধর্ম্মের মধ্যেই কর্ম্ম থাকবে। অহিংসার আধ্যাত্মিক খড়্গকে ধর্ম্ম দিয়ে ধারালো করতে হবে, সেই হবে অজেয় খড়্গ !

—কিন্তু সেই ধর্ম্মকে জাগ্রত করবার জন্য আবার কি মন্দির মসজেদের আশ্রয় নিতে হবে ? তাহলে তো জাতি আরো পঙ্গু হয়ে যাবে ইন্দ্রজিৎ বাবু !

—না—মন্দির মসজেদের সুদৃঢ় ভিত্তিতে এবার সংস্কার-সংস্কৃতির সদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জাতির ভুলে যাওয়া চৈতন্যকে জাগ্রত করতে হবে—যে-মনুষ্যত্ব তারা হারিয়ে মেরুদণ্ডহীন হযে গেছে, সেই মেরুদণ্ড সবল-সুস্থ সক্ষম করতে হবে—কিন্তু কোন্ পথে, কেমন করে সেটা হবে—আমার ঠিক মত জানা নেই—তবে গুরুদেব নিশ্চয়ই জানেন।

—কোথায় আপনার গুরুদেব ?—কাবেরী সাগ্রহে শুধুলো।

—ঐ দূরে বিহারীনাথ পাহাড়ের গুহায় তিনি তপস্যা করেন। আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছিলাম।

—চলুন, আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

—না কাবেরী দেবী, সে বড় দুর্গম পথ। আপনি হাঁটতে পারবেন না।

কথাটা শুনে কাবেরী মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলো, তারপর বললো,

—ইন্দ্রজিৎ বাবু, নারীর শক্তিকে আপনি এত তুচ্ছ ভাবেন ? আপনার দ্বারা কোনো কাজ হতে পারে না দেশের। আপনি বিশ্বাস করেন না যে, নারীর শক্তি। ভেবে দেখুন ইন্দ্রজিৎবাবু, প্রথম সে[illegible] [illegible]শক্তিতে আপনি ডাকাতের হাত থেকে আমাদের সম্মান রক্ষা ক[illegible] [illegible] আমি ঐ গাড়ীতে ছিলাম বলেই, সে কাজ করতে পেরেছি[illegible] [illegible]কে শক্তি যুগিয়েছিলাম আমি।

—মনে আছে দেবী। আপনারা শক্তির উৎস, আমরা দুর্ব্বার বন্যা-স্রোত, কিন্তু উৎসকে তো বন্যার সঙ্গে চলতে হয় না—শুধু সংযোগ রাখা দরকার।

কাবেরী চুপ করে ভাবতে লাগলো, ইন্দ্রজিৎ আবার বললো আস্তে,

—বাপের বাড়ীতে আপনাকে আমি চিনতে পারি নি—ক্ষমা চাইছি। ছদ্মবেশের তো আপনার কিছু দরকার নেই! আপনি তীর্থ-সলিল, আদেশ করুন, আমি যাই।

আবার কোথায় আপনার দেখা পাবো?

—ঐ দিদির বাড়ীতে, আমি ওঁর সঙ্গে আজই যাবো সেখানে—বলে কাবেরী স্বাগাকে দেখিয়ে দিলো। ইন্দ্রজিৎ কিছু বলবার আগেই মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—আজ কি আর ওঁরা বাড়ী ফিরতে পারবেন? কাল সকালে যাবেন, তখন আমিও না হয় যাবো তোকে নিয়ে···কিন্তু ইন্দ্রজিৎ, তুমি এই রাত্রে বন-জঙ্গল ভেঙে নাইবা গেলে আজ পাহাড়ে? কাল সকালে যেও।

—আমায় যেতেই হবে—বলে ইন্দ্রজিৎ লকুকে শুধুলো,—কোথায় বাড়ী আপনাদের?

ঐ নদীর ওপারে···গ্রামের নাম বললো লকু, তারপর বললো ইন্দ্রজিতকে, —ওখানে আপনার গুরুদেব থাকেন—আমার ঐ জ্যেঠামশায়েরই গুরুভাই তিনি, তাঁকে বলবেন,—আজ উনি দেহ রক্ষা করেছেন; আর বলবেন যে উনি মৃত্যুকালে আমাকে মন্ত্র দিয়ে গেছেন—জীবনাধিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সহস্র মৃত্যুর মধ্যেও। বাঁচাবার অমৃত সঞ্চিত আছে আমাদের সাহিত্যে, আমাদের জাতীয় মহাকবিদের সঙ্গীতে। আমাদের নেতাদের জীবন-দানের মহিমায়।

—সাহিত্যে আর সঙ্গীতে?—ইন্দ্রজিৎ সবিস্ময়ে শুধুলো!

—হ্যাঁ। জগতের যে কোনো জাতিকে জাগিয়ে রাখে তার সাহিত্য। সহস্র মৃত্যুর মধ্যেও··· তাকে অমর করে রাখে। পরাধীন, নির্জ্জীব, ক্লীব, পঙ্গু জাতির যদি কোনো দিন আবার সবল সুস্থ হবার আশা থাকে তো সে তার সাহিত্যের মধ্যে। জাতির সাহিত্য যেদিন সবল-সুস্থ-সুন্দর, ঋজু

দীপ্ত, জলন্ত হয়ে উঠবে, মানুষের ব্যথা-বেদনার আঘাতে সহস্র বজ্রঝন্‌ঝনা বাজিয়ে দেবে, জাতির মুক্তি আসবে সেইদিন।

—কিন্তু ভারতের সাহিত্য খণ্ডিত। বাংলা সাহিত্য শক্তিশালী কিন্তু অন্ত প্রদেশ হিন্দি-গুজরাটি-তামিল-তেলেগুকে নিয়ে মাতামাতি করছে। কেউ কেউ আবার "হিন্দুস্থানী" নামে কি এক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্ম সচেষ্ট আছেন।

—তাতে ক্ষতি হবে না। যে সাহিত্য সত্যই উন্নত, তার প্রভাব অন্ত অনুন্নত সাহিতের উপর পড়বেই। তাতেই গড়ে উঠবে একটা সর্ব্বভারতীয় সাহিত্য-প্রভাব। আজই দেখুন না, বাংলার জাতীয় সঙ্গীত সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে, বাংলার শক্তিশালী সাহিত্য ভারতের সব সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, জাতীয়তার প্রেরণা যোগাচ্ছে; তবে ভারতে এক ভাষা হলে আরো সুবিধা হোতো।

—গুরুদেব বলেন, ভারতের ধর্ম্মমত আজো এক, যে ধর্ম্ম সৎ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম জাতিত্বে গণ্ডীবদ্ধ নয়, প্রাদেশিকতায় সঙ্কীর্ণ নয়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় খর্ব্ব নয়।

—আপনার গুরুদেবের কথা আমি জ্যেঠামশায়ের কাছে শুনেছি। তিনি যে পথ গ্রহণ করেছেন, জ্যেঠামশায়ের পথ তার বিপরীত নয়, সমান্তরাল এবং লক্ষ্যাভিমুখী। বেশ তো, আপনার গুরুদেবের মতেই আপনারা চলুন—আমাদের গুরুদেবের মতে আমরা চলি।

—সেই ভালো। বলে ইন্দ্রজিৎ তার সঙ্গের লোকটাকে বললো,

—তোমার সুবোধ বাবুর বাড়ী আর আমার যাবার সময় হবে না—ঐ তো ব্রিজ দেখা যাচ্ছে—আমি চল্লুম।

ব্রিজের উপর একখানা ট্রেণ আসছে, তারই আলো ইন্দ্রজিৎ দেখতে পেয়েছে। লকু বললো,—আচ্ছা যান আপনি, ওর ব্যবস্থা আমরা করছি। ইন্দ্রজিৎ চলে যাচ্ছে, রাণী খোকাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ইন্দ্রজিতকে

বললো,—চিনতে পারছো বাবু? সিদিন যে খিচুড়ি খায়াইলোম, ঐ উনি আর তুমি…

ওঃ! তাহলে এই মৃতব্যক্তি সেই বৃদ্ধ! ইন্দ্রজিৎ এতক্ষণ যেন ভুলেই ছিল মৃত কে, তা জানবার কথাটা। চমকে উঠলো ইন্দ্রজিৎ! চোখ থেকে জল নেমে এলো,—উনি—মুক্তিসাধনার সেই মহাতাপস দেহরক্ষা করলেন আজ! হে মা ভারতজননি!

ইন্দ্রজিৎ চিতার আলোকে তাকিয়ে রইলো মৃতদেহের পানে। স্বাহা এগিয়ে এসে বললো,—আপনি কি চিনতেন বাবাকে? ওঁর সঙ্গে জেলে ছিলেন নাকি?

—না দিদি, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি! একদিন ওঁর আশ্রমে অতিথি হয়েছিলাম—বলেই ইন্দ্রজিৎ ফটোগ্রাফারকে বললো—নিরন্ন বাংলার ছবি তো বিস্তর তুলেছেন মশায়, এই মহামানবের চিতাশয্যার একটি ছবি তুলে দেবেন আমায়? ফ্লাস্‌লাইট্ আছে?

—আছে। কিন্তু ক্যামেরা তো রেখে এসেছি ওঁর বাড়াতে—বলে সে তালুকদারকে দেখিয়ে দিল।

স্বাহা ইন্দ্রজিতের মুখের করুণ অবস্থা দেখে হাসলো একটু, সান্ত্বনার সুরে বললো,—দুঃখ করো না ভাই, ঐ রক্তজবা ফুল নিংড়ে রস বের করে আমি ওঁর পায়ের ছাপ তুলে নিচ্ছি।

ইন্দ্রজিৎ আশ্বস্ত হোলো, বললো—তুমি ওঁর মেয়ের মত কথাই বললে দিদি—রক্তজবার রস নিংড়ে মুক্তিসংগ্রামে রক্তাক্ত এই বীরের পদচিহ্ন আমরা তুলে নিই,

"সেই পদচিহ্ন ধরে অন্য কোনোজন পরে
ভবিষ্যতে হইবে অমর,"

কাবেরী তার শাড়ির আঁচলে অনেকগুলো জবা ফুল ভরে চট্‌কে চট্‌কে রস বার করে দিল—তরল, তাজা রক্তের মত জবারস। স্বাহা সেই রস তাঁর পায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে, চিতার আগুনে মনে হোচ্ছে—রক্তের পথ বেয়ে যেন যাত্রা

করছেন ঐ মহাসাধক মুক্তির সংগ্রামক্ষেত্রে! ইন্দ্রজিৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলো—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে!"

অগ্নির লেলিহান শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো শ্মশানভূমি, নদীর বালুবেলা, তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ স্রোতস্বিনী। সাধকের মৃত মুখখানি যেন জীবিত হয়ে উঠেছে—হাস্যময় সেই তাপস-মুখকান্তি অগ্নিশিখায় জ্বল জ্বল করছে—অগ্নি বিদীর্ণ করে যেন বেরিয়ে আসছেন মুক্তির দূত! কাবেরী আবার সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলো,

"ভেঙেছে দুয়ার—এসেছো জ্যোতির্ময়! তোমারই হউক জয়!"

খোকাকে কোলে নিয়ে বাপী এসে দাঁড়ালো—টুকটুকে চোখে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটা চিতার পানে। কাবেরী ছুটে গিয়ে ওকে বুকে তুলে নিয়ে আবার জয়ধ্বনি করে উঠলো—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হউক জয়"!

উদয়-সূর্য্যের আলো-ঝলমল আকাশ। তৃণে তৃণে শিশিরবিন্দু মুক্তার দ্যুতি বিকীর্ণ করছে। শান্ত-সমাহিত পল্লী-পথে জনতার মিছিল—নীরব—কিন্তু সচল। স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে যেন প্রাবৃটমেঘের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষের মত সেই চলমান জনস্রোতের পদকল্লোল। ওরা চলেছে মহামানব দর্শনে। বাংলার এই কর্ম্মকেন্দ্রে তিনি এসেছেন—ভারতের জনগণের একছত্র নেতা—যাঁর পবিত্র প্রভাবে ভারতভূমি আজ দীর্ঘ পঞ্চবিংশতিবর্ষ স্বরাজ্য-সাধনায় রত আছে। যাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর অন্তর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে—চক্ষে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়—সেই মহামানব এসেছেন—তাঁকে দর্শনের পুণ্যলাভ থেকে কেউ-ই বঞ্চিত থাকতে চায় না।

বিরাট-মানবস্রোত সমবেত হচ্ছে একটা মাঠের চারদিকে। এইখানেই তিনি এসে দাঁড়াবেন—প্রার্থনা কোরবেন—ভারতের স্নেহ-প্রীতি-মৈত্রীর জীবন্ত রূপ—অহিংসা আর আত্মত্যাগের মুর্ত্তিমান বিগ্রহ—জাতীয় মুক্তিসাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত। ভারতের জাতীয়তাবাদী মুক্তিকামী কোটি কোটি মানবের পূজার্হ এই দেবমানব কটিবস্ত্রপরিহিত, শীর্ণকঙ্কাল, উন্নতনাসা এবং আয়তচক্ষু। আশ্চর্য্য রহস্যমধুর তাঁর মৃদুহাস্যচ্ছটা। সে হাসি মানবজগতে সুদুর্লভ—দেবজগতেও হয়তো দুর্লভ—তিনি এসে দাঁড়ালেন।

সমবেত জনতা সমস্বরে জয়গান করলো—স্তুতি-নতি নিবেদন করলো। তাদের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেই দেবরূপ দর্শনেই। কবি বাঙালী, কর্ম্মী বাঙালী, ত্যাগী-তপস্বী বাঙালী তার অন্তর উজাড় করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলো তাঁর পায়ে। উনি প্রার্থনা আরম্ভ করলেন—আর সমবেত সকলে সেই ধ্যানস্তব্ধ মুর্ত্তিরই ধ্যান করতে লাগল।

প্রণাম শেষ করে উনি সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বলতে আরম্ভ করলেন—"প্রিয় বন্ধুগণ, প্রার্থনা মানব জীবনকে মহৎ, সুন্দর অকপট করে। প্রার্থনায় মানুষের অন্তর শুদ্ধ হয়,—শৌচ, ক্ষমা, ত্যাগ এবং তপস্যার শক্তি সঞ্চিত হয়—সাম্য, মৈত্রী, প্রীতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। প্রার্থনা তাই মানুষের জীবন-ধর্ম্মে এত বড় স্থান অধিকার করে আছে। প্রার্থনা দ্বারাই তাই মানুষে মানুষে একতা, একপ্রাণতা, একজাতিত্ব স্থাপন করা সম্ভব। সমবেত এই প্রার্থনাই সারা ভারতের মানব-সঙ্ঘের একত্বের নিদর্শন, আকাঙ্ক্ষার একত্রিত আবেদন। এর দ্বারাই সারা ভারতের সব সম্প্রদায়ের মানুষ এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিতে পরিণত হোতে পারবে;—ব্যক্তিগত স্বাধীনত্ববোধ রাষ্ট্রগত স্বাধীনতালাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় উদগ্র হয়ে শাসক-শক্তিকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। জাতির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠবে—আমরা ভারতীয়—আমরা একমাত্র ভারতীয়। আমাদের ধর্ম্ম ভারতের স্বাধীনতা লাভ, কর্ম্ম ভারতের শক্তিবর্দ্ধন, ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা, ভারতের মঙ্গলবিধান!…

উনি থামলেন। সমবেত মানবসঙ্ঘ আর একবার জয়ধ্বনি করে উঠলো—
—জয় হিন্দ্...বন্দে মাতরম্!

ইন্দ্রজিৎ একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বহুদিন থেকেই সে প্রার্থনা ক'রে আসছে—কিন্তু প্রাণমনে সে বিশ্বাস করে না, ধর্ম্ম আর প্রার্থনাতেই ভারত স্বাধীন হবে। তার গুরুদেবের আদেশ সে পালন করছে কিন্তু তার মন সে আদেশের উপর নিষ্ঠাবান নয়। ইন্দ্রজিৎ তাই দেখতে এসেছিল ভারতের এই অবিসম্বাদী নেতাকে; শুনতে এসেছিল কি তিনি বলেন, কোন্ পথ তিনি দেখান। আর্য্য ঋষিদের সেই সনাতন বাণীই তিনি বললেন—সেই চির-পুরাতন কথা, যে-কথা শত সহস্রভাবে উদ্গীত হয়েছে ভারতের তপোবনে এবং যে-কথা ইন্দ্রজিতের শ্রীগুরুদেব বারম্বার বলেছেন ইন্দ্রজিতকে। নিষ্ঠাহীন ইন্দ্রজিৎ গুরুর আদেশ পালন করছে, কিন্তু সে-কাজ নিতান্তই না করলে নয় বলে। অর্থাৎ গুরুর আদেশ পালন করা ছাড়া অন্য কিছু করার পথ সে পায়নি বলেই। কিন্তু অমন নিষ্ঠাহীন হয়ে তো গুরুবাক্য পালন করায় কোনো লাভ নেই। ইন্দ্রজিৎ নিজকে অপরাধী মনে করছে। মনে পড়লো উপনিষদের কথা, "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ, প্রাপ্যবরাণ নিবোধতঃ"—ওঠো, জাগো, তোমার প্রাপ্য আদায় করে লও—এই মহাবাণী ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো কোন্ সুদূর অতীতে, আজ আবার সেই সত্যবাণীকে মানুষের কানে মন্ত্ররূপে জাগ্রত করতে হবে।

"জয় হিন্দ্" অপর একজন বক্তা উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।

এঁরা সবাই ভারতের মুক্তিসাধনব্রতী সৈনিক—রথী, মহারথী ইস্পাতের আয়ুধ বা এ্যাটম্ বোমের মারণাস্ত্র এঁদের নাই,—তবু এঁরা যোদ্ধৃদল—এঁদের আধ্যাত্মিক অস্ত্রপ্রভাব সারা পৃথিবীকে চকিত-চমকিত করে দিচ্ছে। ঐ যে কটিবসন-পরিহিত ক্ষীণকায় দৃপ্তচক্ষু মানুষটি—উনিই সারা ভারতের চল্লিশকোটি জনগণের ইষ্টদেবতা—ভারতমাতার "ইচ্ছা" রূপে আবির্ভূত মানবক! ইন্দ্রজিৎ কল্পনানেত্রে দেখতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ নরনারীর সম্মুখে উনি, আবার ভারতের

স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ভাগ্য-বিধাতা লাট-বড়লাটের সম্মুখে উনি—গোলটেবিল-বৈঠকের পুরোভাগে উনি—আবার হরিজনদের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষুক উনি—ঐ কটিবাস পরিহিত ক্ষীণ মানবক! ওঁর মত্ এবং পথ ভারতবাসীর শুধু আদর্শ নয়, একমাত্র অবলম্বন। ইন্দ্রজিৎ মাথা নোয়ালো শ্রদ্ধাভরে—দুটি চোখে তার টলটলায়মান জলবিন্দু—আপনার মনে বললো—হে যুগমানব, তোমায় বারম্বার নমস্কার করি।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের নিজের কাজ কিছুই করা হচ্ছে না। মন্বন্তর কয়েক লক্ষ লোককে নিয়ে গেছে কিন্তু তার ক্ষত রেখে গেছে দেশের সর্ব্বত্র। দেশের সমাজ-জীবন আবর্ত্তপঙ্কিল,—একশ্রেণীর মানুষ ইনফ্লেশনে স্থুলোদর আর একশ্রেণীর মানুষ অন্ন এবং বস্ত্রাভাবে বিশীর্ণ! এই উৎকট অবস্থা দূরীকরণের যে হাস্যকর প্রয়াস অবলম্বিত হয়েছে তার পরিণাম দেখা যাচ্ছে সারিবন্দী নরনারীর "কিউ" এ এবং বস্তাবন্দী মালের ব্ল্যাকমার্কেটে! মানুষের জীবনকে সুস্থ এবং স্বস্থ করবার,—সমাজ জীবনকে পুনর্গঠিত করবার বিস্তর বুলি ঝঙ্কৃত হচ্ছে বড় বড় ঠাকুরেদের মুখ থেকে—কিন্তু কবে সেসব বুলি কাজে লাগবে, কে জানে!

ইন্দ্রজিৎ ঊর্দ্ধ আকাশের পানে চাইলো একবার। জীবজগতের জীবনদাতা ভাস্বর বিবস্বান দীপ্ত গরীমায় সুপ্রকাশিত হচ্ছেন এই প্রাচ্যভূমির পটমণ্ডপে; জীবনের ধারক উনি—বিধাতা উনি, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি… ইন্দ্রজিৎ নমস্কার করলো—হে প্রাচ্যভূমির প্রথম বন্দিত দেবতা—হে ঋক-সাম-যজুর্বেদের অধিদেবতা, হে মানব জীবনের মারী-ক্ষয়-কুষ্ঠের আরোগ্য-দেবতা, হে শান্তির সামমন্ত্রের উদ্গাতা, আমাদের ঐ ক্ষীণকায় বৃদ্ধ প্রাণের ঠাকুরটিকে অটুট আয়ু দান কর—ভারতের ভাগ্যাকাশে উনি তোমারই মত দৃপ্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকুন!

ইন্দ্রজিৎ অবনত শিরে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে আসছে—বিহারীনাথ পাহাড়ে আজ তাকে যেতে হবে। যুদ্ধ নিবৃত্তির সঙ্গে জনগণের অন্তরে এক

অদমনীয় তারুণ্যের জোয়ার জেগেছে—জেগেছে ভারতের যুবশক্তির এক ক্ষুদ্রতম অংশ। ক্ষুদ্র কিন্তু মহৎ;—সমগ্র ভারতবাসীকে ভারতীয় করবার সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত এক বীর যুবকের অপরিমেয় গঠনশক্তি, অদমনীয় ইচ্ছাশক্তি আর অফুরণীয় কর্ম্মশক্তির উত্তাল তরঙ্গ আজ সারা ভারতের জনসমুদ্রকে উত্তেজিত করে তুলেছে! সেই যুবক যেন বীরশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পুনরাবির্ভাব! দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে বন্দনা-গান তাঁর উদ্দেশে—তাঁর আলোকচিত্র আজ ভারতবাসীর পূজার সামগ্রী—ইন্দ্রজিৎ তাঁর উদ্দেশেও প্রণতি নিবেদন করে ধীরে ধীরে জনতা থেকে দূরে চলে এল—তারপর কলকাতায়।

তাকে যেতে হবে বিগারীনাথ পাহাড়ে, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করছে। এ ক্লান্তি মানসিক—এ ক্লান্তি নিজের মতবাদের উপর নিষ্ঠুর আঘাত থেকে উদ্ভূত ক্লৈব্য। অহিংসা আর অসহযোগে অবিশ্বাসী ইন্দ্রজিৎ আজ অহিংসার মূর্ত্তশ্রীকে চাক্ষুষ দেখেছে—স্বকর্ণে শুনেছে তাঁর তেজোদৃপ্ত গভীর বাণী এবং অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা, সুমহান ত্যাগ আর সুকঠোর তপস্যা। ইন্দ্রজিতের স্বকল্পিত মতবাদ আজ হারিয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজালে। স্বদেশের শ্রেয়লাভের জন্য স্ব-মতবাদকে পরিত্যাগ করতে ইন্দ্রজিতের কিছুমাত্র বাধবে না, কিন্তু এতদিনের পুরানো মনটাকে নূতনভাবে গঠন করবার চেষ্টায় সে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে।

ভাবতে লাগলো, আর কোনো পথ কি নাই? অহিংসা, অসহযোগ নিশ্চয় খুবই ভাল অস্ত্র—"ভারত পরিত্যাগ কর" অবশ্যই ভারতের অন্তরের একমাত্র বাণী-রূপ কিন্তু ওদেরকে ভারত পরিত্যাগ করাবার জন্য চরকাই কি যথেষ্ট? সাম্য, মৈত্রী, প্রীতির মধ্যে স্বরাজ-সাধনার বীজ রয়েছে, কিন্তু সেই সাম্য-মৈত্রী,প্রীতি-বন্ধন কাদের সঙ্গে হবে? অন্নহীন দুঃভিক্ষপীড়িত দেশের বস্ত্রাভাবে নগ্ন নরনারী—"ল এণ্ড অর্ডারের" যূপকাষ্ঠে রক্তাক্ত দেশসেবক, মদমত্ত পশ্বাচারের কবলে ধর্ষিতা অসহায়া নারী—আর আইন ও শৃঙ্খলা উদ্যত-

কৃপাণ সাম্রাজ্যরক্ষীর মধ্যে সাম্য-মৈত্রী-প্রীতি কি ভাবে সম্ভবে? ইন্দ্রজিৎ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের মিল খুঁজে পাচ্ছে না—কিন্তু ওর ক্লান্তিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে—চলতে হবে এগিয়ে—মনে পড়ে গেলো ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপদেশ :

"চরণ বৈ মধু বিন্দাতি চরণ স্বাদু মুদুম্বরম্।

সূর্য্যাস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥ চরৈবেতি চরৈবেতি।"

চলাতেই অমৃত লাভ হয—গতিই হোল সুস্বাদুফল—ঐ যে সূর্য্যের আলোক-লেখা—ও সৃষ্টির আদিম দিন থেকে চলছে, এক মুহূর্ত্তও ঘুমিয়ে পড়ে নি—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—ভারতকেও এগিয়ে যেতে হবে। যুগার্জ্জিত সাধনার বাণী বহন করে এগিয়ে চলবে ভারত—চরাতি চরতো ভগঃ—যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে।

চলতে হবে—চলতে চলতেই পথেরও সন্ধান মিলবে। ইন্দ্রজিত ধীর দৃঢ়পদে হাঁটতে লাগলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজওয়ালারা চেঁচাচ্ছে—"জয় হিন্দ্" ! সুভাষচন্দ্রকি জয়—নেতাজিকী, জয়—"আজাদ-হিন্দ-বাহিনী'র পূর্ণ পরিচয়। ইন্দ্রজিৎ দেখলো, আজকার কাগজখানা নতুন ধরণের, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তার শিরোভাগে, আর সেই পতাকার স্নিগ্ধ পরিবেষ্টনীতে একখানি চির পরিচিত সুন্দর মুখ! অমিত বিক্রম সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মতই জ্যোতির্ম্ময়! সুদৃঢ় ওষ্ঠে তাঁর দুর্জ্জয় সঙ্কল্প আর আনত চক্ষে অগ্নিস্রাবী আকাঙ্খা! ইন্দ্রজিৎ দু'আনা দিয়ে একখানা কাগজ কিনে নিল।—"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়—" সেই বাঙলার বীর সন্তানের বিপুল গৌরব বহনকারী এই দু' আনা দামের কাগজখানি ইন্দ্রজিৎ সর্ব্বাগ্রে মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করলো— ভারতমাতার মানসপুত্র! দীর্ঘ সহস্র বৎসর পরে তুমি এসেছো—তোমার বন্দিত্বের শৃঙ্খল আজ মুক্তির অগ্নিশিখায় অরুণবর্ণ, সুদূর প্রাচ্য গগনের হে নবোদিত ভাস্কর, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-শিখের সমবেত বন্দনায় তোমার বিজয়-মাল্য নন্দিত হোক—সমগ্র ভারতের একত্রীভূত

আশীর্ব্বাদে তোমার মুক্তিসাধনার ধনুর্ব্বেদ অভীমন্ত্রিত হোক—নেতাজী সুভাষচন্দ্র পানিবন্ধেষু!

ইন্দ্রজিৎ উচ্ছ্বাসটী দমন করলো। আজই সে ভারতের শ্রেষ্ঠ মহামানবকে দেখে এসেছে—মহত্বে, ত্যাগে, তপস্যায় যে মানব শুধু ভারতের আদর্শ নন—সারা পৃথিবীর শান্তিমন্ত্রের মূর্ত্তরূপ;—কিন্তু পৃথিবী সে শান্তিমন্ত্র গ্রহণ করবে সেইদিন, যেদিন ক্ষমতাগর্ব্বী রাজশক্তিনিচয় নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে—সাম্রাজ্যবাদীর যূপকাষ্ঠ যেদিন গণতন্ত্রের যজ্ঞকাষ্ঠে পরিণত হবে—আর সেই দিনকে নিকটতর করবে ভারতের এই বীরসন্তানের দল—যারা সুদূর বিদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন.করতে চেয়েছিলো। হাজার বছরের পরাধীন ভারতের বিস্মৃতিকুণ্ডে নিমজ্জিত বীরত্বকে সে বাহিনী পুনর্জাগ্রত করেছে—সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে 'রাজদ্রোহী' আখ্যা দিলেও সে যে দেশের "প্রাণস্পন্দন" তা এই তুচ্ছ কাগজের উপর অগণ্য জনগণের অপরিমেয় শ্রদ্ধা দেখেই বোঝা যায়।—ভারতের ঐ বীরবাহিনীর পথ যাই হোক—লক্ষ্য তাদের ভারতের মুক্তি, তাই ওরা প্রত্যেকে আমাদের নমস্য!

ইন্দ্রজিৎ দু'পাশের অগাধ জনসমুদ্র আর উজ্জ্বল-উচ্ছল ধ্বনি শুনতে শুনতে ষ্টেশনে এল। জাতীয় জীবন যে এই একটা ব্যাপারে কতখানি এগিয়ে গেছে—নিরক্ষর নিরন্ন ভারতের কোটি কোটি জনগণের অন্তরে আজ রাজনৈতিক চেতনা কী তীব্রভাবে জাগ্রত হয়েছে —তা বুঝতে আর মুহূর্ত্ত সময় লাগে না। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ভাবতে লাগলো—আজ যে মহা-মানবকে সে দেখে এলো, শ্রদ্ধার প্রণাম নিবেদন করে এলো, তিনি এই জাতীয় জাগরণটাকে কি চোখে দেখছেন? সুদীর্ঘকাল কারাপ্রাচীরে ছিলেন তিনি—বাঙলায় মন্বন্তর, বস্ত্রাভাব, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ক্ষয়, সংস্কার"সংস্কৃতির বিলোপ তিনি কারাগারে বসেই শুনেছেন, কিন্তু তারপর মুক্তিলাভ করেও তো বহুদিন বাঙলায় আসবার তাঁর অবসর হয় নি! আজ যখন ভাঙনের পালা শেষ হয়ে গেছে—যখন জীবনের সুর অন্নবস্ত্রের অভাবে রুদ্ধ হয়ে শ্বাসকষ্টে কাঁপছে,তখন তিনি এলেন

বাঙলায় এসেই বললেন, "বাঙলার মৃত জনগণের জন্য তিনি সমবেদনা জানাতে এসেছেন—পল্লীকে পুনর্গঠিত করতে এসেছেন। এরকম আরো অনেক কথাই বললেন, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি এবং আত্মচেতনার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র গণ-সাহিত্য সে বিষয়ে তিনি কিছুই বললেন না। বাঙালীর সাহিত্য যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সাহিত্য, ভারতের সর্ব্বাধিক লোকের কথিত সাহিত্য এবং ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের মানুষের প্রিয় সাহিত্য এ সত্য তো তাঁদের না জানবার কথা নয়। তবু ওঁরা হিন্দুস্থানী নামক কি এক অদ্ভুত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান—যার জন্য অল্পকিছুদিন পূর্ব্বে বহু অর্থ দান করা হয়েছে। আবার ঐ হিন্দুস্থানী ভাষা শেখবার জন্য দুই রকম অক্ষর জ্ঞান দরকার হবে—সে ভাষাকে গড়তে হবে, শক্তিশালী করতে হবে—তবু সেই ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবে—বাঙলায় এসে এই কথাই ওঁরা বললেন—অথচ বাঙালীর গৌরব তার ভাষা, তার সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের মহাকবি মহামানব গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ—তবু ওঁরা বাঙলা ভাষার কথাটা একবার ভেবে দেখলেন না;—কেন? প্রয়োজন হলে হিন্দি অক্ষরে বাঙলা ভাষা মুদ্রিত করে অথবা রোমান অক্ষরেও মুদ্রিত করে বাঙলাকে তো অনায়াসেই রাষ্ট্র ভাষা করা যায়। কিন্তু এ-কথা বলবার মত লোক কি কেউ নাই? বাঙালী দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, মহামারীতে, হাজার হাজার টাকা দান করে, বড় বড় নেতাদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার তোড়া দিয়ে খবরের কাগজে নাম ছাপায়, কিন্তু তার ভাষা প্রচারের জন্য কেউ একটা পয়সা দিয়েছে বলে ইন্দ্রজিৎ শোনে নি। ভারতের জাতীয় জীবনে বাঙলা-সাহিত্যের অবদান অপরিমেয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেত্রীবর্গ সেকথা ভেবে দেখবার অবসর পান না।

মনে পড়লো—সেই বৃদ্ধ বলেছিলেন—যে জাতির সাহিত্য জীবিত থাকে, সে জাতি অমর—যে জাতির সাহিত্য মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা, সে জাতি মুক্ত হবেই। সাহিত্যই জাতিকে উজ্জীবিত রাখে, অনুপ্রাণিত করে, অবিচল নিষ্ঠায় মৃত্যুবরণ করতে শেখায়—যা মহৎ, যা বৃহৎ, যা কিছু গরীয়ান, সাহিত্য তারই

দিকে নিবদ্ধ রাখে জাতির দৃষ্টি। ভারতের জাতীয় সাহিত্য যদি এক হয়—যদি এক ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয় জাতীয় ভাবধারা, তাহলে জনশক্তি আরো শক্তিশালী হতে পারে—এই জন্যই রাষ্ট্রভাষার এত বেশি প্রয়োজন ;—কিন্তু সে কাজ কি হিন্দুস্থানী নামক এক নবজাত ভাষা দ্বারা সম্ভব হবে? ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস করে না ;—কিন্তু ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানেতাগণ ঐ হিন্দুস্থানীকেই রাষ্ট্রভাষা করাতে চান—কে জানে ওঁরা কি জন্য একথা বললেন।

ইন্দ্রজিৎ গাড়ীতে উঠলো। একজন প্রৌঢ়া নারী বেঞ্চের এক কোণে বসেছিল সর্ব্বাঙ্গ গুটিয়ে---ইন্দ্রজিৎ চেয়ে দেখলো, মেয়েটির পরণে একখণ্ড গামছা, তাও ছেঁড়া—লজ্জা নিবারণের জন্য সে সর্ব্বাঙ্গ গুটিয়ে বসেছে, চোখ দুটি জলে ভর্ত্তি। ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞাসা করলো—কাঁদচো কেন মা? কি হোলো?

আরো বেশি কাঁদতে লাগলো মেয়েটি। অতি কষ্টে ইন্দ্রজিৎ জানতে পারলো, বস্ত্রাভাবে ওর অষ্টাদশী পুত্রবধূ উদ্বন্ধনে মরেছে এবং বিংশবর্ষের সন্তান-সম্ভবা কন্যার জন্য সে কাপড় কিনতে কলকাতায় এসেছিল—না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। গিয়ে হয়তো দেখবে—সে কন্যাও জীবিত নাই।

কোন্ দেশে এমন হয়? কোন্ সভ্য রাজতন্ত্র প্রজার লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে না? বিংশ শতাব্দির পৃথিবীর ইতিহাসের এই কলঙ্ক-কাহিনী আগামী শতাব্দির মানুষরা কি চোখে দেখবে? মানুষকে এইভাবে নির্জ্জীব করে, নির্বীর্য্য করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি? শাসন যন্ত্রের পেষণের চক্রতলে—আর কোথায়? মহাত্মাজী বাংলার ধ্বংসমূর্ত্তি দেখতে এসেছেন—দেখে যান, অরবিন্দ, রবীন্দ্র, সুভাষের বাংলা উলঙ্গ ভিক্ষুক। কিন্তু তিনি শুধু দেখেই যাবেন—অহিংসা এবং অসহযোগের বাণীবাহী বিরাট পুরুষ তিনি—হরিজন তহবিলের জন্য স্বাক্ষর বিক্রয় করেও অর্থ সংগ্রহ করেন—কিন্তু কে সেই হরিজন? হরিজন যে সারা ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী! একথা বজ্রঝঙ্কারে একবার তাঁকে বলবে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ ;—সারা ভারতটাই আজ হরিজন হয়ে গেছে।

জীবন দেবতার ক্রুদ্ধ গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে—মন্বন্তরের মহাশ্মশানে বাংলা-মা স্তব্ধ। বাঙালী-জীবন স্তিমিত হয়ে ধুঁকছে রেশনের দোকানে সারীবন্দী হয়ে। কিন্তু আশ্চর্য্য একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে আজকাল—বড় বড় মোটর-ওয়ালাদের গাড়ীর মাথায়, আর বড় বড় বাড়ীর মাথার চূড়ায় একটা করে জাতীয় পতাকা! যারা জীবনে কোনো দিন জাতীয়তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি—তারা আজ অকস্মাৎ এত বেশি জাতীয়ভাবাপন্ন হয়ে উঠলো কেন? ব্যাপারটা বুঝে ওঠা দায়।

কংগ্রেস-নেতারা মুক্তি পাচ্ছেন হোমিওপ্যাথী-ডোজে—অমনি হাজার হাজার টাকার তোড়া উপহার পড়ছে তাঁদের হাতে। উপহার দিচ্ছে তারাই যারা জীবনে কোনো দিন কংগ্রেস কি পদার্থ, ভেবে দেখেনি—আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! ঠিক সেই সময় "অজাদ-হিন্দ-ফৌজ-এর রোমাঞ্চক কাহিনীর বার্ত্তা এসে পৌছাল দেশে—স্তব্ধ, স্তিমিত জাতির মুমূর্ষু জীবনে যেন আকস্মিক বন্যা নেমে এলো—এবার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ টাকার তোড়া পড়তে লাগলো উপঢৌকন! ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে লোকাধীশ হিম-সিম্ খেয়ে যাচ্ছে।

স্বাহা বলল—কি অত ভাবছো ঠাকুরপো? তোমার দাদার ছাড়া পাওয়ার কথা?

—না বৌদি, দাদা হয়তো এবার ছাড়া পাবেন—কিন্তু আমি ভাবছি, ভারতবাসী চারদিক থেকে টাকার তোড়া ছুঁড়ে মারছে নেতাদের উপর! এর কারণ কি বৌদি? ইনফ্লেশ্‌নে টাকা না হয় কিছু হয়েছে, কিন্তু রাজ-নৈতিক চেতনা কি সত্যিই বেড়েছে দেশের লোকের যাতে এই বিরাট দান?

স্বাহা হাসলো মৃদু। তারপর গুড় আর জল লকুর পানে এগিয়ে দিয়ে বললো—যারা মোটা মোটা তোড়া দিচ্ছে তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগবার তো কিছু দরকার নেই ঠাকুরপো, তারা সুবিধাবাদী—চোরাবাজারের কারবারে

যারা কোটি টাকা কামালো, তারা এবার কিছু যৎকিঞ্চিৎ দান করে জাতে ওঠবার চেষ্টায় আছে—তাই অত বেশী ত্রিবর্ণ পাতাকা বিক্রী হয় আর অত অত টাকার তোড়া। ঐ সব স্বজাতিদ্রোহী মুনাফাখোররা বুঝতে পেরেছে যে দেশের গণশক্তি জাগ্রত। ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করলে ওদের ফাঁসী কাঠে ঝোলাতে পারে—তাই ওরা সময় থাকতে সাবধান হচ্ছে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে।

—তা হোক বৌদি, গণশক্তিও তো সজাগ হয়েছে, নাকি মনে হয় তোমার?

—হ্যাঁ—শুধু জেগেছে নয়—অগ্নিময় হয়ে উঠেছে আত্মধিক্কারে, আত্মাবমাননার জ্বালায়। শুধু ভারতের গণশক্তি নয় ঠাকুরপো, সমস্ত এশিয়ার গণশক্তি আজ সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্লীবত্বের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছে। আর অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদীর দল এই গণজাগরণকে চূর্ণ করবার জন্য একত্রীভূত হচ্ছে।

—তুমি ঠিক বলেছো বৌদি, কিন্তু আমি ভাবছি ভারতের এই আকস্মিক গণ-জাগরণের কথা!

—আকস্মিক নয়। কংগ্রেস গান্ধিজীর নেত্রীত্বে অনলকুণ্ড প্রস্তুত করে আসছেন আজ পঁচিশ বছর ধরে—আর সেই অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিল আজাদ-হিন্দ ফৌজ—কংগ্রেসের অর্দ্ধশতাব্দির ইতিহাসে যা হয় নাই, নেতাজি সুভাষচন্দ্র সেই এক ভারতীয়ত্ববোধ মাত্র দুই বছরে জাগ্রত করেছেন। তাঁদের মত এবং কার্য্য নিয়ে যতই বিচার-প্রহসন চলুক—ভারতের এই বর্ত্তমান জাতীয়তাবোধের মূলে তিনি। এত বড় কাজ ভারতের কোনো নেতাই করতে পারেন নি।

সেঁজুতি এসে পৌছালো, হাতে একবোতল কেরাসিন তেল। লকু দেখে বললো—কোথায় পেলি? ব্ল্যাকমার্কেট?

—না লকুদা—রেশন থেকেই। জান, লাইন দিয়ে সবাই দাঁড়িয়েছিলাম, আজ আবার একজন ইন্‌স্পেকটার এসেছে—আমার দিকে এমন আড়নয়নে চাইছিল লোকটা যে মনে হচ্ছিল, ঠাস্ করে একটা চড়্ মেরে দিই।

কিন্তু দেখলাম, ও আমাকে খুব খাতির করে অতখানা তেল দিইয়ে দিল—আমার চেহারাটা বেশ ভাল হয়েছে আজকাল—না বৌদি?—সেঁজুতি হাসতে লাগলো।

—ফ্লার্ট করতে শিখছিস সেঁজুতি?—লকু কড়া স্বরে প্রশ্ন করলো। সেঁজুতি হেসেই বললো—একটু একটু! ওদের চিনে রাখতে হবে লকুদা, বাংলার ঐ নারালোভী কুকুরদের চিনে রাখা দরকার—সাহিত্যের জন্য, সমাজের জন্য, স্বরাজের জন্য। ওরা কি ভাবে, জানো লকুদা? ওদের চালাকীটা আমরা ধরতে পারবো না মনে করে—এতই আমরা বোকা?

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল সবাই, অকস্মাৎ সেঁজুতিই বলে উঠলো লকুর উদ্দেশে—তুমি যাবে তো শান্তি-নিকেতন? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল লকুদা—মহাত্মাজীকে দর্শন করে আসি।

—বড্ড ভীড় হবে। তিনি অনেকদিন পরে বাংলায় এসেছেন—বহু লোক দর্শনপ্রার্থী হবে।

—হোক না—বহু লোকের আমিও একজন। তাহলে আমি তৈরী হচ্ছি গে। কেমন?

সেঁজুতি উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেলো। স্বাহা ছেলেটাকে তুলে বললো—একেও নিয়ে যাও ঠাকুরপো—পারবে না?

—হ্যাঁ, নিয়ে যাব। আর তুমিও যদি যেতে চাও বৌদি, তো চল!

—আমি? না ভাই, তোমার দাদা যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারেন। আমার এখন বাড়ী ছেড়ে যাওয়া চলে না—আমার জন্যে মহাত্মাজার পায়ের ধুলো কুড়িয়ে এনো।

লকু আর দেরী করতে পারে না। ছেঁড়া পাঞ্জাবী আর তালিমারা জুতো জোড়া বার করে পরে নিল—তারপর গণাধীশকে কোলে নিয়ে বললো—আসি বৌদি।

স্বাহা সাজিয়ে দিয়েছে গণাধীশকে—হাতে-কাটা সুতোর জামা গায়ে আর

কপালে রক্তচন্দনের তিলক। ছেলেটার টানা টানা চোখ দুটোতে উজ্জ্বল হাসি। লকু ওকে কোলে নিয়ে বেরুতে বেরুতে বললো—বলো—"জয় হিন্দ্"

—জয় হি হিং—বললো গণাধাশ।

ওর মুখের হাসিটা বড় বেশি রহস্য-মধুর।

মহাত্মাজী প্রার্থনা করবেন—লোকাধীশকে পৌঁছুতে হবে তার পূর্ব্বেই। জীবনকে মহত্তম সংস্পর্শে আনবার এমন মহাসুযোগ বড় বেশি পাওয়া যায় না! সেঁজুতিকে সঙ্গে নিয়ে লকু এসে ট্রেনে উঠলো। কী নিদারুণ ভীড়! দেশের যে যেখানে ছিল সবাই যেন ছুটে আসছে সেই মহামানবকে দেখতে। দেখে কি লাভ হবে, সে কথা হয়তো অনেকে ভাবে না—তবু দেখবার অকাঙ্ক্ষা ওদের কিছুমাত্র কম নয়।

—আদর্শবাসী ভারত পূর্ণ আদর্শের সন্ধান পেয়েছে লকুদা, তাই ওঁকে দেখবার এই ব্যগ্রতা।—সেঁজুতির কথাটাকে লকু হাসি দিয়ে সমর্থন জানালো। সেঁজুতি আবার বললো—কংগ্রেসের বামপন্থীদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা কি প্রত্যাহার করা হয়েছে লকুদা?

—না, আশাকরি প্রত্যাহৃত হবার আর দেরী হবে না।

গাড়ীর কামরাটা মানুষে ঠাসা—নড়বার চড়বার উপায় নাই। সবাই যাচ্ছে দর্শনে, যেন সবাই তীর্থযাত্রী—তাই প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য যথাসাধ্য স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। মানুষে-মানুষে এই যে প্রীতি, এই-ই সাম্যবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ, স্বাধীনতা লাভের অপরাজেয় অভিযান! লোকাধীশ নিজের মনেই ভাবছিল—সমগ্র ভারত আজ এত জাতীয়তাবোধে জাগ্রত হয়েছে; এই একত্রীকরণের মূলে রয়েছে এক বাঙালী সন্তানের আত্মদান। কংগ্রেসের তিনি বামপন্থী ছিলেন; তাঁর মত হয়তো ভিন্ন, তাই পথও ভিন্ন, কিন্তু তাঁর আদর্শ ঐ কংগ্রেস—ভারতের স্বাধীনতাই তাঁর কাম্য। আজ মহাত্মাজি তাঁর জন্মভূমিতে পদার্পণ করেছেন—তাঁর বাসগৃহ দেখে এসেছেন—তাঁর অভিযানকে অসাফল্যের দুর্ভাগ্য

সত্বেও অগৌরবের নয় বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন। বাঙালী 'নেতাজী'র প্রতি সারাভারতের এই যে শ্রদ্ধা নিবেদন—এই যে শুভ মহেন্দ্রক্ষণ—এই পুণ্য লগ্নে সমগ্র ভারত একত্রিত হবেই হবে।

বিরাট প্রান্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে জনতায়। শিক্ষায়তনের আম্রকুঞ্জ, আমলকী তরু আর আশ্রমবাসীদের কণ্ঠস্বর দূরথেকে ঋষির তপোবনের মতই মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মানস-স্বপ্ন! পৃথিবীর সংস্কার-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি! লোকাধীশ ষ্টেশনে নেমে নীরবে জনতার সঙ্গে হাঁটছে। ভুবন ডাঙ্গার মাঠ—চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বন ছিল এখানে। মনে পড়লো ভারতের সভ্যতার কথা।—ভারতের সভ্যতা আরণ্যক সভ্যতা—অরণ্য থেকেই উদ্ভূত হোয়েছে সেদিনকার সভ্যতার বাণী বেদ-উপনিষদে, যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কর্ম্মে; তাই জনপদনায়ক সম্রাটগণকেও যেতে হোত সভ্যতা শেখবার জন্য সেই অরণ্যে। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ সেই সত্য অনুভব করেছিলেন মর্ম্ম দিয়ে, তাই বর্ত্তমান সভ্যতার সাংস্কৃতি কেন্দ্রটিতে তিনি স্থাপন করে গেছেন অরণ্য না হোক, তপোবনের আদর্শ। আধুনিক পৃথিবীর জননায়কগণ আসছে, আসবে এখানেই নব সভ্যতার নবীন বাণী গ্রহণ করতে—এইখানে এসেই তারা "নিবে আর দিবে, মিলাবে মিলিবে—যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহা মানবের ......"

বন্দেমাতরম্—জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো। লোকাধীশ দেখলো একদল নারী জাতীয় পতাকা হস্তে শ্রেণীবদ্ধভাবে আসছে,—পুরোভাগে তাদের একখানি স্বল্প পরিচিত মুখ। মিনিটখানেক ভেবে লোকাধীশ চিনতে পারলো—কাবেরী দেবী, সম্ভব কলকাতা থেকে আসছেন। এখন ওঁর সঙ্গে কথা বলা উচিৎ হবে কিনা, লোকাধীশ ঠিক করতে পারছে না—কিন্তু সেঁজুতি ওঁকে দেখতে পেয়েই কাছে গিয়ে বলল—"জয় হিন্দ্" মুখ তুলে তাকিয়ে কাবেরী আধ মিনিট থেমে গেল—তারপর চিনতে পেরেই বলল,—জয় হিন্দ—বলেই সে সেঁজুতির কোল থেকে ছেলেটাকে নিল নিজের কোলে। পিছনের মেয়েরা কাবেরীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করছে—জয় হিন্দ! সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জন-সমুদ্র গর্জ্জন

করে উঠলো,—জয় হিন্দ ! কাবেরীর হাতের পতাকাটি সেঁজুতি নিয়েছে ; দুজনে পাশাপাশি যেতে লাগলো—লোকাধীশ একটু আস্তে চলছে !

—দিদি ভাল আছেন ? কাবেরী প্রশ্ন করলো—উত্তর পাবার আগেই ছেলেটাকে বললো—এর মধ্যে অনেক বড় হয়ে উঠেছিস তো খোকন ! এইতো সেদিন এতটুকু ছিলি !

—আগুনের বাড়তে বেশি সময় লাগে না ভাই—ওর সহায় হয় বাতাস—তাই এখানে এনেছি মহাবাত্যার কাছে।

সেঁজুতির কথাটায় কাবেরীর মুখে হাসি দেখা দিচ্ছে—প্রত্যয়ের সুদৃঢ় হাসি। বললো—বাতাস বইছে—এবার ঝঞ্ঝা হবে সহায়—তখন অগ্নি হবে দাবাগ্নি।

আর কথা না বলে ওরা হাঁটতে লাগলো—পিছনে সেই নারী-বাহিনী। লাল সড়কের রাস্তা, ধূলোয় পাগুলি ওদের গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত হয়ে গেছে। শীতের শুকনো বাতাসে ঠোঁট আর গাল খড়িমাখা—ঠিক যেন কতকগুলি তাপস-বালিকা চলেছে সমিধ আহরণে। লোকাধীশ দেখছিল আর নিজের মনে ভাবছিল—এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত মৃত্যু—তবু এজাতির অন্তর কী দুর্বার সহনশীল ধাতুতে গড়া—যা কোনো রকমেই পরাজয় মানে না ! এই আশ্চর্য্য শক্তির উৎস কোথায় ? কোথায় এই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের অমৃতধারা ? কে এই মরণোন্মুখ জাতিকে শতাব্দির পর শতাব্দি বাঁচিয়ে রেখেছে, আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করছে, স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ করছে—স্বরাজ্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে দিচ্ছে—কে ? কে তিনি ? লোকাধীশের অন্তরে তার প্রশ্নের উত্তর তন্মুহুর্ত্তেই জেগে উঠলো—এই বিরাট দেশের বিস্ময়কর সাহিত্য। যে সাহিত্যের অমর অবদান রবীন্দ্রনাথের অন্তর-ধারায় এইখানে উৎসারিত হয়ে বাংলাকে সারা ভারতের তীর্থভূমি করেছে—সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ঐক্যভূমিতে পরিণত করার বিরাট সংকল্প নিয়ে যে আরণ্যক সভ্যতা এইখানে ঔপনিষধিক বাণী-মহিমায় আকাশ-চুম্বী—সেই সাহিত্যই বাঁচিয়ে রেখেছে এই জাতীয়তাবোধকে। কিন্তু লোকাধীশের অন্তর পীড়িত হয়ে উঠলো—বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় সাহিত্য তো যথেষ্ট উন্নত

নয়ই—বর্ত্তমান ভারতে জাতীয় সাহিত্য এবং সাহিত্যিকগণ যথেষ্ট অবহেলিত। নগ্ন—কামনা-কলুষিত প্রতীচ্য সাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণ-স্পৃহা, আর ভারতের প্রাণ বিরোধী আদর্শ-পরিপন্থী কতকগুলি অসার থিওরীর অনুবাদন ছাড়া ভারতবাসী সাহিত্যকে জাতীয়তার কাজে তো নিয়োগ করছে না। শক্তিশালী সাহিত্যের মধ্যেই জাতীয় জীবন গঠিত হয়—জাতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং জাতীয় আদর্শ রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতের জাতীয় সাহিত্য নাই—রাষ্ট্রভাষাও নাই। "হিন্দুস্থানী" নামক যে ভাষাকে নেতৃবর্গ রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট—সে ভাষা কী ভাষা? কতখানি তার শক্তি? জাতীয় জীবনে কতটুকু শক্তি সঞ্চার করা তার দ্বারা সম্ভব হবে? লোকাধীশ মৃত জ্যেঠামশাইএর কথা ভাবলো—ঐ বৃদ্ধ বলেছিলেন—"এ জাতি মরবে না—যুগযুগান্তর বেঁচে থাকবে তার সাহিত্যের অমৃত পান করে"...জাতীয় জীবনের নিখুঁত ইতিহাস তাই তিনি আগুনের অক্ষরে লিখে রাখবার আদেশ দিয়ে গেছেন লোকাধীশকে। কিন্তু কী ভাষায় সে ইতিহাস লিখবে লোকাধীশ? বাংলার তো রাষ্ট্রভাষা হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। নেতৃগণ চান হিন্দুস্থানী। এই পুণ্যপীঠে এসে মহাত্মাজী তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সাধনভূমিতেও বাংলা ভাষার কথা একবার মনে করলেন না! কেন? ভাবতে গিয়ে লোকাধীশ নিজেকে অপরাধী মনে করলো? ওঁরা মহাত্মা!—ওঁদের কাজের বিচার করবার মত বুদ্ধি লোকাধীশের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নাই। লোকাধীশ প্রণাম করলো ওঁর উদ্দেশে।

সারা বাংলা ওঁকে সোচ্ছ্বাসে বরণ করে নিয়েছে। দিকে দিকে ওঁর জয় নিনাদ—কণ্ঠে কণ্ঠে ওঁর স্তব-বন্দনা। কবি-বাঙালী ওঁকে যোগ্য পূজা দিতে কোথাও ত্রুটি করে নি। দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন বাংলা—অত্যাচারে হৃতগৌরব বাংলা, মারীভয়ে মৃত বাংলা মৃত্যুমলিন মুখেও হাসি ফুটিয়ে যথাসাধ্য অর্থ ওঁকে উপঢৌকন দিচ্ছে। জানি না, সে অর্থ উনি কেমন করে কোথায় কি কাজে লাগাবেন। তবু বাঙালী ওঁকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, পূজা করে—লোকাধীশ আবার মাথা নোয়ালো।

প্রার্থনা-মঞ্চের কাছাকাছি ওরা এসে পড়েছে! অদূরে মঞ্চোপরি মহাত্মাজি দর্শন দিলেন—সঙ্গে তাঁর দুটি মেয়ে—হাত ধরে নিয়ে আসছে। ভারতের মুক্তিমন্ত্রের ঋষি উনি—বৃদ্ধ ঋষি—প্রতিভা ওঁর যৌবন-শক্তিতে অজেয়, কিন্তু শরীর হয়ত অপরের সাহায্যেরই প্রয়োজন অনুভব করে। লোকাধীশের বিশ্লেষক মন নানা খুঁটিনাটি বিচার করছে—কিন্তু লোকাধীশ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক—এসব বিচার বিশ্লেষণ করে ওঁকে আরো বেশি ভাল বাসতে পারবে সে—উনি আরো অধিক অতিমানবীয় শক্তিতে প্রাদুর্ভূত হবেন লোকাধীশের মানস-নয়নে।

প্রার্থনা আরম্ভ হোল—সেই আর্য্য ঋষির পবিত্র বাণী—"প্রার্থনায় অন্তর শুদ্ধ হয়—বুদ্ধ হয়,পবিত্র হয়।" ..লোকাধীশ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে পান করতে লাগলো কথাগুলি।

কাবেরীদের দল মঞ্চের প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে—সঙ্গে সেঁজুতিও গেছে। ওরা নারী—ওদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা—ওদের কাছাকাছি নিয়ে যাবার জন্য বহু ব্যক্তিই ব্যতিব্যস্ত। বিশাল জনতার দৃষ্টি ওদের পানেই নিবদ্ধ—ওরা নারী। লোকাধীশের অন্তর মুচড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস জাগলো অকস্মাৎ। পরাধীন মৃতকল্প দেশের মানব-সন্তান ওরা—ওদের নৈতিক মেরুদণ্ড চূর্ণ হয়ে গেছে যে—ওরা যে এখানে স্বদেশের এক মূর্ত্তিমান মুক্তিদূতকে দেখতে এসেছে—একথা ওরা ভুলে গেছে—ভুলে গেছে ওরা শৃঙ্খলিত— শৃগাল কুকুরের চেয়েও অধম হরিজন। নারী নিয়ে বিলাস করবার কোনো যোগ্যতাই ওদের নাই—একথা কে ওদের কানে আগুন-ঢালা ভাষায় বলে দেবে? কে ওদের কাম-কলুষ চোখকে বজ্র-বিদারী কথার স্ফুলিঙ্গাঘাতে অন্ধ করে দিয়ে শুধুবে—কি দেখছিস? কাকে দেখছিস? ওরা যে তোর মা-বোন—ওরা যে তোকে মাইদুধ খাইয়ে মানুষ করেছে—তুই ওদের বন্ধন থেকে মুক্ত করবি বলে। তার বিনিময়ে কি এই

ভ্রবিলাসের নির্লজ্জতা ? অন্ধ হয়ে যা—অন্ধ হয়ে যা তোরা—মহাত্মাজীর পুণ্য চরণ দর্শনের তোরা অনধিকারী।

লোকাধীশ দেখতে পেলো, দূর দূর গ্রাম থেকে এসেছে কৃষকের দল, সাঁওতালদের মিছিল—এখনো আসছে—যেন মেলা দেখতে আসছে! মহাত্মাজীর চলার পথের ধূলো কুড়িয়ে নিচ্ছে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ওরা কি সত্যি বুঝেছে মহাত্মাজি তাদের কে? কিম্বা শুধু হুজুগে মেতে হাজারে হাজারে দেখতে আসছে তামাসা? এই নিতান্ত নিরক্ষর কৃষক-শ্রমিকের দল কি জানে—স্বাধীনতায় তাদের জন্মগত অধিকার? তারা কি বোঝে "স্বাধীনতার সন্ধানে জীবন দানে আছে অবিনশ্বর গৌরব?" তারা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাষায় কি বলতে পারে—Freedom, Freedom is the song of the Soul! তারা কি শ্রী অরবিন্দের আকাঙ্খা পোষণ করে—"I shall like to see some of you becoming great; great not for your own sake but to make India great, so that she may stand up with head erect among the free nations of the world."—না, ওরা বোঝে না—ওরা জানে না—কি জন্য ওরা আসছে—কোন উদগ্র আকাঙ্খার ওরা অভিযাত্রী—কোথায় সেই তীর্থ! কিন্তু ওদের জানাতে হবে—ওদের বোঝাতে হবে—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি কথকতার মধ্যে যেমন করে একদিন ধর্ম্মাদর্শ প্রচার করা হোত, তেমনি করে, তার থেকে উন্নত উপায়ে ওদের জানাতে হবে স্বরাজাদর্শ—গণশক্তিকে। এক জায়গায় সমবেত দেখলে বা ছেলেমানুষী খেয়ালে কয়েকটা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে দেখলে কিম্বা ভক্তিভরে পদধূলি কুড়ুতে দেখলেই গণজাগরণ বলা চলে না;—গণজাগরণ হবে সেই দিন যেদিন এই গণসমষ্টির ক্ষুদ্রতম ব্যষ্টিও জাগ্রত হবে।—সে কাজ অগ্নিস্রাবী সাহিত্যের—সেকাজ বজ্রবিদারী লেখনীর।

লোকধীশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন-প্রায় হয়ে গেলো জনতার ধাক্কায়—দেখলো

সবাই ফিরছে—উশৃঙ্খল ছত্রভঙ্গ জনতা—কোন নিয়ম নাই, নিষ্ঠা নাই—ফিরছে। দুঃখটা ওর আরো তীব্র হয়ে উঠলো।

নির্জ্জন পথ—নিস্তব্ধ অরণ্য; ইন্দ্রজিৎ এসে পৌছাল বিহারীনাথ পাহাড়ে। ওর পূর্ব্বেই প্রায় পঞ্চাশজন ব্যাক্তি এসে সমবেত হয়েছে সেই শিলাময় চত্ত্বরে। কিন্তু গুরুদেব এখনো আসেন নি। সবাই ওরা নিঃশব্দে অপেক্ষ করতে লাগলো। ওদের পরস্পর কুশল প্রশ্ন করবার কৌশলটা নির্ব্বাক সঙ্কেত মাত্র—তাই অত লোক জমায়েত হওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম শব্দ হচ্ছিল না। শীতের রাত্রি, গাছের পাতায় পাতায় শিশির পড়ছে—দূর বনে শেয়াল গুলো মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে—ক্যা হুয়া ?—হুয়া ক্যা ?

"ক্যা হুয়া—?" অর্থাৎ কি হয়েছে ?—ঐ নির্ব্বোধ প্রাণীগুলো যেন জিজ্ঞাসা করছে এই সমবেত মানুষগুলোকে! কি হয়েছে, সেটাও এখনো জিজ্ঞাস্য আছে নাকি ওদের কাছে ? সবই যে ওদের রজত্ব হয়ে গেছে—শ্মশানের রাজত্বে পরিণত হয়েছে—তবু ওরা বলছে—ক্যা হুয়া ? আশ্চর্য্য তো ? লাটবেলাটের মুখ থেকে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট থেকে এবং মাঝে মাঝে মার্কিন-ভূমি থেকে যেমন বাণী আসে—বাপুহে, ঘাবড়িও না—এমন কি আর হয়েছে তোমাদের ? সবই আমরা অনতিবিলম্বে ঠিক করে দিচ্ছি—তোমাদের জন্য স্বরাজ তো দিয়েই রেখেছি—শুধু তোমাদের ভেদাভেদটা মিটিয়ে ফেললেই লেঠা চুকে যায়—তারপর স্বরাজ নিয়ে সুখে বিরাজ কর—আমরা বাড়ী চলে যাব—ভাবনার কি হয়েছে ?" ঐ শেয়ালগুলো যেন তাদেরই অনুকরণ করছে বলছে—ক্যা হুয়া রে!

নাঃ—কিছুই হয় নাই; যুদ্ধোত্তর শান্তি স্থাপিত হয়ে গেছে—মরণের মহা-শ্মশানের নিবিড় গভীর শান্তি। শান্ত হয়ে গেছে বঙ্গপল্লী ক্ষুধার যন্ত্রণায়—

তাঁতীর সূতো নাই, জেলের নৌকা নাই, চাষীর জমি উড়োজাহাজের মাঠে রূপান্তরিত, সওদার অভাবে মুদির দোকান বন্ধ—চিনির অভাবে ময়রা মরণোন্মুখ, সরিষার অভাবে তেলের ঘানির কাঠে শীতের ধুনি জ্বালান হচ্ছে, নিওরার অভাবে রোগী মরলো, পিতল কাঁসার চাদর না পেয়ে কাঁসারীরা বেকার হয়ে যাচ্ছে, ধানের কলের চিমনীতে বোলতার চাক তৈরী হচ্ছে, কাপড়ের দোকানে কচুর পাতা বিছিয়ে রেখেছে! ক্যা হুয়া ?—বাঙলার স্ব-স্ব বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়গুলি আপন বৃত্তি ছেড়ে মজুর না হয়ে ভিক্ষুক হয়ে গেলো--জীবিকার জন্য ব্যক্তিগত আর পরিবারগত সম্মান বিক্রী করে দিলো বাঙলার স্বাধীন বৃত্তিজীবীদের সব বৃত্তি অচল হয়ে গেলো—সব রকম দারুশিল্প, কারুশিল্প লোকশিল্প চুরমার হয়ে গেলো—বাকি ছিল যেটি হাতের পুতুল গড়া—রং এর অভাবে তাও লুপ্ত হয়ে গেলো। ক্যা হুয়া ? বাঙলার শান্ত সমাহিত পল্লীজীবনের অভ্যন্তর এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্বন্ধকে চূর্ণ করে শান্তির মহাবাণী বয়ে এনেছে এই যুদ্ধ—প্রচণ্ড, অসহনীয় শান্তি! যুদ্ধের প্রয়োজনে একটির পর একটি আঘাত এসেছে আর বাঙলার জীবন পলিতাহীন প্রদীপের মত নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে—যেন কোনো সচেতন মন-বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হয়ে বাঙলার জীবনটি এইভাবে রসশূন্য হয়ে শুকিয়ে গেলো—আর আশ্চর্য্য—এই আঘাত এবং ক্ষয়িষ্ণুতার ব্যাপকত্ব হিন্দু সমাজের উপরই সমধিক! তবু ওরা চেঁচাচ্ছে—ক্যা হুয়া ? ঐ নির্ব্বোধ শৃগালের দল ভেবে দেখছে না, জাতীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা তার বৃত্তি—তার বংশানুক্রমিক কর্ম্মপটুতা, তার জীবন-যাপনের সাবলীল ছন্দ উচ্ছিন্ন হয়ে গেলো—উৎসন্ন হয়ে উৎখাত হয়ে গেলো! রইল কি এই মহাশ্মশানে ? শান্তির অসহ নিস্তব্ধতা আর অটুট ক্লৈব্য! ক্যা হুয়া নাই রে ভাই সব ?

গুরুদেব নামছেন। ইন্দ্রজিৎ চিন্তাটাকে সবলে থামিয়ে হাত তুললো গুরুর উদ্দেশে। ওদের অভিবাদন জানাবার প্রথা—কিন্তু ওর মনের মধ্যে তৈল-কটাহ ফুটন্ত যেন—,চোখ দুটো তাই জ্বলছিল বাঘের মত। কিন্তু গুরুদেবের প্রশান্ত মূর্ত্তি ওকে শান্ত করে দিলো—স্নিগ্ধ করে দিলো।

"বৎসগণ" !—বৃদ্ধ গুরু আরম্ভ করলেন—আজ তোমাদের আর একবার ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখবার কথা বলবার জন্তই ডেকেছি ! আজ এটা আমার কথা নয়—সমগ্র ভারতের একছত্র নেতা শ্রীমহাত্মাজীর বাণী—তিনি বলছেন—"ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন না করলে ভয়কে জয় করা সম্ভব নয় ;—আর ভয়কে যারা জয় করতে পারে না, তারা স্বাধীনতা লাভেরও যোগ্য নয়।"

উনি বলে যাচ্ছেন—মহাত্মাজীর বাণী—তোমরা প্রীতিপরায়ণ হও—পরস্পরকে ভালবাস, তাহলেই ভেদবুদ্ধি অপসারিত হবে, সামাজিক অসাম্য দূর হয়ে যাবে আর ঐ থেকেই স্বাধীনতা আসবে, কারণ যাকে ভালবাসা যায় তার অধীন হইতেই চায় মানুষ, এবং সেই হয় স্বাধীন, কারণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও সেখানে সে ত্যাগ করতে পারে।

—কথাটা খুবই সত্যি গুরুদেব, কিন্তু এই প্রেম এবং প্রীতি-ধর্ম্ম লোকোত্তর, সাধারণ মানুষের জীবনে এর আচরণ তো সম্ভব নয়—ইন্দ্রজিৎ পিছন থেকে বললো—জগতের কোন্ সাধারণ মানুষ এর অনুবর্ত্তন করবে ?

—হ্যাঁ, এই ধর্ম্মের পূর্ণ অনুবর্ত্তন সাধারণ জীবনে অসম্ভব—কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি শুধু কায়িক এবং বাচনিক অহিংসা পালন করতে পারে—এবং প্রীতি-পরায়ণ হতে পারে।

—এ এক রকম পলিসির কথা ! কিন্তু পলিসি হিসাবে এটা কি খুব উৎকৃষ্ট মনে হয় ? ইংরেজরা honestyকে পলিসি মনে করে—আমাদের লোকোত্তর প্রীতিধর্ম্মকেও তেমনি পলিসী মনে করতে হবে নাকি গুরুদেব ?—ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ।

—না !—গুরুদেব ইন্দ্রজিতের বিদ্রূপটা উপেক্ষা করেই শান্ত স্বরে বললেন—ইন্দ্রজিৎ, আমি প্রীতিধর্ম্ম এবং অহিংসাকে পলিসি রূপে ব্যবহার করতে চাই না—এদেশ থেকে ওদেশে যাবার জন্ত আমি সরকারের মোটরলঞ্চ নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণের বিলাসিতা করবার পক্ষপাতী নই—যে সরকারকে আমরা দেশ থেকে বিদায় করতে চাই, তারই কাছে কৃপা ভিক্ষা করবার মত

সুবিধাবাদ আমার ধর্ম্মে নাই—আমার লোকোত্তর প্রীতি ধর্ম্ম কোথাও ক্ষুণ্ণ হ'লে আমার সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি চাই স্বরাট।

—বুঝলাম না গুরুদেব।

—"স্বাধীন।" অর্থে বোঝায় নিজের অধীন—নিজের আত্মার দায়িত্বজ্ঞান; এই জ্ঞান দান করতে হবে আমার ধর্ম্মের অনুশীলনকারীদের। ব্যক্তিগত এই জ্ঞান সমষ্টিগত যতদিন না হবে, ততদিন শুধু চলবে হুজুগ, হুল্লোড় আর বক্তৃতার তুবড়ি বাজি! কথার তুবড়ী দিয়ে কোনো জাতি কখনো স্বাধীন হয় নি—হলেও সে স্বাধীনতা রাখতে পারে নি। তাই বলছি, প্রত্যেকে নিজের আধীন্তে দায়িত্বশীল হবে—সেই দায়িত্ব-জ্ঞান তাদের একত্রিত করবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে; অন্যথায় এই যে বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন বুলি—এর সমন্বয় সাধন করে চলা অসম্ভব!

—কিন্তু সেটা কি ভাবে হতে পারে গুরুদেব?

—পারে। ভারতের সাধনায় সর্ব্বত্র একটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমান যুগে আমরা সেই মূল সুর ভুলে গেলেও, তাকে স্মরণে আনতে সময় লাগবে না। সে মূল সুর হোল ধর্ম্ম। ভারতীয় সাধনার মূল কথা হোল, স্বরূপোপলব্ধি—নিজেকে পরিপূর্ণরূপে জানা। এখানে নিজেকে বলতে আমি শুধু ব্যক্তির কথাই বলছি না—সমষ্টি অর্থাৎ সারা ভারতকে এক ব্যক্তি ধরে জানবার কথাও বলছি। সে জানা হবে সত্য জানা—তাহলে যে পথ খুলে যাবে, সেটাই হবে সত্য পথ—সকলের পথ, স্বরাজ লাভের পথ।

—সে কত দিন হবে গুরুদেব?

তুমি কি মনে কর ইন্দ্রজিৎ, এই অহিংসা আর চরকাকে পালিসিরূপে ব্যবহার করে ছয়মাসেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করবে? ভেবে দেখ—বর্ত্তমান যুগ কত রকমে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। অস্ত্র নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই—স্বরাজের চিন্তা করাও পাপ—তারপর জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রদেশ-ভেদ, ধর্ম্মভেদ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভেদ হোল সাংস্কৃতিক ভেদ—যা দিয়ে ঐক্য

প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সাংস্কৃতিক ঐক্যই ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল অশোকের আমলে পর্য্যন্ত—তারপর এই দীর্ঘ দিনের পরাধীনতায় আমরা সে ঐতিহ্য ভুলেছি, Honestyকে পলিসিরূপে ব্যবহার করতে শিখেছি; আজ আমরা অহিংসা এবং প্রীতিকে রাজনৈতিক পলিসিরূপে ব্যবহার করতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না। এই নৈতিক অধঃপতন শুধু পাপ নয়, অতিপাতক! সত্যের পূজারী ভারতের অন্তরাত্মা একে সমর্থন না করে ঘৃণাই করবে।

—কিন্তু এই অহিংসা এবং অসহযোগের বন্যায় ভারত আজ ভেসে যাচ্ছে।

—তা হোক, সাঁতার দেবার জন্যে জলে নামা দরকার—সেটা শিক্ষার কাল। সত্যিই যখন নদী পেরুতে হবে, তখন রাজনৈতিক এই জাগরণের শিক্ষা তাদের কাজে লাগবে। কিন্তু তাই বলে অহিংসা এবং প্রীতির এই অপব্যবহার অসমর্থনীয়। আর বন্যায় যারা ভেসে যাচ্ছে তারা জন-সাধারণ। জন-সাধারণের কোনোরকম মত নাই। তারা ঢেউয়ে চলে। বন্যায় ঝাঁপায়—তাদের নিজস্ব মতবাদ কোনো দিন গড়ে ওঠে না।

—তাহলে কি করতে বলেন?

—বলছি—সত্য হবে। জীবনকে সত্য করে তুলবে। সত্যই হবে আশ্রয়। তোমার অহিংসা এবং প্রীতি মৈত্রী তোমার পলিসি হবে না—হবে তোমার সত্য জীবন। তোমার স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা শুধু পলিসির জন্য অর্থাৎ তুমি স্বাধীনতা কামী হও—যতক্ষণ এই সত্যের আশ্রয়ে তুমি না আসবে—যতক্ষণ তোমার পলিসিকে তুমি সত্যে পরিণত না করতে পারবে ততক্ষণ তোমার স্বরাজ হওয়া অসম্ভব, এবং ব্যক্তিগত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতের স্বরাজও অসম্ভব!

—তাহলে আর কাজ নাই প্রভু, বিদায় দিন—আমরা যেভাবে মরছি, মরে যাই!

—থামো ইন্দ্রজিৎ! নিরাশ হবার কথা নয়—অত্যন্ত আশার কথাই আমি

বলব। যে ভাবে আমরা মরছি, এই মরণের পথেই বাঁচবার পথ পাওয়া যাবে—মৃত্যু থেকেই মানুষ অমৃতে আসতে পারে। এ শুধু আধ্যাত্মিক কথা নয়, জীবনের উপলব্ধ সত্য। এতো মৃত্যু ঘটছে বলেই তো জাতি আজ আত্মরক্ষার চেতনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—কিন্তু সে চেতনা এখনো পূর্ণ সত্য লাভ করে নি। বিরাট এই দেশ, বিচিত্র তার মানব জীবন, এবং বিভিন্ন তার বিষয়বুদ্ধি,—কিন্তু একটা জায়গায় এই দেশের ঐক্য রয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে—সেটি এর ধর্ম্ম-সাধনার মধ্যে। সেই সাধনাবোধকে জাগ্রত করতে হবে—প্রদীপ্ত করতে হবে প্রত্যেকের মধ্যে—প্রত্যেককে স্বরাট অর্থাৎ নিজের অধীন করতে হবে—প্রত্যেকে বলতে পারবে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"। একাজ কঠিন, কিন্তু এই কাজই চাই। ভারত জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ধর্ম্মসাধনাকে একত্রীভূত করে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে—তখন আসবে স্বরাজ—যে স্বরাজ্য শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর মুক্তির রাজত্ব।

—কিন্তু সেদিন যে বহু বহু যুগ পরে গুরুদেব!

—দেরী নাই। যুদ্ধশ্রান্ত পৃথিবীতে শান্তি আসে নি—এসেছে ক্ষোভ, হিংসা আর গ্লানি। বড় দিনের বক্তৃতায় যিনি যতই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর শান্তির বাণী উদ্গিরণ করুন, বন্দুক-কামানকে কাস্তে-লাঙ্গল-ফাল তৈরী করবার উপদেশ দিন—নিজের বেলা তাঁরা অধিকতর মারণাস্ত্র তৈরীতে হাত পাকাচ্ছেন। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য অস্ত্রের দরকার বর্ত্তমান যুগে—কিন্তু অস্ত্র যার নাই, নিজের জীবনকেই তার অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করতে হবে—পলিসি হিসাবে নয়—প্রীতি এবং অহিংসার জন্য! আর যারা মারণাস্ত্রের গুদামঘরে বসে মানবত্বকে উপহাস করবে, মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরিয়ে মানব-কল্যাণকামী সেজে নিজেদের বৈষয়িক সাম্রাজ্য রক্ষার ফিকির দেখবে—তারা এখনো জানে না, তাদের পরস্পরের মৃত্যুবাণ তৈরী হচ্ছে তাদেরই বিরাট বিরাট কারখানায়! ওরা বিষয়ী, তাই ভীরু, ওরা অসত্যের আশ্রয়ী, তাই সত্যকে ওরা ভয় করে—ওরা শুধু জানে জীবনের উপভোগের পূজা, তাই মরণ ওদের কাছে আতঙ্কের। কিন্তু বিষয়

যার নাই, সত্য যার আশ্রয় এবং জীবনকে যে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারে তার ভয় কোথায় ?—সে স্বএর অধীন, সে স্বরাজী, সে স্বরাট !

গুরুদেবের কথাগুলি অন্তর-নিংড়ে বার হচ্ছিল। ইন্দ্রজিৎ এবং আর সকলে কিছুক্ষণ অভিভূত হযে রইলো, তারপর একজন প্রশ্ন করলো বিনীত কণ্ঠে

—আমাদের এখন কি করতে আদেশ করেন প্রভু ?

—আদেশ নয় বৎস, আদেশ দান করবেন তিনি যিনি তোমাদের নেতা রূপে জন্মাবেন। আমি শুধু শিক্ষা-গুরু– তোমাদের বর্ণবোধ করিয়ে যাচ্ছি। তোমরা সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছো, বিষয়-নিস্পৃহ হয়েছো এবং জীবনকে দর্শন করতে শিখেছো মৃত্যুর পরিণামে—এটোমিক ব্যোনের অস্ত্র তোমাদের নাই, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে এটোমবোমই শেস নয়—এর পর ব্যোমরশ্মি আছে—ব্যোমাতীত মহাব্যোমরশ্মি আছে—কিন্তু সর্ব্বশেষ রশ্মি যে ঐশীরশ্মি তাই তোমদের আশ্রয় হোক—জীবজগৎ এবং জড়জগতের কল্যাণে তোমরা আত্মদান করতে অভ্যস্থ হও। মনে রেখো, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করবার সময় কোনো অস্ত্র ব্যবহার করেন নি, বিবেকানন্দ আমেরিকায় যাবার সময় বন্দুক ছিল না তাঁর সঙ্গে, ছিল ঐশীশক্তি,—সকল শক্তির বড় সে শক্তি।

—কিন্তু বর্ত্তমান যুগ মারণাস্ত্রের যুগ—ঐশীশক্তি আর আধ্যাত্মিকতা পশ্চিমের মানুষ শুনবে না।

—শুনবে, শুনতে ওরা বাধ্য হবে। মাত্র দু'হাজার বছরের প্রাচীনতায় গঠিত ওদের ভোগ-বিলাসী মন এখনো আত্মপরায়ণ ; কিন্তু বৎসগণ, একটা মহাদেশের জীবনে মাত্র দুহাজার বছর কিছুই নয়। ভারত হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতার শীর্ষে থেকে দেখেছে—শুধু নিশ্ছিদ্র স্বার্থপরতাই নরধর্ম্ম নয়, এবং নরধর্ম্মের সাধারণ স্বার্থপরতাতেই মানুষ সভ্য হয় না। এ কথা ভারত বুঝেছিল, তাই পররাজ্যলোভ তার ছিল না। সন্ন্যাসী ভারত চিরদিন ত্যাগের পথেই চলেছে সত্যকে আশ্রয় করে। হাজার বছর কেটে গেলো এমনি দুঃখের অধীনতায়, আরো না হয়, দু'চার পুরুষ কাটবে, কিন্তু ভারত যা ছিল, যে

আধ্যাত্মিক বলিষ্ঠতায় পুষ্ট ছিল, যে অতিমানবীয় শক্তিতে সমৃদ্ধ ছিল, সেই যুগ তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে—সেই প্রাচীন সংস্কৃতির ভিত্তিভূমিতে নবীন সৌধ রচনা করতেই হবে আমাদের।

—কি উপায়ে?—ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করলো।

—উপায় এই ধর্ম্ম-সাধনা, তার সঙ্গে কর্ম্মসাধনার মধ্যে সত্যাশ্রয়। তোমার Honesty সত্যই Honesty, সেটা পলিসি নয়—তোমার সত্য ভাষণ, সত্যের মর্য্যাদার জন্যই, পলিসির প্রযোজনে তাকে ব্যবহার করা পাপ;—সারা ভারতে তোমরা যে একান্নটি ধর্ম্মমণ্ডল গঠন করেছো—তার প্রত্যেকটিতে এই সত্য জাগ্রত করো—এই বাণী প্রচার করো—এই কর্ম্ম সাধন কর;—টাকার তোড়ার দরকার হবে না, চ্যারিটি-শোর প্রযোজন হবে না, সাত দিনে হাজার মাইল ঘুরে একশ জায়গায় জ্বালাময়ী বক্তৃতার দরকার হবে না—এমন কি, দুর্ভিক্ষ-জলপ্লাবন বন্যা-মহামারীতে বিধ্বস্ত জনপদে গিয়ে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণের প্রযোজন হবে না—সব আপনা থেকেই হয়ে যাবে। হয়তো আজই সব হবে না—কিন্তু জাতি গঠিত হলে হবে। সেই জাতি গঠন করতে হবে—এই তোমাদের কাজ। এই মহাজাতি পালিত হবে ধর্ম্মমণ্ডলের আশ্রয়ে—সত্য-শিব-সুন্দর জাতি।

সকলে প্রণাম করে চলে গেলো, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ তখনো দাঁড়িয়ে। গুরুদেব বললেন,—তোমার সন্দেহ মেটেনি ইন্দ্রজিৎ! তুমি শুধু সংশয়বাদী নও—সন্ত্রাসবাদী—কেমন?

—না গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন কায়েন মনসা বাচা সত্যের আশ্রয় লাভ করতে পারি।

—পারবে! কিন্তু সত্য দর্শন সহজ নয় বৎস, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" শাণিত ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম সে পথ। মানুষের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়নিচয় সত্যবিমুখ, তাদের অন্তর্মুখীন করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের এই যে সংযমন, এতেই হবে যখন সুখলাভ, তখনিই হবে সত্যোপলব্ধির আরম্ভ—

ভূমার অনুসন্ধানে যাত্রা এবং "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং"—ভূমাতেই সুখ – ভূমাই একমাত্র শ্রেয় ; এই ভূমা, যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা—যার পর আর কিছু দেখবার নাই, কিছু শোনবার নাই, কিছু জানবার নাই – সেই সব সমাপ্তি—সেই অমৃত—তাই ভূমাকে যে জানে সে স্বরাট। আর্য্য ঋষিরা বহুদিন পূর্ব্বে ছান্দোগ্য এবং ঐতরেয় উপনিষদে স্বরাজের সংজ্ঞা লিখে গেছেন—সে স্বরাজ ব্যষ্টির এবং সমষ্টির, তাই রাষ্ট্রেরও।

ইন্দ্রজিৎ আর একবার পদধূলি নিয়ে ধীরে ধীরে বললো—ব্যষ্টি আজ মৃত্যুমুখে!

—না, না ইন্দ্রজিৎ, হাজার হাজার বছরের সাহিত্য-সাধনা এই জাতিকে বেদ-উপনিষদের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে—আবার এই সাহিত্য, সেই কৃষ্টি, সেই সাধনা জাগ্রত হবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে—যে সাহিত্য প্রেমের ন্যাকামী নয়, আধ্যাত্মিকতার সত্যে আশ্রিত ;—Ism এ কণ্টকিত নয়, আপন মতে ঋজু, সুদৃঢ় - বাস্তববাদে উচ্ছৃঙ্খল নয় – আদর্শবাদে প্রশান্ত, গভীর। মৃত্যুর পথ থেকে সেই সাহিত্যই আবার জাতিকে টেনে আনবে।

—সে কি ধর্ম্ম-সাহিত্য?

—হ্যাঁ—সাহিত্যের ধর্ম্মই ধর্ম্ম-সাহিত্য। সাহিত্য কোনোদিন অধর্ম্ম আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে আশ্রয় করে বড় হয় না—স্থায়ী হয় না। তাই-উপনিষদ-গীতা-বাইবেল চিরদিনই উন্নততম সাহিত্য। যুগ ফিরে আসছে ইন্দ্রজিৎ, রণশ্রান্ত নির্জীব পৃথিবী অচিরে একদিন আধ্যাত্মিকতার আদর্শের সন্ধানে এগিয়ে আসবে ভিক্ষাপাত্র হাতে—সেদিন ভারত যেন সে পাত্র তার পূর্ণ করে দিতে পারে—তার পূর্ব্বে চাই তোমাদের প্রস্তুতি।

উনি অপসৃত হলেন। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বনভূমি কি এক মায়াজাল বিস্তার করেছে। ইন্দ্রজিৎ ধীরে ধীরে নামতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো গুরুদেবের কথাগুলি। দেশ শ্মশান হয়ে গেলো, আর কবে হবে সাংস্কৃতিক ঐক্য? সাংস্কৃতিক ধ্বংস করবার জন্যই তো এত সব মন্বন্তর মহামারী! এর মধ্যে

দিয়েই তো মজুর-কৃষক-শ্রমিক তৈরী হচ্ছে—মৃতকল্প দেহ নিয়ে দুবেলা পেটের ভাত যোগাড়ের জন্য আত্মবিক্রয়, সম্মান বিক্রয় করছে। ওরা কি বাঁচবে? ওরা কি ততদিন বেঁচে থাকবে—যতদিন পরে সত্য হবে গুরুদেবের কথাগুলি।

নাইবা বাঁচলো? ওরা মরুক; তিলে তিলে এমন করে মরার চাইতে ওরা একেবারে একদিন মরে যাক—নয়তো ওরা বলুক, "আমাদের অস্ত্র নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, আমাদের মেরে ফেলো, নয়তো আমাদের নিজের মতো করে চলতে দাও—আমরা তাতে জাহান্নামে যাই যাব—তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্খার আর দরকার নাই"—ওরা সত্য করে বলুক এই কথা—সত্যের আশ্রয়ে এসে মৃত্যুর মধ্যে ওরা উচ্চারণ করুক "হয় স্বরাজ, নয় মৃত্যু"। যদি মৃত্যু হয়, হোক, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মুছে যাক এ জাতির সংস্কার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, তার সঙ্গে এই জাতিটাও। মৃতকল্প জাতিকে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে যারা স্ব স্বার্থের জন্য তাদের জানিয়ে দেওয়া হোক—আমরা চাই মুক্তি, নয় মৃত্যু!

কিন্তু কে জানাবে? জাতিকে তৈরী করে তবে তাদের কণ্ঠে এত কথা দিতে হবে—এই বাণী ঘোষণা করাতে হবে—সে কত দিন—কত দিন পরে? ইন্দ্রজিতের উদ্ধত যৌবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

ইন্দ্রজিৎ হোঁচট খেয়ে পড়লো একটা পাথরে—হাঁটুতে বেশ লেগেছে। যন্ত্রণা হচ্ছে—কিন্তু মৃত্যুর দ্বার যার লক্ষ্য তার কাছে সামান্য এই যন্ত্রণা। ইন্দ্রজিৎ উঠে হাঁটতে লাগলো খোঁড়াতে খোঁড়াতে—সারা ভারতটাই খোঁড়াচ্ছে সব রকমে। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে খোঁড়াচ্ছে; এই খোঁড়ার জীবনে আধ্যাত্মিক অশ্ব কি জুটবে? সে কি ছুটবে?—ইন্দ্রজিৎ আবার কিন্তু অপরাধ করলো গুরুর কথায় সংশয় এনে—না, ওঁর মতটাই সত্য—ওইই আশ্রয়।

—নদীতে নামলো।

উঠে এল ইন্দ্রজিৎ নদীর এপারে। যায়গাটা ওর চেনা, ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও চিনতে কষ্ট হোল না। দূরে শ্মশানের সেই জবা গাছ কয়েকটা, আর আরো দূরে এরোড্রামের আলো—ওপাশে সেই রেলওয়ে ব্রীজ। ঐ গ্রামেই সেই বৃদ্ধ নেতা সঙ্কর্ষণের আশ্রম ছিল। ইন্দ্রজিতের মনে পড়ে গেলো তিন বছর পূর্ব্বের এক সন্ধ্যার কথা। হাঁটুতে খুবই চোট লেগেছে, টাটিয়ে উঠছে—ইন্দ্রজিৎ ভাবলো, ঐ গাঁযে রাণী হয়তো এখনো আছে। গিয়ে একবার দেখলে হয়—চুণ-হলুদ লাগিযে দেবে হাঁটুতে। আর ঐ পবিত্র আশ্রমটিও আর একবার দেখা হযে যাবে। ইন্দ্রজিৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে লাগলো।

রাত আর বেশি নাই—দূরের গাছপালা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ দূর থেকেই দেখতে পেল, গ্রামে ঢুকবার মুখে বট গাছতলায় প্রকাণ্ড একটা ষাঁড় শুয়ে রয়েছে—ঐ পথ দিয়েই তাকে যেতে হবে। তাড়া করবে না তো? ছুটতে পারবে না ইন্দ্রজিৎ আজ। ওর ভয় করতে লাগলো, কিন্তু এখন আর ফিরেও যেতে পারে না। যা হয় হবে ভেবে অগ্রসর হলো ইন্দ্রজিৎ। ষাঁড়টা বসে বসে জাবর কাটছে—ইন্দ্রজিতের পানে তাকাতে লাগলো মুখ তুলে; যেন কিছু বলতে চায়। সাহস ফিরে এল ইন্দ্রজিতের, কাছে গিয়ে ওর গলকম্বলে হাত বুলিযে বললো,—কি রে? কি বলছিস! গাঁয়ের সবাই মরলেও তুই তো বেঁচে আছিস বেশ! হ্যাঁ, তোর বেঁচে থাকা দরকার, তুই যে ধর্ম্মের ষাঁড়—ধর্ম্মকে তুই রক্ষা করেছিস—কিন্তু আর কতদিন রক্ষা করতে পারবি?

ষাড়টা ওর গা শুঁকছে—ঠিক প্রাচীন দিনে পিতা-পিতামহ যেমন করে মস্তক চুম্বন করে আশীর্ব্বাদ করতেন, ঠিক তেমনি করে শুঁকছে ইন্দ্রজিতের গা! ইন্দ্রজিৎ নিজের মাথাটা ওর মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললো—করো বাবা, আশীর্ব্বাদ কর—তোমার কাজ যেন আমরা করতে পারি। স্বধর্ম্মে যেন আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকি—আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সবই যেন ধর্ম্মের সুরে বাঁধা থাকে—কর্ম্ম যেন সত্যের পথে অনুবর্ত্তিত হয়!

উঠলো ইন্দ্রজিৎ ওখান থেকে। সারা গ্রামটা ঘুমুচ্ছে, কিম্বা কোন লোকই নেই গ্রামে, ঠিক বুঝতে পারছিল না সে—আস্তে হেঁটে বৃদ্ধের আশ্রমের দরজায় পৌছালো। কে যেন কাতরাচ্ছে! রাণী নাকি? ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি উঠোনে দাঁড়ালো এসে। ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে কে বললো,

—কে আসছো গো? একটু কাছে এসো।

ইন্দ্রজিৎ উঠে গিয়ে টর্চ টিপে দেখলো—রাণী। শীর্ণ-কঙ্কাল হয়ে গেছে রাণী। অমন যে লাবণ্যময় চেহারা, তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

—আমি ইন্দ্রজিৎ—বলে ইন্দ্রজিৎ বসলো ওর মাথার কাছে। রাণী অতি কষ্টে বললো– একটুন জল দাও দাদাবাবু!

ইন্দ্রজিৎ দেখলো একটা মাটির ভাঁড় রয়েছে কিন্তু জল তাতে এক ফোঁটাও নেই। তাড়াতাড়ি ভাঁড়টা তুলে নিয়ে কাছের কুয়ো থেকে জল আনলো—দিল রাণীর মুখে। রাণী বললো,

—চিনেছি গো দাদাবাবু—আজ দুমাস জ্বর আমার—মালোয়ারী জ্বর। চার-পাঁচ দিন উঠতেও পারি নাই—আর বাঁচবো না দাদাবাবু—বলে রাণী চোখ বুজে একটুক্ষণ থামলো। ইন্দ্রজিৎ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রাণী আবার বললো—তোমার লেগেই হয়তো বেঁচে ছিলুন। বাবা আমার কাছে একটি বই রেখে গেইচে—এই মাথার বালিশের মধ্যে আছে—এইটি নিয়ে যেও দাদাবাবু।

ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারলো—রাণীর জীবনের আশা খুবই কম। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ আর শরীরে কিছুমাত্র রক্ত নাই। কাছাকাছি কোথাও ডাক্তার আছে কিনা জানা নাই ইন্দ্রজিতের। রাণীর মৃত্যুমলিন মুখের পানে তাকিয়ে ও ভাবতে লাগলো কি করতে পারে। কিছুই করবার নাই। এমনি করেই মন্বন্তর, মহামারী, ম্যালেরিয়ায় বাংলা শ্মশান হয়ে গেলো। দুহাজার লোকের জন্ত একটা ডাক্তার—এদেশে তাও নাই; ডাক্তারী শাস্ত্র পড়বার খরচ জোটানো মুস্কিল—যার জোটে সেও এড্‌মিশন পায় না—তদ্বির আর ভাগ্য সেখানেও

ত্র্যহস্পর্শ জুড়ে বসেছে। রাণী আর কথা বলতে পারছে না—ইন্দ্রজিৎ ডাকলো,

—রাণী দিদি! বড় কষ্ট হচ্ছে?

—ন্না!—বললো রাণী; কিন্তু ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে মনে হোলো। ইন্দ্রজিৎ আর দেরী না করে উঠে পড়লো ডাক্তারের খোঁজে। তখনও ফর্সা হয় নাই, তবে ভোরের ফিকে আঁধার ওকে পথ দেখালো। ইন্দ্রজিতের কপাল ভাল, বেশি দূর ওকে যেতে হোল না—একটু গিয়েই দেখতে পেলো—ডাঃ অমিয়রঞ্জন চক্রবর্ত্তী এম-বি, (হোমিও) লেখা প্লেট একটা দরজায়; ডাকাডাকি করে ডাক্তারকে তুলে নিয়ে এল ইন্দ্রজিৎ। রোগী দেখে ওষুধ দিল—বললো, এ ওষুধ যদি ধরে তো ভাল হলেও হতে পারে।

ডাক্তার চলে গেল। ইন্দ্রজিৎ রাণীকে বাতাস করতে লাগলো বসে বসে। ভাবতে লাগলো—গ্রামের লোকগুলো তাহলে আবার ফিরে এসেছে—যারা মরেছে তারা তো গেলই, কিন্তু যারা ফিরে এলো তারা কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? ওদের জমি যায়গা গেছে—স্বাস্থ্য-সম্পদ গেছে—সংস্কার সংস্কৃতি গেছে—পারিবারিক শুচিতাও গেছে—তবু ওরা ফিরে এসেছে—ফিরে এসেছে পৈতৃক ভিটেতে। ওদের পুনরাগমনকে অভিনন্দিত করবার জন্ম কেউ তো কোনো চেষ্টা করছে না! ওরা ফিরে এসে মরছে—মরছে শেয়াল-কুকুরের মত!

রাণীর অর্দ্ধোলঙ্গ দেহখানা দেখলো ইন্দ্রজিৎ ভোরের আলোয়। কাপড়ের অভাবে রাণী পাটের চট্ জড়িয়েছে কোমরে—লেপের অভাবে গায়ে দিয়েছে মোটা একখানা খেজুরের চাটাই। দুর্ভাগ্য রাণীর নয়, বাংলাদেশের বাঙালীর। কিন্তু এতক্ষণে ভোর হয়ে উঠেছে—রাণীকে কিছু খাওয়াতে হবে। ইন্দ্রজিৎ আবার উঠে দোকানের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। গ্রামের দোকান এত ভোরে খোলবার কথা নয়—ইন্দ্রজিৎ সারা গ্রামটা পার হয়েও দোকান দেখতে পেলো না—কিন্তু এরোড্রামে যাবার ওই পাকা রাস্তাটার ধারে দেখলো একখানা চায়ের দোকান। নিজে এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ রাণীর জন্ম কিছু খাদ্য কিনে

ফিরলো। দেখতে পেলো চাষারা যাচ্ছে ধান কাটতে—হাতে কাস্তে। পরণের কাপড় ছিন্ন, গায়ে শতগ্রন্থীযুক্ত সূতির কাপড় কিন্তু মুখে সুমিষ্ট সঙ্গীত—দেহতত্ত্বের গান ;—এই ছিল বাঙলার স্বাভাবিক পল্লীজীবন। মৃত্যুর তাণ্ডবেও ক্ষয়িষ্ণু পল্লী এখনো সে-সুরে সংবেদনশীল। ক্ষীণ সে সুর, তবু শতাব্দির পর শতাব্দি সে সুর জীবিত আছে ; এই ধর্ম্মে, এই আধ্যাত্মিকতায় ধৃত আছে সারা বাংলার তথা সারা ভারতের জীবন—কিন্তু হায়রে ভাগ্য—এই পূতঃ পবিত্র জীবন ধারাকে বড় বড় কারখানা আর বড় বড় শ্লোগান দিয়ে অপবিত্র, পঙ্কিল করে দিল বর্ত্তমান ধনিকযুগের নগর-সভ্যতা। যন্ত্র-শিল্প আর অর্থনীতিতেই আজকার জীবনধারাকে নিঃশেষ হয়ে যেতে হচ্ছে। মানুষের দেহের পুষ্টি হোক আর না হোক অন্তরের পুষ্টির কোনো উপাদান আজ আর অবশিষ্ট নাই। মনুষ আজ অর্থের ক্রীতদাস—নিজের কাছে এবং অপরের কাছেও। কিন্তু বাংলার আধ্যাত্মিক জীবন-ধারা পল্লীর স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায় যে কৃষ্টির গগন-চুম্বী সৌধ গঠন করেছিল শত শত বাউল, কথকতা, কবি-গানের মধ্যে—যাত্রায় আসরে আর নামসঙ্কীর্ত্তনের রাজপথে—কোথায় গেল সেই সভ্যতার মহিমান্বিত ঐশ্বর্য্য তার? আচণ্ডালে নাম বিলাবার জন্ম যে মহাপ্রভু এসেছিলেন সাম্যের মধুর বাণী নিয়ে! —হরিনাম বিলিয়ে সব মানুষকে যিনি হরিজন করে এক জাতিত্বের বিশাল মন্দিরে আশ্রয় দিয়েছিলেন—কোথায় গেল সেই উদার আদর্শের বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্ম? একটির পর একটি গুপ্ত আঘাত করে—একের পর এক বাঁধন খসিয়ে সমস্ত জাতিটাকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে পরস্পরের দিকে। জাতি তাই আজ আপনার সাংস্কৃতিক সমস্ত বন্ধন ভুলে গিয়ে রাশিয়ার ভাষায় সাম্যের গান গায়—**Marxist**দের বুলি প্রচার করে—"আপনার স্বার্থ-সিদ্ধি ব্যতীত মানবের আর কোনো ধর্ম্ম নাই"—এই স্বার্থ আবার দৈহিক ভোগলিপ্সা এবং ঐ পিপাসাই নাকি মানুষকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, যার নাম **Materialistic Animism**? জড় শক্তির ক্রীতদাস না হলে যারা আত্মোন্নতির পথ পায় না—তারাই হোল বর্ত্তমান যুগের আদর্শ! কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক

স্বাধীনতা আত্মিক স্বাধীনতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—তাই তাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল আত্মার দাযিত্ব। কিন্তু আজ... !

ইন্দ্রজিৎ এসে পৌছালো—রাণী চোখ বুজে পড়ে আছে। সস্নেহে বললো,

—রাণু! আমি মাথাটা তুলে ধরছি—মুখ ধুযে একটু কিছু খাও দেখি।

রাণী চোখ মেলে দেখলো ইন্দ্রজিতকে। অপার করুণায় ইন্দ্রজিতের চোখদুটি ছলছল করছিল। শীর্ণ ঠোঁটে হাসি টেনে রাণী বললো—গ্যাবতা তুমরাই—মানুষ রাক্ষস, আবার মানুষই গ্যাবতা—দাও দাদাবাবু, জল দাও।

—হ্যাঁ—মানুষই মাংসলোভী রাক্ষস—কিন্তু মানুষের মাঝে দেবত্বও আছে রাণু—ঘুমিযে আছে—সেই ঘুম ভাঙাতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ রাণীর মুখ ধুইযে দিল—তারপর খাওযালো ওকে কয়েক কোয়া লেবু—একটুখানি গরম দুধ। রাণী যেন বল পেল খানিকটা। বললো—হযতো ই যাত্তা বেঁচেই যাব দাদাবাবু—নাহলে তুমি আসবে কেনে—ভগবানের হয়তো ইচ্ছে যে আমি বাঁচি।

—হ্যাঁ রাণু—না বাঁচবার মত কি হযেছে? চল, তোমাকে আমার আশ্রমে নিযে যাব।

—না আমাকে কোনোরকমে লকুদাদার কাছে দিয়ে এসো—মরি তো সেই খানেই মরবো।

—মরবে না তুমি। বেশ, লকুদাদার কাছেই আমি তোমায় নিযে যাচ্ছি! কিন্তু কি করে যাবে?—তুমি তো হাঁটতে পারবে না।

—না! গরুর গাড়ী যদি ভাড়া কর তো আমি যেতে পারবো।

ইন্দ্রজিৎ আর দেরী করলো না—তখুনি বেরিযে গেল গোরুর গাড়ীর সন্ধানে। কিন্তু রাণী বড় দুর্ব্বল, গরুর গাড়ীতে চড়ার ধক্কা ও সইতে পারবে কি না, কে জানে? গোরুর গাড়ী পাওযাও গেল না—এখন ধান কাটার সময়, কেউ ভাড়ায় আসতে চাইল না। আশ্চর্য্য! ইন্দ্রজিৎ কত লোককে অনুনয় করলো—আবেদন করলো, টাকাও দিতে চাইলো যথাসাধ্য—একটা মৃতকল্প

মেয়েকে ঐ পাশের গাঁয়ে দিয়ে আসবে তারা, কিন্তু কেউ রাজি হোল না— কারো অন্তরে কিছুমাত্র সাড়া তুলতে পারলো না ইন্দ্রজিৎ; দয়া-মায়া স্নেহ ইত্যাদি মানুষের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি যেন ওদের নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেছে-- Materialistic Animism ! এই অদ্ভুত শিক্ষা কে দিয়েছে এই অশিক্ষিত চাষাদের—কে এদের এতখানি স্বার্থপর করে তুলেছে আজ? এক পুরুষ আগে যাদের দরজা থেকে যাচক ফিরতো না, আজ তারা কোন্ শিক্ষায় এতখানি স্বার্থপর? কে দিল তাদের ভারতের আত্মার বিদ্রোহী এই কদর্য্য শিক্ষা? নিরুপায় ইন্দ্রজিৎ একখানা ডুলি যোগাড় করে নিয়ে এলো চারজন বাহক সমেত। রাণী হেসে বললো---বুড়ো বয়সে ডুলিতে চাপবো দাদাবাবু?

—হ্যাঁ—বুড়ো বয়স কেন? তুমি তো নেহাৎ ছেলে মানুষ! নাও, ওঠো।

রাণীকে ডুলিতে তুলে ইন্দ্রজিৎ ডুলির সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। নদীতে জল হাঁটুর উপর ওঠে না—সাদা বালি ধু ধু করছে, তার ওপাশে সেই বড় বাড়ীটার ছাদ দেখা যায়—জমিদার সুবোধের বাড়ী। ইন্দ্রজিতের মনে পড়ে গেলো তিন বছর আগের সেই চাল-চোর লোকটাকে আর সেই সঙ্গে শ্মশানে-দেখা স্বাগা, লোকাধীশ আর কাবেরীকে। ওরা কেমন আছে কে জানে? ইন্দ্রজিৎ এই দীর্ঘকালেও তাদের খবর নেবার সময় করে উঠতে পারে নি, তবে শুনেছে কাবেরী দেবী কংগ্রেসে যোগ দান করেছেন। ভালই করেছেন—কংগ্রেস জাতীয় মুক্তি সাধনার একমাত্র জাগ্রত প্রতিষ্ঠান। কাবেরী দেবীর শক্তি আছে—তাঁর সহযোগিতায় জাতীয় কর্ম্মসাধনা শক্তিযুক্ত হবে—কিন্তু শুধু কাবেরী দেবী নয়—প্রতেক্যটি পুরুষ এবং প্রত্যেকটি নারীকে যোগ দিতে হবে কংগ্রেসে—প্রত্যক্ষ ভাবে হোক, পরোক্ষভাবে হোক—কংগ্রেসের সমর্থক হতে হবে সকলকেই।

রাণী জল চাইলো—ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। ইন্দ্রজিৎ নদীর নির্ম্মল জল ভাঁড়ে ভরে দিল রাণীর মুখে। কি সুন্দর সুপেয় জল—জল নয়, যেন গালানো

মুক্তা,—ইন্দ্রজিৎ নিজেও খেলো কয়েক আঁজলা। এই স্বচ্ছ জলস্রোতের মতই স্বচ্ছ সাবলীল ছিল এই পল্লীগুলির জীবনস্রোত, আজ তার কিছু নেই—অন্ন বস্ত্র তো নেই-ই, দয়া নেই, ধর্ম্ম নেই, নেই তার মনুষ্যত্বধর্ম্ম বোধ পর্য্যন্ত,—মানুষের জন্য মানুষের অঙ্গুলি উত্তোলনকেও এরা পয়সা নিয়ে বিক্রয় করে। এমনি করে যারা ভারতের পবিত্র জীবনধারাকে ভেঙেছে, এমনি করে ভারতের শাশ্বত মানব ধর্ম্মে **Animistic materialism** ঢুকিয়ে যারা ভারতীয় গার্হস্থ্যধর্ম্মে **Paying guest system** চালিয়ে দিচ্ছে—তারাই আবার বলছে, ভারতের পুনর্গঠন করবে! অদৃষ্টের পরিহাস! অতীত ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে আর পুনর্গঠন হয় না—"পুনঃ" কথাটা ওখানে আর না দেওয়াই উচিত। মানুষের ধর্ম্মময় জীবনকে যারা জন্তুর শিশ্নোদরময় জীবনে নামিয়ে দিলো—তারা আবার পুনর্গঠন করবে কি? তারা বড় বড় কারখানায় যান্ত্রিক মানুষ চালিয়ে মানুষ-যন্ত্র তৈরী করে নেবে—যে-মানুষের স্নেহ-দয়া-মায়া নাই, ধর্ম্মকে যে বিদ্রূপ করে, ঈশ্বরকে অবিশ্বাস। যার কাছে আত্মপরায়ণতাই একমাত্র সত্য! এদেশে পুনর্গঠন যাতে আর কোনো দিন না হয়, তারই চেষ্টা চলেছে আজ পাশ্চমের রণ-বিজয়োন্মত্ত উল্লাসের জয়ধ্বনিতে।

—ইন্দ্রজিৎ নিঃশ্বাস ফেললো।

শীতের ক্ষেতে ফসল ফলেছে। নদীর এপারে এসে সেই চোখ-জুড়ানো ক্ষেতের পানে চাইল ইন্দ্রজিৎ। কত রকম ফসল, কত ফুল, কত ফল—কত শাক-সব্জি। সোনার দেশের সোনার মাটির সম্পদ! কিন্তু কার সম্পদ? কে সে? দিনে দিনে শীতাতপ সয়ে যারা এই সম্পদ আহরণ করলো তাদের কতটুকু অংশ ওতে? যেটুকু তারা পাবে, জীবন-যাত্রার দৈনিক মানদণ্ডে তার মূল্য নিতান্ত কম। দ্রব্য মূল্য ক্রয়শক্তির বহু উর্দ্ধে উঠিয়ে রেখে ঐ তুচ্ছ সম্পদটুকু কেড়ে নেওয়া হবে ওদের কাছ থেকে—তখন ওরা যাবে দ্রব্যের জন্য মূল্যের সন্ধানে—ঐ কারখানায়—তারপর যন্ত্র হয়ে যাবে—জন্তু হয়ে যাবে!

ডুলিটা গ্রামে ঢুকেছে। সুবোধের বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়লো। ইন্দ্রজিৎ দেখতে পেলো—শীতের সকালে বারান্দার রোদে বসে রয়েছে কয়েকজন লোক—আসন কুশন কার্পেটে যায়গাটা ভর্ত্তি—ওদের মাঝখানে যে পশমী অলষ্টার গায়ে যুবকটি, ওই যে এদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি তা দেখলেই বোঝা যায়। গায়ের জামা কাপড়গুলোর দাম বর্ত্তমান বাজারে শ' পাঁচেক টাকা হবে।—ওদের চা আর খাদ্য পরিবেশন করছে একটা চাকর।

বর্ত্তমান যুগের সভ্য পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব, টয়লেট ট্যালকমেই এরা মশগুল—অধিক সময় ওদের ওতেই কাটে। ওদের যৌবন শুধু বাহিরের বিলাসেই শক্তি ক্ষয় করছে, অন্তরের উচ্চতম বৃত্তিকে বিকাশিত করবার সময় কোথায় ওদের ?

ইন্দ্রজিৎ কি ভেবে উঠে এল ওখানে, বললো—জমিদার সুবোধবাবু কার নাম ?

—আমার। কোত্থেকে আসছেন আপনি ?—সুবোধ প্রশ্ন করলো। ইন্দ্রজিৎ দেখলো, ওখানে আরো দুজন লোক বসে আছে যাদের দেখলেই বোঝা যায় সহুরে লোক ;

—আপাততঃ আসছি ঐ পাশের গ্রাম থেকে। ঐ ডুলিতে একটা মেয়ে আছে, তার বড্ড জ্বর, ওর কেউ নেই ও গাঁয়ে; আপনার এখানে একটু যায়গা দিতে পারেন ওকে রাখবার ?

বিস্ময়ে যেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো সুবোধ,

তারপর বললো—এটা হাঁসপাতাল নয়। এখানে কোনো রুগী রাখবার যায়গা নাই।—বলেই সুবোধ সেই সহুরে ভদ্রলোক দুটিকে বললো—আপন দেখুন তো মশাই !—খান, চা খান।—ইন্দ্রজিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুবোধ অতিথিদের বলতে লাগলো,—আজই তো উনি আসবেন—বেশ, আমি যাব তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে, আর আমার সাধ্যে কত আর কুলোবে ? হাজার পাঁচেক দেব আমি।

—দশ হাজার দিন, তাহলে আমরা চল্লিশ হাজার টাকার তোড়াই দিতে পারবো ওঁকে।

—আর বেশি পারছি না; আচ্ছা, আর দু'হাজার, সাত হাজার—চা খান, জুড়িয়ে গেল—হ্যাঁ, আমায় কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে—সুবোধ হাসছে।

ইন্দ্রজিৎ তখনো দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। চেয়ে দেখলো, একটা লোক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা একটা নিয়ে ছাদে উঠেছে, সেটা টাঙাবে, ইন্দ্রজিৎ বিদ্রূপ করে বললে—ওহে থামো থামো, ঐ পতাকা দেশপ্রেমিক সুবোধবাবু স্বগৃহে স্বহস্তে উত্তোলন করবেন আজ!

সুবোধ এবং আর সকলে হকচকিয়ে গেল ইন্দ্রজিতের চীৎকারে। সুবোধ বললো—আপনি কে মশাই? কি জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

—আমি অভাজন, আপনার স্বদেশ-সেবা দেখে ধন্য হয়ে গেলাম।—বলে ইন্দ্রজিৎ পথে নামলো। ওর মুখের বিদ্রূপাত্মক হাসটা এদের অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ আর দাঁড়ালো না, ডুলির সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। —হঠাৎ হাসি,—উচ্চ, উচ্ছ্বসিত হাসি। তরল ঝরণার মত হাসিটা আসছে কোথেকে? ইন্দ্রজিৎ পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেল, বছর তিনেকের একটা ছেলেকে কোলে নিয়ে আসছে একটি মেয়ে—নদীর বালিতে পায়ের হাঁটু অবধি ঢাকা, খোলা চুল—আর শাড়ীটা ছেঁড়া হলেও খদ্দরের। দাঁড়িয়ে পড়লো ইন্দ্রজিৎ। মেয়েটা হাসতে হাসতে এসে বললো,—স্বদেশ-সেবক দেখে এলেন তাহলে—কেমন? কিন্তু আপনিই বা কোন দেশ সেবাটা করছেন?

ওর ঠোঁটে জিজ্ঞাসার হাসি আর চোখে অসীম কৌতূহল। ইন্দ্রজিৎ আমতা আমতা করে বললো,

—না, দেশসেবা আমিও কিছু করছি না—তবে টাকার তোড়া দিয়ে ভণ্ডামী করি না আমি।

—যেহেতু আপনার টাকার তোড়া নেই।—নেই সেটা আপনাকে দেখলেই

বোঝা যায়। কিন্তু এমন ষণ্ডামার্কা চেহারাটা রেখেছেন কি করে?—চুরি করে খান, নাকি তাবিজ কবচ বেচেন? নাকি মহামানব হবার ফিকিরে আছেন?

এক মিনিট ইন্দ্রজিৎ চুপ করে রইল—ডুলিটা পথের বাঁকে ঘুরে যাচ্ছে, সেই দিকে চেয়ে বললো,

—আপাততঃ মহামানব হবার চেষ্টা থেকে ঐ মেয়েটার জন্যে একটু আশ্রয় চাইছি—লকুবাবুর বাড়ী কোথায়?

লকুবাবুর? আসুন। বলে মেয়েটা এগুলো। ইন্দ্রজিৎ পিছনে হাঁটছে। কয়েক মিনিট এসেই মেয়েটি বললো—আমার বাড়ীতেও যায়গা হতে পারে; এই যে, আসুন না একটু। এ বাড়ী আপনার অজানা নয়?

ইন্দ্রজিতের মনে পড়ে গেলো ভুলে যাওয়া একটা বাড়ীর কথা। হাঁ, এই বাড়ীই—আর এই মেয়েটাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। আস্তে বললো,

—তাহলে আপনি সেই সেঁজুতি?

সেঁজুতি একটুক্ষণ ওর পানে তাকিয়ে থেকে আবার হেসে উঠলো, বললো হাসতে হাসতে,—আপনি সেদিনের সেই বীরপুরুষ! আপনাকে দেখেই আমি চিনেছি। আবার কারো ঘর-দোর জ্বালাতে এসেছিলেন বুঝি?

—সন্ত্রাসবাদ আমি ত্যাগ করেছি দেবি; কিন্তু আপনি এবেশে কোথায় গিয়েছিলেন?

—মহামানব দর্শনে। লকুদাও গিয়েছিল,—আজ ওঁর দাদা জেল থেকে ছাড়া পাবেন, তাই এখানে নামলো না, সহরে গেলো। ওঁদের বাড়ীতে আজ রুগী নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না—আসুন, উঠে আসুন এখানেই।

সেঁজুতি ঘরে ঢুকলো। ওর বাবা উঠোনে রোদ পোয়াচ্ছিলেন, বললেন, —কে এসেছেন মা সেঁজুতি?

ইন্দ্রজিৎ উঠে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করে বললো—বছর তিনেক হোল, আমায় আপনারা আশ্রয় দিয়েছিলেন—আমি সেই ইন্দ্রজিৎ—শরীর ভাল আছে আপনার?

—শরীর? হ্যাঁ, বেঁচে যখন আছি, শরীর নিশ্চয়ই ভাল আছে বলতে হবে—তবে কি জান বাবা, এ শরীরে আর যৌবন নেই, মনের বার্দ্ধক্য এসে গেছে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের জীবন-রুদ্র যৌবনের প্রাখর্য্যে দীপ্তিমান থাকুক।

—থাকবে; আমাদের জীবনকে আমরা রুদ্রের যৌবনে অগ্নিময় রাখবো—আমাদের মৃত্যুকে আমরা মহিমান্বিত করবো স্বদেশের মুক্তি সাধনায়—আমরা মরবো জাতির নবজীবনের জন্য, নব যৌবনের জন্য, যেমন করে মরে বাঁচলো নেতাজী সুভাসচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ।

রাণীকে ডুলি থেকে নামিয়ে সেঁজুতি উঠোনে একটা চ্যাটাই পেতে দিল—রাণী বড্ড দুর্ব্বল বোধ করছে, শুয়ে পড়লো ওখানেই। ইন্দ্রজিৎ বললো,

আমায় কিন্তু একবার সেই দিদির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে—লকুর সেই বৌদির সঙ্গে।

—চেনেন নাকি তাকে? ওঃ বেশ, যান—এই ছেলেটাকে নিয়েই যান—বলে সেঁজুতি খোকাকে তুলে দিল ইন্দ্রজিতের কোলে।

তারপর রাণীর জন্য দুধ গরম করতে গেলো রান্নাঘরে। ইন্দ্রজিৎ খোকাকে কোলে নিয়ে আবার রাস্তায় বেরুলো। পথের দুপাশে বাড়ী, ভিটে, ডোবা, সারগাদা, ম্যালেরিয়ার আড়ৎ, আজ এই গাঁয়ের জমিদারের বাড়ীটাও দেখে এসেছে ইন্দ্রজিৎ; স্বর্গ আর নরকের তফাৎ! লকুদের বাড়ী চেনে না ইন্দ্রজিৎ, কাউকে জিজ্ঞাসা করবে কি না ভাবছে। দেখতে পেলো একটা বাড়ীর ভাঙা ছাদে জাতীয় পতাকা তোলা রয়েছে, তাহলে ঐ বাড়ীটাই নিশ্চয়। ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে এসে দেখলো,—সদর দরজায় আলপনা আঁকছে একটি মেয়ে—খোলা চুলের শেষ প্রান্তে একটা গ্রন্থী—হাতে শাঁখা, পরণে লালপাড় খদ্দরের শাড়ী, গাঁয়ের তাঁতীঘরের বোনা। খোকা তাকে দেখাতে পেয়েই ডাক দিল—

—মাম্-মা।

স্বাহা চোখ তুলে ইন্দ্রজিতকে দেখতে পেয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিচ্ছে,

ইন্দ্রজিৎ বললো—চিনতে পারলেন না দিদি? আমি সেই শ্মশানে-দেখা ইন্দ্রজিৎ!

—ওঃ, এসো ভাইটি! উনি আজ বারোটার ট্রেনে আসবেন। খোকাকে কোথা পেলে তুমি?

ইন্দ্রজিৎ বললো ব্যাপারটা সংক্ষেপে। শুনে স্বাহা হেসে বললো,

—বেশ, তাহলে রুগীকে সেঁজুতিই সামলাক—তুমি এসো, চলো মা'র কাছে, আমি এই আলপনাটা শেষ করেই আসছি!

—আপনি দিন আলপনা, আমি দেখি দাঁড়িয়ে—বড় ভালো লাগে দিদি এই সব দেখতে।

স্বাহা কিছু না বলে হাসলো। ইন্দ্রজিৎ বললো—বাংলার মেয়েরা এই ব্রত-পার্ব্বণ-পূজা-আলপনায় আজও ধরে রেখেছে বাংলার কৃষ্টিকে, বাংলার স্বাজাত্যবোধকে,—কিন্তু আর ক'দিন দিদি? সব-কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে নামছে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাহাড়—বিলাস-ব্যসনের জগদ্দল পাথর, বৈদেশিক অনুকরণের অন্ধত্ব! এগুলি ক'দিন আর রাখতে পারবেন?

—জোর করে কিছুই রাখা যায় না ভাই। যা সত্য তা থাকবেই! এই সবের মধ্যে যদি ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এগুলির উচ্ছেদ অসম্ভব। দু'চারদিনের জন্য ভুলে গেলেও আবার তা জেগে উঠবেই; তার জন্য ভয় কেন?

স্বাহা আলপনাটা শেষ করে ইন্দ্রজিতকে ভেতরে নিয়ে এলো। তারপর কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করতে গেলো। হাঁটুর ব্যথাটার কথা নানা ব্যাপারে মনে ছিল না ইন্দ্রজিতের, এখন কিন্তু সে জায়গাটা বেশ ফুলে উঠেছে এবং ব্যথাও করছে; স্বাহা জানতে পারলেই এখুনি চুণ-হলুদ লাগিয়ে দেবে—কিন্তু জানাতে চায় না ইন্দ্রজিৎ, কারণ ওকে আজই ফিরে যেতে হবে। অসুখ-বিসুখের কথা জানিয়ে ঐ অপূর্ব্ব স্নেহময়ী নারীর কাছ থেকে বিদায় চাওয়া মুস্কিল—ইন্দ্রজিৎ যতটা সম্ভব সোজাভাবে হেঁটে উঠোনে

দাঁড়ালো। সীম-লতাটায় ফুল ফুটেছে, গুচ্ছ গুচ্ছ সীম ধরেছে—ওদিকের কোণায় একটা ছোট খেজুর গাছ কামিয়ে রস বের করা হয়—সে গাছে হাঁড়িটা তখনো টাঙানো, একটা কাক সেই হাঁড়ির কাণায় বসে রস খাচ্ছে—ইন্দ্রজিৎ নির্লিপ্ত চোখেই দেখছিল এই সব।

—দেখছেন কি? হাঁড়িটা নামিয়ে দিন না গাছ থেকে!

ফিরে চেয়ে ইন্দ্রজিৎ দেখলো, সেঁজুতি। গাছে সে উঠতে পারবে না, এ কথা বলতে ওর পৌরুষে আঘাত লাগছে, অথচ উঠতেও পারবে না, হাঁটুতে ব্যথা, তাছাড়া অভ্যাসও ওর নেই। ইন্দ্রজিৎ চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো। সেঁজুতি বললো—আপনার দ্বারা কিছু হবে না, যান।

ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো, সেঁজুতি অনায়াসে গাছে উঠে হাঁড়িটা পেড়ে নিয়ে এলো: এক হাঁড়ি রস টলটল করছে। ঘর থেকে কাঁসার একটা গ্লাস এনে রস ঢেলে ছেঁকে দিয়ে বললো—খান, খেয়ে দেখুন!

ইন্দ্রজিৎ কখনো খায়নি, গ্লাসটা তুলে চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেললো। —চমৎকার তো!

হ্যাঁ, ঐ কাঁটাগাছে মাটি-মায়ের সুধা—হি-হি-হি-হি—আর খাবেন? বেশী খেলে কিন্তু গা গুলোয়!

—থাক! বাকি রসটা দিয়ে কি হবে?

—গুড় হবে, পাটালি হবে, তাই দিয়ে পায়স হবে, জানেন, সেই মন্বন্তরের সময় এই সব খেয়েই আমরা বেঁচেছিলাম। মাটি যাদের অধিকারে তারা মাটির রাজা হয়েই রইলো, কিন্তু মাটি-মা আমাদের জন্য খেজুর গাছে রস, আম-জাম-তাল গাছে ফল, মৌচাকে মধু যুগিয়েছিলেন সেদিন।

—মাটি-মা যে মা, তিনি তো মাটির রাজা নন—বলে ইন্দ্রজিৎ এসে বসলো একখানা জলচৌকিতে। কয়েকমিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ওর হাঁটুটা বড্ড কনকন করছে। আশ্চর্য্য, কাল রাত্রে তো এত ব্যথা ছিল না!

—পায়ে কিছু হয়েছে নাকি আপনার? খোঁড়াচ্ছেন কেন!—বলে

সেঁজুতি এগিয়ে এলো। ওদিক থেকে স্বাহাও এলো মুড়ি-গুড় তিল-সন্দেশ নিয়ে ; ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছে ; বললো,

—সামান্য চোট লেগেছিল কাল হাঁটুতে—ও কিছু নয়!—মুড়ির থালাটা তাড়াতাড়ি নিচ্ছে ইন্দ্রজিৎ, কিন্তু ওর এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এরা ধরে ফেলেছে। বাংলাদেশের মমতাময়ী নারী, মাটি-মায়ের চেয়ে স্নেহশীলতা ওদের এতটুকু কম নয়। স্বাহা এগিয়ে এসে বললো—কৈ দেখি ভাইটি—ইঃ!

হাঁটুখানা বেশ ফুলে উঠেছে। সেঁজুতি তখুনি বেরিয়ে গিয়ে একটা তেকাঁটার ডাল নিয়ে এল—দুধের মত তার রস, নুন আর সেই রস টিপে টিপে লাগিয়ে দিল ইন্দ্রজিতের হাঁটুতে। মুড়ি-গুড় খেতে খেতে ইন্দ্রজিৎ দেখলো এই সেবাপরায়ণা মেয়েটির মূর্ত্তি। এত দুঃখ, এত দৈন, তবু এদের মুখের হাসি নিবে যায় না ; নিজের সব সত্তা বিসর্জন দিয়ে পরের সেবায় যে আনন্দ এরা ভোগ করে, সে আনন্দ আর্য্যঋষির সেই "ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ" থেকে উদ্ভূত। মানুষের জগতে এই মহাপ্রেম যে উপায়েই হোক বিস্তারিত করতে হবে।

স্বাহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রান্নাবান্নার আয়োজনে—কিন্তু ওরই মধ্যে ইন্দ্রজিতের জন্য একধারে বিছানা করে দিল—অসুস্থ ইন্দ্রজিৎ যেন আরামে বসতে পারে। স্বাহা রাণীর খবর নিল সেঁজুতির কাছ থেকে, তারপর বললো,

—ওঁর সঙ্গে দেখা না করে তুমি যেতে পাবে না ভাই!

—আরো একজন আসবেন বৌদি—কলকাতার মেয়ে, কাবেরী দেবী ; শান্তিনিকেতনে দেখা হয়েছিল, লকুদার কাছে খবর পেয়ে উনিও গেলেন শহরে—একসঙ্গে সবাই এসে পড়বেন।—বললো সেঁজুতি।

সেঁজুতির কথায় ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে গেলো। কাবেরী দেবী এখানে!—হ্যাঁ, সেই শ্মশানে এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার—সেই আলাপের সূত্র ধরেই কাবেরী আসছে। ইন্দ্রজিতের মনে পড়লো কাবেরীর সেদিনের কথাগুলি—সেই উচ্ছ্বসিত আবৃত্তি, আর জবারস নিংড়ে আঁচলখানাকে রক্তরাঙা করে তোলা। সেদিন শ্মশানে সেই মহাঋষির আশীর্ব্বাদ যেন এই কয়টি

মানুষকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে গেছে—স্বাহা, কাবেরী, ইন্দ্রজিত, লোকাধীশ, রাণী, সেঁজুতি আর ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে! এর মধ্যে ঈশ্বরের কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, নইলে অমন করে ওরা অকস্মাৎ মিলতো না—ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ স্বাহাকে প্রশ্ন করলো,—সেই পদচিহ্ন কৈ দিদি?

—আছে ভাই—স্বাহা বললো—ঐ যে, লকু নিজের হাতে বাঁশের বাতা দিয়ে বেঁধেছে—স্বাহা দেখালো!

ইন্দ্রজিৎ উঠে গেল খোঁড়াতে খোঁড়াতে, সঙ্গে সেঁজুতি। সুন্দর বাঁশের ফ্রেমখানি, তার মধ্যে স্বাহার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে তোলা কাপড়টুকুতে পায়ের ছাপ, কিন্তু ছবি যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে—যেন বলছে—তোরা ভুলে আছিস্, ভুলে আছিস আমার পদচিহ্ন ধরে যাত্রা করবার কথাটা—দেরী করিসনে, তাহলে চিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

—ইন্দ্রজিৎ প্রণাম করতে করতে বললো—না-না-না, আমরা ভুলি নাই। তোমার অস্পষ্ট পদ-চিহ্নকে আমরা সুস্পষ্ট করবো—আমাদের খোঁড়া পা, দুর্ব্বল হাত যদিবা মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যায়, তবুও ভয় নাই—আমাদের পিছনে আসছে নবযৌবন—নবীন শক্তি! তুমি আশীর্ব্বাদ করো!

খোকা হামা দিচ্ছিল ঐখানেই—ইন্দ্রজিৎ তাকে তুলে ধরে আবার বললো,—আমাদের পিছনে আসছে নবযৌবন—নবীন শক্তি—নবজাগ্রত জীবন-রুদ্র!

সেঁজুতি চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রজিতের পিছনেই, ওর দৃপ্ত চোখের পানে তাকিয়ে এতক্ষণে বললো—পশ্চাতের এই সৈনিকদের জন্য কি রেখে যাবেন?

—আমাদের জীবন-সাধনার অজেয় অভিযান—আমাদের মরণ-সাধনার অমর ইতিহাস, আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুপথ!

—বেশ, তার অর্দ্ধশতাব্দীর উপাদান রাণীর মাথার বালিসে রয়েছে—আপনাকে কি এনে দেব?

—ও হ্যাঁ, রাণী বলেছিল আমায়। কিন্তু থাক—সে উপাদান লকুবাবু

নেবেন, কিম্বা আর কেউ যিনি আগুন-ঢালা ভাষায় আমদের মরণের ইতিহাস লিখে জাতির বুকে আগুন জ্বালাতে পারবেন, যিনি বজ্রনির্ঘোষে আমাদের, মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুপথের নির্দ্দেশ দিতে পারবেন পরবর্ত্তীকে—যিনি জীবন-সঙ্গীতকে দীপক রাগে বাজাবেন, যে রাগসাধনার অপরিমেয় আকুতিতে জ্বলে জ্বলে উঠবে পরাধীনতার মনশ্চেতনা।

—আপনি পারবেন না ?—সেঁজুতি হাসছে মিটিমিটি।

—না দেবি,—ইন্দ্রজিৎ কুণ্ঠিত স্বরে বললো—আমি অধিকারভেদ স্বীকার করি। আমি জানি, আমার শক্তি সাধারণ মানুষের শক্তি—সংগঠন শক্তি কিছু আমার মধ্যে থাকলেও সংস্জনশক্তি আমার নাই। যে সাহিত্য জাতিকে জাগাবে, তার স্জনশক্তি হবে অপরিমেয়—ইররিজিষ্টিব্‌ল—দুর্ব্বার। সে সাহিত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবে "পেন ইজ মাইটীয়ার দ্যান সোর্ড!"

—বাংলার খোসামুদে লেখক আর হুজুগে পাঠক সে-সাহিত্য চায় না—চায় হুজুগ—থ্রিল—থিওরী!

—সে সাহিত্য যারা চাইবে তাদের স্বষ্টি করবেন সেই সাহিত্যিক, তাইতেই হবে তাঁর প্রতিভার সার্থকতা।

স্বাহা এসে বললো—কথা পরে হবে সেঁজুতি, একটু বিশ্রাম করতে দে ; ও সারারাত ঘুমায় নাই, হোঁটুতে ব্যথা ; তুই একটা কি যে মেয়ে হয়ে উঠছিস দিনদিন। সেঁজুতি লজ্জিত হোলো, কিন্তু সেভাব মুহূর্ত্তে গোপন করে বললো—কি হচ্ছি, বুঝতে পারছো না বৌদি! ঝাঁসির রাণী হয়ে উঠছি—নিদ্রা যাদের কাছে মৃত্যু, বিশ্রাম বিলাস!—হিঃ হিঃ হিঃ,—হাসি যাদের অসির চেয়ে তীক্ষ্ণ, মন যাদের জন্তুকে মানুষ করবার দিকে, অন্তর যাদের অনন্ত আশায় বুক বেঁধে আমৃত্যু বীরপূজা করবে!

শেষের দিকের কথাগুলো বলতে বলতে সেঁজুতির চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো ; জলে অথবা জ্বালায়, কে জানে! ইন্দ্রজিৎ আস্তে এসে নিজের বিছানায় বসে বললো,—আপনার বীরপূজার বিজয়মাল্য যিনি লাভ

করবেন তাঁর আগমনের পথ প্রশস্ত হোক, সংক্ষিপ্ত হোক, অমৃতায়িত হোক!

—সে পথকে আমিই প্রশস্ত, সংক্ষিপ্ত, অমৃতায়িত করবো—বলে সেঁজুতি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো বারাণ্ডার বাইরে।

—মেয়েটা অদ্ভুত! ও কিছুতেই হঠবে না, কোথাও থামবে না—জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ও এগিয়ে যাচ্ছে—স্বাহা মাথার বালিশটা ঠিক করে দিতে দিতে বললো—এতো যে দুঃখ, এতো অভাব, এতো লাঞ্ছনা গঞ্জনা—ওর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই! ও গেল কোথায় জানো ভাই? উনি আসবেন, ওঁকে সম্বর্দ্ধনা করে আনবার জন্যে গাঁয়ের মুচি-মেথরদের ডাকতে। ও তাদের কাছে দেবী। মন্বন্তরের সময় এই গাঁয়ের সব খাদ্য যখন চোরাবাজারে তলিয়ে গেলো তখন ঐ সেঁজুতি আর লকু মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্যে বিহারীনাথের বন থেকে কন্দ তুলে আনতো, আমলকি, শতমূলী, অনন্তমূল আনতো, আরো কত কি আনতো আর তাদের খাওয়াতো—যা-তা খেতে দিত না বলে এ গাঁয়ের বহু লোক বেঁচে গেছে—চালের বদলে ওরা আপাংএর চালের ভাত খেয়েছে।

—তাহলে ঐ বিহারীনাথের অরণ্যভূমিই আবার সেই আদিম দিনের মত মানুষকে বাঁচিয়েছে দিদি?—ইন্দ্রজিৎ বললো—অরণ্যমাতৃক এই দেশ আজ অরণ্য শূন্য হতে বসেছে! আরণ্যক সভ্যতা উচ্ছিন্ন করে নাগরীক সভ্যতা আজ নিবিড় হয়ে উঠলো—কিন্তু দিদি, আমার মনে হয় কি জানেন—সেই আরণ্যক সভ্যতাতেই ছিল সাম্য আর স্বাধীনতা—ওর থেকে বেশি সাম্য এবং স্বাধীনতা এ যুগে আর হওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু সে যুগ তো ফিরিয়ে আনা যায় না।

—তার আদর্শকে ফিরিয়ে আনা যায় তো ভাই! সে আদর্শ ছিল অনেক মহৎ আর সত্য আদর্শ। সে জীবন ছিল অনেক মহৎ আর সত্য জীবন—মৃত্যুর ভয় তাই ছিল না সেদিনের শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে। মৃত্যুর মধ্যে সেদিনের জীবন বহু বিস্তার লাভ করতো। আজকার জীবন সামান্য স্বার্থপঙ্কিল—সত্যও তাই খণ্ডিত;

এমন কি মিথ্যাকেও সত্য বলে ভুল হয়—তাই সাম্যবাদ আজ সাম্রাজ্যবাদেরই ছদ্ম রূপ। স্বাধীনতা আজ রাষ্ট্রিক শক্তিমত্তার সদম্ভ পদক্ষেপ। মানুষ যেদিন সত্য হবে—সব মানুষের সত্য যেদিন এক মানব-সত্যে জাগ্রত হবে, সেইদিন আসবে সাম্য, স্বাধীনতা, শান্তি! কিন্তু তুমি এবার একটু ঘুমাও ইন্দ্রজিৎ,—বড্ড ক্লান্ত দেখছি তোমায়।—স্বাহা ওর গায়ে চাদর টেনে দিয়ে চলে গেলো।

নানা চিন্তায় ওর মন আজ ভারাক্রান্ত, ঘুম আসছে না।—ইন্দ্রজিৎ ভাবতে লাগলো আপন মনে—ভারতের সংস্কৃতির বাহিকা যেন এই স্বাহা—অন্তঃসলিলা ভাগীরথী, শত শতাব্দি ধরে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিকে আপনার দুই কূলে ধারণ করে চলেছেন; মুক্তবেণী আর যুক্তবেণীর মিলনতীর্থে মিলিত করেছেন সমগ্র ভারতের জনগণকে বারম্বার; কাশীবিশ্বেশ্বরের ললাট-ফলকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উনিই আজো বেদবেদান্তের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ—নবদ্বীপের নদীয়াচাঁদের মহাপ্রেমের উনিই জন্মদাত্রী, আর উনিই দক্ষিণেশ্বরের গদাধরচন্দ্রের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারিণী ধর্ম্মধারা—ভারত সংস্কৃতির মূর্ত্তি ঐ ভাগীরথীর মূর্ত্তি আর এই দিদির মূর্ত্তি;—কিন্তু ঐ সেঁজুতি! ও যেন সর্ব্বনাশা পদ্মা,—দুর্ব্বার, অগাধ, বিপুল ওর স্রোত—ওকে রোধ করা তো যায়ই না—ওর তীক্ষ্ণধার স্রোতের আঘাতে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী মাতা বসুমতী থরথর কাঁপতে থাকেন। ওর গৈরিক স্রোত রুক্ষ, রিক্ত, নিষ্করুণ—ওর যোদ্ধৃবেশ ভয়াল অথচ মনোভিরাম—বজ্রের মত দীপ্তিময় আর মৃত্যুময়!

হাঁটুর ব্যথাটা কম বোধ হচ্ছে। একটু ঘুমুতে পারলে ভাল হয়—এই মমতাময়ী নারীদের সেবার আশ্রয়ে ইন্দ্রজিৎ দণ্ডকয়েক ঘুমিয়ে নিক—বহু বহু দিন পরে ওর ভাগ্যে আজ জুটেছে এতো স্নেহ—ওঃ! সে কত দিন! মনে পড়ে, পিতৃহীন ইন্দ্রজিতের হাত ধরে তার মা এক ধনী আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে উঠলেন ইন্দ্রজিতকে মানুষ করবার জন্য। সাত বছরের তখন ইন্দ্রজিৎ,—স্বপ্নের মত মনে পড়ে—ঘুমন্ত ইন্দ্রজিতকে একা রেখে মা কোথায় যেতেন। আবার ফিরে এসে ললাটে চুমা দিয়ে বলতেন—তোর মা'র এই অপমানের শোধ নিবি ইন্দ্রজিৎ, অনেক অপমান সয়ে তোকে মানুষ করছি।—ইন্দ্রজিৎ ঘুমের ঘোরে শুনতো আর হাসতো। কিন্তু বেশিদিন মাকে সে অপমান সইতে হয় নি, বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি একদিন জীবনের পারে চলে গেলেন—যাবার আগে ইন্দ্রজিতের হাতখানা ধরে বলেছিলেন—তোকে মানুষ করতে পারলাম না! কিন্তু তুই মানুষ হয়ে উঠিস—তোর দুখিনী মায়ের অসম্মানকারীকে মার্জ্জনা করিস নে ইন্দ্রজিৎ!—মনে আছে মা'র সেই অগ্নিময় আশীর্ব্বাদ, আজো মাথায় আছে ইন্দ্রজিতের, মর্ম্মে গেঁথে আছে। মা—মা যেন এই ভারত জননীর প্রতীক—না, মা স্বয়ং ভারত জননী, সব অসম্মান, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও সন্তানকে তিনি মানুষ করতে চাইছেন, যে সন্তান মাতার অপমানকারীকে কিছুতেই রেহাই দেবে না—কোনো রকমেই মার্জ্জনা করবে না, কোনো কিছুতেই আপোষ করবে না। ইন্দ্রজিৎ শুনতে পাচ্ছে, মা যেন বলছেন—তোকে বাঁচাবার জন্য এই লাঞ্ছনা সইছিলাম ইন্দ্রজিৎ, বেঁচে থাকিস—বেঁচে থেকে এর শোধ তুলিস—এই জন্যই তোকে রেখে গেলাম···তোর মা'র নারীত্ব, তোর মা'র সতীত্ব, তোর মা'র মাতৃত্ব দু'পায়ে দলিত করছে যে দানবশক্তি, তার পশুত্বের আবরণ উন্মুক্ত করে বিশ্বের দরবারে তার সত্য স্বরূপ দেখিয়ে দিস—এই ছদ্মবেশী দুঃশাসনের রক্তপান করে তোর মা'র অপমানের প্রতিশোধ নিস!

ইন্দ্রজিতের তন্দ্রা গাঢ় হয়ে উঠছিল—জাগরণক্লান্ত শরীরটা আচ্ছন্নবৎ বিছানায় পড়ে আছে—শুধু চিন্তাশক্তি ওর এখনো জাগ্রত—চিন্তাটা স্বপ্নে রূপান্তরিত হচ্ছে—ওর মা, সপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা ভারতজননী ওর মা—কেশদাম অলুলায়িতা, হস্তপদ শৃঙ্খলিতা, সারা দেহে স্বৈরাচারের কলঙ্ক-ক্ষত, বিবস্ত্রা, বিবর্ণা, বিশীর্ণা মা আকুল কণ্ঠে ডাকছেন—ইন্দ্রজিৎ, এ অপমানের শোধ নে……

—যাই—যাই—যাই—ইন্দ্রজিৎ চীৎকার করে উঠলো, ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়!

—ওকি! অমন করে উঠলেন কেন? কোথায় যাবেন?—প্রশ্ন করলো সেঁজুতি! তার পেছনে আরো কয়েকটি মেয়ে, প্রত্যেকের হাতে শঙ্খ, পুষ্পমাল্য, অর্ঘ্যপাত্র। সেঁজুতি বিস্মিতভাবে তাকালো!

—যাবো—ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়ালো। শঙ্খহস্তা সেঁজুতিকে দেখে ওর মনে হচ্ছে যেন পাঞ্চজন্য-ধারী শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ওর সারথ্য করতে এসেছেন—জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রজিৎ দু'পা এগিয়ে এসে বললো,

—চলুন কোথায় যাচ্ছেন?

—আমরা যাচ্ছি বড়দাকে আনতে ষ্টেশনে, কিন্তু আপনার তো পা খোঁড়া—

—তা'হোক—বাজান, শাঁক বাজান! ইন্দ্রজিৎ একটা মেয়ের হাত থেকে শাঁথ নিয়ে নিজেই বাজাতে বাজাতে উঠোনে নামলো। সেঁজুতি তার দলবল নিয়ে আসছে ওর পেছনে! রান্নাঘরের দাওয়ায় খোকা খেলা করছিল; গোলমাল শুনে বলে উঠলো—আমি দাব—আমি…

ইন্দ্রজিৎ মুহূর্ত্তে লাফ দিয়ে এসে ওকে দুহাতে কাঁধে তুলে নিয়ে বললো

—এসো—"এসো দুঃসহ, এসো এসো দুর্জ্জয়, তোমারি হউক জয়!"

সেঁজুতি পরের কলিটি বললো—

"তিমির বিদরী উদার অভ্যুদয় তোমারি হউক জয়!"

মিছিলটি পথে নামলো। ইন্দ্রজিতের কাঁধে-বসা খোকার হাতে সেঁজুতি একটা জাতীয় পতাকা ধরিয়ে দিল।

আকাশের নির্মেঘ নীল বুকে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের শাণিত রশ্মি তরবারির মত ঝল্‌কে উঠছে।......



